সাহিত্য-বিবেক

সাহিত্য-বিবেক

ডক্টর বিমল মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থমেলা
এ-১২ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলকাতা ৭০০ ০০৭

প্রকাশনা : মঞ্জু মুখোপাধ্যায়। ৬৩এ/১২, হারান ব্যানার্জি রোড,
কোন্নগর। হুগলী। গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক। প্রথম প্রকাশ :
বর্ষারম্ভ ১৩৬৬। মুদ্রণ : স্বরূপা ট্রেডিং, ৭/৮ কে, সি,
ঘোষ রোড, কলকাতা-৫০। প্রচ্ছদ : শ্যামলেন্দু
ভট্টাচার্য। ২৮, বেনিয়াটোলা লেন,
ক ল কা তা ৭০০ ০০৯

নিবেদন

সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ে বাঙলায় উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ লিখেছেন অতুল গুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত এবং সাধন কুমার ভট্টাচার্য। কিন্তু আজ পর্যন্ত বাঙলায় যে সমস্ত বই এই বিষয়ে লেখা হয়েছে তার কোনটিই পূর্ণাঙ্গ নয়। এই অভাববোধ থেকেই 'সাহিত্য-বিবেক' লেখা হয়েছে। মোট ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত এই বই-এ শিল্পের সংজ্ঞা থেকে আরম্ভ করে সাহিত্য-জগতের সাম্প্রতিকতম আন্দোলন পর্যন্ত আলোচনা করা হয়েছে। বৃহত্তর বই লেখার সুযোগ ছিল। সেই প্রলোভন নানাকারণে সংযত করতে বাধ্য হয়েছি।

এই বই লেখা থেকে প্রকাশ পর্যন্ত আমার [illegible] ড. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, সহকর্মী ড. রবীন্দ্র গুপ্ত, ড. [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. ধীরেন্দ্র দেবনাথ, ড. অরুণ বসু ও প্রাক্তন সহকর্মী শ্রদ্ধেয় ড. সুবোধরঞ্জন রায় আমাকে উৎসাহ দিয়ে এসেছেন। এঁদের সকলকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। আমার অগ্রজ অধ্যাপক [illegible] মুখোপাধ্যায় ও রবীন্দ্র ভারতীর দর্শনের অধ্যাপক ড. বিশ্বনাথ সেন এই বই-এর কিছু অংশ দেখে দিয়ে অনেক মূল্যবান উপদেশ দিয়েছেন। রবীন্দ্রভারতীর বাঙলা বিভাগের প্রধান ড. অজিতকুমার ঘোষ ও অধ্যাপক ড. ক্ষেত্রগুপ্ত, তাঁদের নিজস্ব সংগ্রহ থেকে দু'একখানা বই পড়ার সুযোগ করে দিয়েছেন! এঁদের শ্রদ্ধা জানাই। অগ্রজপ্রতিম অধ্যাপক ড. নির্মল দাশের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমার নেই। এই বই আমাকে দিয়ে লিখিয়ে বাকী কাজটুকু তিনিই করেছেন। এমন কি নামকরণ পর্যন্ত।

শ্রীযুক্ত বিকাশ তালুকদার, এম. এ মহাশয়ের যথেষ্ট সতর্কতা সত্ত্বেও মুদ্রণে বেশ কিছু ভুলচুক রয়ে গেল। 'অ্যারিস্টটল' ও 'অ্যারিষ্টটল'

'রিয়ালিস্ট' ও 'রিয়ালিষ্ট', 'শেক্সপীয়র' ও 'শেক্স্‌পীয়র' এই ধরনের দু'রকমের বানানই রয়ে গিয়েছে। একশো ছত্রিশ পৃষ্ঠার 'অত্যাশক্তি'র (হওয়া উচিত 'অত্যাসক্তি') জন্য আমি লজ্জিত। 'টীকা' অংশে লঙ্গাইনাসের 'On the Sublime' হয়ে গিয়েছে 'On the Subline'। এরকম লজ্জার ব্যাপার অবশ্যই আরও কিছু রয়েছে। তবে সহৃদয় পাঠকেরা মুদ্রণ-ঘটিত প্রমাদ চিরকালই ক্ষমার চোখে দেখে থাকেন। সুতরাং ক্ষমা চাওয়ার কোন কারণ নেই।

যে উদ্দেশ্যে এই বই লেখা তা সফল হলেই লেখক আনন্দিত।

বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়

বাংলা বিভাগ,
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।
কলকাতা।

সূচীপত্র

১॥ ব হি র্ভা গে

ক॥ শিল্প কী?

Boswell. 'Then, Sir, what is poetry?'
Johnson. 'Why, Sir, it is much easier to say what it is not. We all know what light is, but it is not easy to tell what it is.'[১]

যদিও প্রশ্নটা বস্‌ওয়েল-এর এবং সমাধান জনসনের তবু এই প্রশ্নের অন্য সমাধানও বোধ হয় সম্ভব নয়। আবার প্রশ্নটা করা হয়েছিল যদিও কবিতা-প্রসঙ্গে তবু সাধারণভাবে শিল্পসম্পর্কেও ঐ প্রশ্নের উত্তর হত একই: 'it is much easier to say what it is not.' সংজ্ঞার সীমার মধ্যে শিল্প-সাহিত্যের পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু সম্ভব নয় বলেই যে দার্শনিক বা সাহিত্যিকেরা শিল্প-সাহিত্যের সংজ্ঞা বা পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করেন নি তা নয়। ফলে নানামুনির নানা মতের দ্বন্দ্বে শিল্পাঞ্চল উপক্রুত। সমস্যা বৃদ্ধি পেয়েছে আরও 'শিল্পের' ক্ষেত্র ব্যাপক হওয়ার ফলে। ভাল ছবি, কবিতা বা গানকে যেমন 'শিল্প' বলি তেমনি ভাল কথা বলা ও ভাল অভিনয়কেও বলি 'শিল্প'। আবার যিনি নাটক লিখলেন তিনি শিল্পী, যিনি অভিনয় করলেন তিনিও শিল্পী। 'শিল্প' কি নয়? 'শিল্পী' কে নয়?

শিল্প ও শিল্পীর সংজ্ঞা ও পরিচয় নিয়ে, উপাদান ও উদ্দেশ্য নিয়ে যত মত ও যত পথ গড়ে উঠেছে তার জটিলতায় প্রবেশ না করে শিল্পের স্বরূপ আলোচনা প্রসঙ্গে হার্বার্ট রীড-এর ছোট্ট একটি উক্তি উদ্ধার করছি এখানে:

'art is most simply and most usually defined as an attempt to create pleasing forms.'[২]

খুব সহজভাবে সহজ কথাটি শুনিয়ে দিয়েছেন হার্বার্ট রীড, যার তাৎপর্য কিন্তু খুব ব্যাপক ও গভীর। রীড-এর দেওয়া সংজ্ঞা থেকে শিল্পের তিনটি উপাদানের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে :— (ক) শিল্পস্রষ্টা, যাঁর প্রচেষ্টা ('attempt') আনন্দদায়ক রূপনির্মাণ ; (খ) শিল্পরূপ, যার মাধ্যমে আনন্দ দেওয়া ও পাওয়া সম্ভব ; (গ) শিল্পরসিক, যিনি আনন্দলাভ করবেন। এখন এই স্রষ্টা, সৃষ্টি ও ভোক্তা শিল্পের তিন উপাদানের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা করছে 'আনন্দ' যা শিল্পের উপাদান নয়, কিন্তু এক অত্যাবশ্যক ধর্ম। যেহেতু 'সৌন্দর্যের' সঠিক সংজ্ঞা বা পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয় এবং দৃশ্যত অসুন্দরও শিল্প-সাহিত্যের জগতে অনেকসময় রসিকচিত্ত জয় করেছে, সর্বোপরি যা-কিছু আনন্দদায়ক তাকেই 'সুন্দর' বলে ঘোষণা করার দিকে দার্শনিকদের প্রবণতা দীর্ঘকালীন, অতএব হার্বার্ট রীড তাঁর দেওয়া শিল্পের সংজ্ঞা থেকে 'সৌন্দর্য' শব্দটি বর্জন করেছেন সচেতনভাবে।

ক) যাঁর অন্তর্লোক শিল্পের জন্মভূমি সেই শিল্পী শিল্পের জগতে ঈশ্বরসদৃশ, যদিও আর সমস্ত মানুষের মতই তিনিও যাবতীয় ইন্দ্রিয়ের অধিকারী। আর সকলের মত তিনিও দুঃখে উদ্বিগ্ন এবং সুখে আন্দোলিত হন। রূপরসের জগতের প্রতি কামনা তাঁরও আছে আর সকলের মতই, বরং বেশী ছাড়া কম নয়। সকলের মত ইহ জগতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন তিনিও। তফাৎ এইখানে, বস্তুলোকের সঙ্গে মনের সংঘাতে শিল্পীর হৃদয়ে জাগে যে আলোড়ন সেই আলোড়নের সঙ্গে আর সকলের হৃদয়লোকের আলোড়ন এক নয়। আবার এই আলোড়নের গভীরতা ও বিস্তার যেমন সকলের মধ্যেই সমান নয়, তেমনি আলোড়িত চিত্তের আনন্দোজ্জ্বল প্রকাশও সমান নয় সকলের ক্ষেত্রে। প্রভাত-সূর্যোদয়-দর্শনে মুগ্ধ হয়েছেন হয়ত অনেকেই, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছাড়া নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' আর কে লিখেছিলেন ? ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ছাড়া বাতাসে আন্দোলিত ড্যাফোডিল ফুল দেখে সোল্লাসে এমন কথা আর লিখেছিলেন : 'my heart dances with the daffodils ?' এবং ম্যাডোনার মূর্তি রাফেল ছাড়া আর কার হাতেই বা অমন বাঙ্ময় হয়ে উঠতে পারত ?

যদিও যা আছে ইহলোকে শিল্পের জগতে তা-ই আছে নানারূপে ছড়িয়ে, তবু এই বস্তুপৃথিবীটা জগৎস্রষ্টার শিল্পকর্ম হলেও সাহিত্য, সংগীত ও চিত্রের জগতে শিল্পীদের কাছে তা নিতান্তই উপকরণমাত্র। বস্তুজগৎ থেকে

অভিজ্ঞতা মারফৎ সংগৃহীত এই উপাদান শিল্পী তাঁর মন, মস্তিষ্ক ও কল্পনার সাহায্যে গ্রহণ-বর্জনের দ্বারা এবং ব্যক্তিত্বের স্পর্শে শিল্পমূর্তিতে সঞ্জীবিত করে তোলেন। যেহেতু কবি-শিল্পীরা পরীক্ষার দ্বারা নয়, হৃদয়ের দ্বারাই এই জগৎটাকে জানেন ও জানান তাই তাঁদের হাতে পড়ে পরিচিত ভাষায় লাগে অপরিচিত ব্যঞ্জনার ছোঁয়া, এক টুক্‌রো নির্বাক পাথর হয়ে ওঠে সজীব। জানতে গেলে অভিজ্ঞতাই যথেষ্ট কিন্তু জানাতে গেলে নিছক অভিজ্ঞতায় কুলোয় না, দরকার পড়ে কল্পনাশক্তির। শ্রীযুক্ত এরিক নিউটন শিল্পীর এই কল্পনাশক্তিকে যদিও ঝাড়াই-বাছাই এর যন্ত্রের বেশী ভাবতে পারেন নি[৩] কিন্তু একথা সত্য, এই জগতের উপর শিল্পীর হৃদয়ের অধিকার ব্যাপ্ত হয় কল্পনাশক্তির বলে, শুধু অভিজ্ঞতা দ্বারা নয়; এবং এই কল্পনাশক্তির বলেই হৃদয়ের অধিকারকে শিল্পী স্থায়ী আকারে ব্যক্ত করতে সমর্থ হন। অর্থাৎ 'জানানোর' জন্য একান্ত প্রয়োজন হয় কল্পনাশক্তির। কিন্তু যতদিন এই কল্পনাশক্তির মহিমা অপরিজ্ঞাত ছিল ততদিন শিল্পীকে মনে করা হত দৈবানুপ্রেরিত ব্যক্তি। তারপর যেদিন সাধারণ কল্পনাশক্তির সঙ্গে কবি-কল্পনার পার্থক্য নির্ণীত হল (কাণ্ট Aesthetic imagination, Productive imagination, Reproductive imagination, কল্পনাকে এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন) সেদিন 'মিউজ'-এর প্রভাব ক্ষুণ্ণ হল এবং শিল্পের জন্মরহস্য ব্যাখ্যা করা হল এইভাবে: 'a product of art is only possible in so far it has received its passage through the mind, and has originated from the productive activity of mind'[৪]। মনের এই 'Productive activity' বা সৃজনধর্মী কর্মকৌশল, হেগেলের ভাষায়, হৃদয়বেদ্য সত্যকে ইন্দ্রিয়গম্য চিত্ররূপময় শিল্পে রূপান্তরিত করে। কিন্তু 'ইন্দ্রিয়গম্য' হওয়ার আগে সেই সত্যকে পার হতে হয় শিল্পীমনের অনেক গোপন স্তর যাকে Jean Paul Richter উপমিত করেছেন আফ্রিকার অন্ধকারাচ্ছন্ন অরণ্যের সঙ্গে, যেখানে বহু বিপরীত ভাব ও ভাবনার চলে অনবরত যাওয়া-আসার লীলাখেলা। সূর্যালোকের পক্ষেও দুষ্প্রবেশ্য গোপনতম এই যে অন্তর্লোক সেখানে 'শব্দ স্পর্শ ঘ্রাণ সমস্ত একাকার হইয়া যায়। ......সেখানে হাসিও যা কান্নাও তা, সেখানে সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা।'[৫] দেশ-কাল অনালিঙ্গিত এই অন্তর্লোকের প্রতিটি ক্রিয়াকে কার্য-কারণের সূত্রে ব্যাখ্যা করা যায় না, কারণ বহু আপাত বিপরীতের অভেদে মিলন ঘটে এখানে। কিন্তু বহু বিপরীতের দ্বন্দ্বোত্তীর্ণ মনের

এই গোপনকক্ষে একবার যা রূপ নিল তা থেকেই তুষ্ট হল না শিল্পীর মন। তারপর থেকে তাঁর সজ্ঞান সচেতন মনে ক্রিয়া চলল অন্তর্গত ভাবকে বাইরে রূপদানের সাধনা। ক্রোচের 'ইন্‌টুশন' যাই বলুক না কেন, মনে জন্ম নিলেই শিল্পকর্মের ব্যাপারে শিল্পীর ছুটি মেলে না। রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছেন, 'যে কাঠ জ্বলে নাই তাহাকে আগুন নাম দেওয়াও যেমন, যে মানুষ আকাশের দিকে তাকাইয়া আকাশের মতো নীরব হইয়া থাকে, তাহাকেও কবি বলা সেইরূপ।'[৬] অতএব শিল্পীকে হতে হয় রূপকার। শিল্পীর আর এক নাম 'রূপদক্ষ'।

খ) 'ভাব, বিষয়, তত্ত্ব সাধারণ মানুষের। ······কিন্তু রচনা লেখকের সম্পূর্ণ নিজের। ······সেজন্য রচনার মধ্যেই লেখক যথার্থরূপে বাঁচিয়া থাকে।' —কথাটা রবীন্দ্রনাথের। তিনি অন্যত্র ('সৌন্দর্য ও সাহিত্য' : ১৩১৪ বৈশাখ) বলেছেন; 'কেবল রচনার নৈপুণ্যমাত্রও সাহিত্যে সমাদর পাইয়াছে।' এর বিপরীত কথাটাই বলেছিলেন দার্শনিক ক্রোচে : 'The confusion between art and technique is especially beloved by impotent artists'. তাঁর মতে, একমাত্র দুর্বল শিল্পীরাই রূপনির্মাণ কৌশল-সচেতন। প্রায় সমান উগ্রকণ্ঠেই রূপসচেতন শিল্পীকে ধিক্কার দিয়েছিলেন টলস্টয় তাঁর 'What is Art ?' প্রবন্ধগ্রন্থে। তবে উভয়ের বিশ্লেষণে পার্থক্য ছিল স্পষ্ট। ক্রোচে মনে করতেন, মনই শিল্পের আদি ও অকৃত্রিম অধিষ্ঠানভূমি। সুতরাং শিল্পের রূপবৈচিত্র্য বা চমক নিয়ে বিব্রত হওয়ার কিছুই নেই। কলাকৌশল মোটেই শিল্পের অপরিহার্য উপাদান নয়[৮]। অন্যদিকে টলস্টয়ের বৈরাগ্যের কারণ হচ্ছে, তিনি মনে করতেন রূপসচেতন শিল্পী শিল্পকে ক্রমশঃ রূপসর্বস্ব করে তুলে সাধারণ মানুষের অনধিগম্য প্রদেশে নিয়ে যায়। কিন্তু সাধারণ মানুষই যদি শিল্প-রসিক হতে না পারল, শিল্পের দ্বারা অভিভূত ও প্রাণিত হতে না পারল তাহলে ধনী ও মুষ্টিমেয় শিক্ষিত মানুষের বিলাসের উপকরণ হয়েই শিল্পকে নটীর জীবন কাটাতে হবে। ধনী ও শিক্ষিত মানুষের শিল্প আর বিলাসিনী নটী সমপর্যায়ের, মন ভোলায় কিন্তু প্রেম দেয় না বা সংসার রচনা করে না। টলস্টয় পৃথিবীর সর্বজনবিদিত মহান্ শিল্পীদের তিরস্কার করেছিলেন, এমন কি নিজেকেও ক্ষমা করেন নি, যেহেতু তাঁর মতে তাঁর সমকালের শিল্প হচ্ছে 'প্রস্টিটিউট'। ক্রোচে বা টলস্টয়কে বাদ দিলে এই মুহূর্তে এমন কোন উল্লেখযোগ্য শিল্পী বা সমালোচককে মনে পড়ছে না,

যিনি রূপকে বা রূপনির্মাণকৌশলকে এতখানি উপেক্ষা করেছেন। বরং বিপরীত মতটাই চোখে পড়ে বেশী—ক) 'রসসাহিত্যে বিষয়টা উপাদান, তার রূপটাই চরম।'৯ খ) 'প্রয়োজন এবং জ্ঞানের সম্বন্ধ ছাড়াও মানুষের সঙ্গে বিশ্বের অন্য সম্বন্ধ আছে। এই সম্বন্ধেই রূপসৃষ্টি' ।১০ অথবা গ) 'শিল্প রচনায় টেকনিক মর্যাদা পায় যান্ত্রিকতা থেকে রচনাকে বাঁচায় বলে।'১১ বস্তুতঃ কি লিখবেন এবং কেমন করে লিখবেন এ দুটো সমস্যা শিল্পী-সাহিত্যিকদের কাছে চিরকালই সমান ছিল। যা ইচ্ছে যেমন খুশী লিখে দিলে যে সাহিত্য হয় না, যা ইচ্ছা যেমন খুশী এঁকে দিলে যে ছবি হয় না শিল্পীদের এই জ্ঞানটা বরাবরই ছিল। তাঁরা কোন অবস্থাতেই ভাব আছে রূপ নেই, অথবা রূপ আছে ভাব নেই এমন অসত্য কথা ভাবতে পারেন নি। বিষয়টাই সব, রূপ গৌণ অথবা রূপটাই শিল্পের অন্তরতম সত্য, নতুবা বিষয় হিসেবে আলপিনের মাথা এবং মহান চরিত্রের অধঃপতন সমান স্তরের, এমন উগ্রমতাবলম্বী বিবদমান দুই দল মাঝে মাঝে যে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠেন না তা নয়। কিন্তু সন্দেহ আছে কি রামায়ণ-কারের হৃদয়ে করুণ ভাবের জাগরণ ও অনুষ্টুপ ছন্দের জন্ম হয়েছিল একই সঙ্গে? এবং মিল্টনের 'ব্ল্যাঙ্ক ভার্স' ও মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ ছিল তাঁদের ভাবপ্রকাশের অনিবার্য মাধ্যম? অথবা মাক্স আর্নস্ত এবং সালভাদোর দালি প্রচলিত ছাঁদের ছবি এঁকে তাঁদের বক্তব্য প্রকাশ করতে পারতেন না? সুতরাং 'রূপ' শিল্পের জগতে এমন উপাদান নয় যা অনায়াসে যুক্ত অথবা বিযুক্ত হতে পারে। অর্থাৎ ভাব ও রূপ 'অপৃথগ্ যত্ননির্বর্ত্য'। কিন্তু রূপের প্রতি মোহ শিল্পীদের অনেকক্ষেত্রে পথভ্রষ্ট করে দেয়। স্মরণে রাখা প্রয়োজন, রূপের উপর সমকালের নিয়ন্ত্রণ ও দাবি অত্যধিক, ফলে শুধুই রূপের নেশা শিল্পীকে অপরূপের রাজত্ব থেকে বিতাড়িত করে দেয়, ভবিষ্যতের রসিকের হৃদয়ে প্রবেশের ছাড়পত্র লাভ থেকে বঞ্চিত করে। কিন্তু শিল্পের জগতে এমন কেউ নেই যিনি রসিকের প্রতি দেখাতে পারেন চূড়ান্ত উপেক্ষা অথবা বিচলিত হন না কেউ তাঁর শিল্পের সমঝদার আছে বা নেই ভেবে। অতএব রূপদক্ষকে ভাবতে হয় সমকাল ও আগামী কালের অগণিত রসিক সুজনের কথা।

গ) শিল্পের জগতে রসিক যদিও তটস্থ তবু তাঁর ভূমিকা অসাধারণ, যেহেতু শিল্প এবং শিল্পীকে নিয়ন্ত্রিত করার ক্ষমতার অধিকারী তিনি। এই রসিক বা সহৃদয় পাঠক শিল্পের সমঝদার এবং সমালোচক। সমঝদার হিসেবে তিনি শিল্পের রস আস্বাদ করেন (অবশ্য যা আস্বাদ করা হয় তাই 'রস') এবং

সমালোচক হিসেবে সেই রস বা আনন্দের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেন অন্য সকলের কাছে। সমঝদার ও সমালোচকের সত্তা অভিন্ন গণ্য করতেন রবীন্দ্রনাথ। তাই তাঁর কাছে সমালোচক যিনি, তিনি সাহিত্যিকের ঘরের লোক, সরস্বতীর সন্তান। ঘরের লোক হিসেবে ঘরের লোকের মর্যাদা বোঝেন। স্রষ্টা ও সমঝদার এবং বিচারকের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ পার্থক্য মানতেন না, বরং তিনি অস্কারওয়াইল্ডের অনুরূপ ধারণাই পোষণ করতেন। যথার্থ ভাল শিল্পীই ভাল বিচারক, এই ধারণা ছিল অস্কারওয়াইল্ডের আর রবীন্দ্রনাথ উল্টো দিক থেকে বলতেন, যথার্থ সমালোচক সাহিত্যিকের আপন জন। বস্তুতঃ শিল্পের জগতে রচয়িতা এবং ভোক্তা উভয়েই রসতীর্থপথের পথিক। যদিও আমরা জানি রসিক সমালোচকই রসের দাবিদার তবু 'রচয়িতাকে খানিকটা ভোক্তার কাজও করতে হয়। মধুকর মধুর স্বাদ না লাভ করলে মধুসঞ্চয় কেন করবে? ...... এই যে রসের স্বাদ গ্রহণের ক্ষমতা এতো দেখি সব মানুষ পেলে না, শুধু শিল্পী আর রসিকই এ বিষয়ে অধিকারী হল।'[১২] শিল্পী আর সমঝদার দু'জনেই 'রস পেলে' কথাটা সত্য। কিন্তু রসের জগতে একজন দাতা অপরজন গ্রহীতা; একজনের দিয়ে আনন্দ, অপরজনের পেয়ে আনন্দ। একজন তাঁর হৃদয়লোকের আলোড়নকে শিল্পমূর্তি দান করতে পেরেছেন, অন্যজন পারেন নি, তফাৎ শুধু এইখানে। আবার অন্তরের ভাব-ভাবনাকে শিল্পমূর্তি দান করেছেন যিনি, তিনিও অনায়াসে অপরের শিল্পবিচারে অংশ গ্রহণ করতে পারেন। কবি অপরের কাব্য সমালোচনা করছেন, চিত্রকর অপরের চিত্রের রস উপভোগ করছেন এবং প্রসিদ্ধ গায়ক মনপ্রাণ সমর্পণ করে অন্য গায়কের গান শুনছেন, এ দৃষ্টান্ত দুর্লভ নয়। সুতরাং রসিক বা সমালোচকদের সম্পর্কে ক্রুদ্ধ টলস্টয় যে বলেছিলেন, তাঁরা সেই মূর্খ যাঁরা জ্ঞানীদের বিচার করার মত অনম্র ও উদ্ধত, সে কথার পিছনে যুক্তি নেই। প্রকৃত শিল্পরসিক শুধু রসের 'ভোক্তা নন' তিনি অপরের রসোপভোগের ক্ষমতাও বাড়িয়ে দেন। তিনি অনেক সময়েই শিল্প ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সেতুসদৃশ। ভারতীয় আলংকারিকেরা বলেছিলেন, রসের অস্তিত্ব পাঠকের স্বচ্ছ নির্মল হৃদয়ে। সুতরাং লেখক অপেক্ষা রসিকের হৃদয় নিয়েই তাঁদের যত সমস্যা। যত কূট তর্ক। পাশ্চাত্ত্যে ট্রাজেডিতত্ত্ব আলোচনা করেছেন যাঁরা তাঁরাও নাটকে দর্শকের ভূমিকাকেই প্রধান আলোচ্য বিষয় করেছেন। আসলে শিল্পীর আনন্দ স্রষ্টার আনন্দ হলেও তিনি নিরপেক্ষ দর্শকের 'disinterested satisfaction' শিল্প থেকে লাভ করেন না। এই নিস্পৃহ আনন্দের প্রকৃত অধিকারী 'দর্শক' বা 'পাঠক' বলেই

তাঁর আনন্দই শিল্পের জগতে স্বীকৃত।

ঘ) 'আনন্দ' শিল্পের উপাদান নয়, কিন্তু আনন্দদানে শিল্পী ও শিল্পের সার্থকতা। জীবনের যত জটিলতা যত সমস্যাই শিল্পে রূপায়িত হোক না কেন যে শিল্পকর্ম আনন্দ দান করে না তার মূল্য কোথায়? ভাববাদী এবং মার্ক্সবাদী শিল্পী-দার্শনিকেরা সকলেই একথা মেনেছেন, শিল্পকে শিল্প হিসেবে সার্থক হতে হবে, এই হচ্ছে প্রথম শর্ত। বাস্তবের দাবি মানতে গিয়ে শিল্প প্রচার-পত্রিকার সঙ্গে নিজের পার্থক্য লুপ্ত করে বসুক এমন কেউই বলেন নি। তবে বিশুদ্ধ শিল্পের অজুহাতে কলাকৈবল্যবাদী জীবনসম্পর্ক-বিচ্ছিন্ন আনন্দের সন্ধান করেন, এবং মার্ক্সবাদী জীবনের সমস্যা, সমাধান ও মুক্তির রূপ প্রকাশিত হতে দেখলে তবে আনন্দলাভ করেন। 'আনন্দ' কিসে কলাকৈবল্যবাদীর সঙ্গে মার্ক্সবাদীর মতভেদ শুধু সেই প্রশ্নে। নতুবা শিল্প-সাহিত্যে 'আনন্দই' সন্ধান করেন সকলে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, শিল্প থেকে আনন্দ লাভ হয় কেন এবং কিভাবে? প্রথমেই মেনে নিতে হবে, শিল্প সাহিত্য থেকে যে আনন্দ লাভ হয় তা নিম্নস্তরের সুখ নয় অথবা পার্থিব লাভালাভের সঙ্গে যুক্ত নয়। এলিয়ট এই আনন্দকে সঠিক কারণেই বলেছেন' Superior amusement.' এই 'Superior amusement' লাভ হয় কিভাবে? প্রথমত, সুগঠিত শিল্পরূপমাত্রই আনন্দ দিয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিচিত্তের স্বার্থপরতার আবরণ ছিন্ন করে শিল্প বৃহৎ জীবনের সঙ্গে আমাদের মুখোমুখি করে দেয় বলে শিল্প আমাদের আনন্দ দান করে। তৃতীয়ত, বাস্তবজীবনে যা অসুন্দর ও পীড়াদায়ক শিল্পে সমর্পিত হয়ে তা হয়ে ওঠে সুন্দর ও আস্বাদ্য এবং সেই কারণে আনন্দদায়ক। চতুর্থত, আমাদের ব্যক্তিজীবনের সত্যই সাহিত্য বা শিল্পে রূপায়িত হয়। ফলে এ আনন্দ হয় নিজের অভিজ্ঞতাকেই আস্বাদের আনন্দ। ......শিল্প থেকে আনন্দলাভ হয় কেন, সে বিষয়ে হয়ত আরও নানা তত্ত্ব উচ্চারণ করা যেতে পারে, কিন্তু সত্য একটাই, দুঃখলাভের জন্য কেউ শিল্পচর্চা করে না। আনন্দই শিল্পের জগতে অন্বিষ্ট।

পূর্বেই বলেছি, হার্বার্ট রীড-এর প্রদত্ত সংজ্ঞায় 'সৌন্দর্য' শব্দটি অনুপস্থিত। এবং এই অনুপস্থিতি তাঁর সচেতন মনের ক্রিয়ারই ফল। কিন্তু শিল্পী-সাহিত্যিককে যে বস্তুর আনন্দদায়ক রূপ-নির্মাণ করতে হয় তা আপাত সুন্দর হোক বা না-হোক শিল্পীর কৌশলে রূপান্তরিত হয় শৈল্পিক সৌন্দর্যে। বস্তুজগতের সৌন্দর্যমাপক যন্ত্রে এর স্বভাব ধরা না পড়লেও শিল্পী ও দার্শনিকেরা বিভিন্ন পদ্ধতিতে চেষ্টা করেছেন সেই সৌন্দর্যের সংজ্ঞা ও স্বরূপ নির্ণয় করতে।

'পণ্ডিতেরা পরম সুন্দর সম্বন্ধে এবং সৌন্দর্য সম্বন্ধেও বেশ স্পষ্ট কথাই লিখে গেছেন, 'সৌন্দর্যতত্ত্বে' সে কথাগুলো পড়ে নেওয়া সহজ। কিন্তু সে সব তর্কজালের মধ্যে থেকে সৌন্দর্যকে আবিষ্কার করে বার করাই শক্ত। আর্টিষ্ট তারা সুন্দরকে অসুন্দরকে নিয়ে চিরকাল খেলা করছে। নানা মূর্তিতে নানা চিত্রে নানা ছন্দে নানা নৃত্যোগানে তারা সুন্দরকে ধরে আনছে সভার সামনে কিন্তু সৌন্দর্য সম্বন্ধে বলতে গেলে সব আগেই আর্টিষ্টের মুখ হয়ে যায় বন্ধ।'* কারণ দার্শনিকের কাজ 'সৌন্দর্য' নিয়ে, আর্টিষ্টের কাজ 'সুন্দর' নিয়ে। কিন্তু আর্টিষ্টের মুখ বন্ধ হয়ে গেলেও মনে হয় তা সাময়িক। কারণ দার্শনিকদের মত আর্টিষ্টদের অনেকেই সৌন্দর্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন বহুকাল আগে থেকেই, যদিও দার্শনিক এবং আর্টিষ্ট সকলেই জানতেন, সৌন্দর্য কাকে বলে সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অত্যন্ত কঠিন কাজ এবং সকলের সমমতাবলম্বী হওয়াও সম্ভব নয়।

খ্রীষ্টপূর্বাব্দকালের গ্রীক দার্শনিক প্লেটো বলেছিলেন, সৌন্দর্য স্বর্গীয়। বস্তুজগতে ইন্দ্রিয়ের মধ্যস্থতায় সুন্দরের অজাগতিক উজ্জ্বলতা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। স্বর্গীয় সুন্দর যথার্থ সুন্দর, পরম সুন্দর; বস্তুপৃথিবীতে তারই প্রতিফলন ঘটে এবং বস্তুজাগতিক সুন্দরকে সেই পরম সুন্দর নিজের দিকে আকর্ষণ করে। বস্তুজাগতিক সুন্দর কি? প্লেটো বলেছেন, 'deformed is always inharmonious with the divine, and the beautiful harmonious.'[১] অর্থাৎ স্বর্গীয় সুন্দরের সঙ্গে অসমঞ্জসকে প্লেটো বস্তুজাগতিক সুন্দর বলে গ্রহণ করতে সম্মত ন'ন। জাগতিক সুন্দরকে এইভাবে স্বর্গীয় সুন্দরের সঙ্গে সম্পর্কিত করে দেওয়ায় প্লেটোর কাছে একটি সুন্দরবস্তুর সঙ্গে অপর সুন্দর বস্তুর কোন পার্থক্য ছিল না। এবং একটি সুন্দর রূপের সঙ্গে অপর সুন্দর রূপের কোন পার্থক্য খুঁজে না পাওয়ায় প্লেটোর কাছে সৌন্দর্য একটি নির্বস্তুক গুণমাত্রে পর্যবসিত হয়েছিল।

অ্যারিস্টটলের কাছে 'সৌন্দর্য' নির্বস্তুক নয়। শৃঙ্খলা, সামঞ্জস্য ও স্পষ্টতা, অ্যারিস্টটলের মতে, সৌন্দর্যের তিন প্রধান উপাদান।[২] সৌন্দর্যকে, অ্যারিস্টটল বাহ্যজ্ঞান ও মাপের সীমানায় এনে উপস্থিত করলেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে। সৌন্দর্যকে এইভাবে জ্ঞানের সীমায় আনার

পর তাঁর 'রেটোরিক' গ্রন্থে বললেন, জীবনের বিভিন্ন স্তরে সৌন্দর্যেরও পরিবর্তন ঘটে। যুবকের সৌন্দর্য এবং বৃদ্ধের সৌন্দয সদৃশ নয়। মানব জীবন থেকে আরম্ভ করে শিল্প-সাহিত্য পযন্ত সব কিছুর সৌন্দর্য-বিচারেই অ্যারিস্টটল 'Order', 'Symmetry', 'Definiteness' এই তিনটি উপাদান সন্ধান করেছেন। প্লেটোর সঙ্গে অ্যারিস্টটলের সৌন্দর্য-বিচার পদ্ধতির পার্থক্য একান্তই মৌলিক।

প্লেটো-অ্যারিস্টটলের পরবর্তীকালে প্লোটিনিউ (Plotinus) তাঁর ক্লাসিকাল -পূর্বসূরী প্লেটোর কাছ থেকে সৌন্দর্য বিচারে অজাগতিকতা-তত্ত্বটুকুমাত্র গ্রহণ করে সৌন্দর্যদর্শনে কাব্যিক ঐশ্বর্যের নতুন স্পর্শ এনে ফেলেন তাঁর স্বতন্ত্র বিচার-ক্ষমতা প্রয়োগে। প্লোটিনিউ-ও সামঞ্জস্যে বিশ্বাসী, তবে অ্যারিস্টটলীয় সামঞ্জস্যে নয়। প্লোটিনিউ-কথিত সামঞ্জস্য হচ্ছে, মহাজাগতিক সামঞ্জস্যের প্রতীক মাত্র। শিল্প হিসেবে এইজন্য প্লোটিনিউ নৃত্যের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ ঐক্য বা যথার্থ সুন্দরের সন্ধান পেয়েছিলেন। জগতে যা কিছু সুন্দর ও মঙ্গলময়, প্লোটিনিউ-এর মতে, সবই এসেছে স্বর্গীয় সৌন্দর্যের সঞ্চয় থেকে। প্রকৃত মঙ্গল ও সুন্দরের অধিষ্ঠানভূমি সেই অলৌকিক স্বর্গলোক। সৌন্দর্যকে জাগতিক সীমাশাসনের ঊর্ধ্বস্থ এক আদর্শ স্বর্গলোকের সৌন্দর্যের প্রতীক রূপে গ্রহণ করার পর সংগত কারণেই প্লোটিনিউ সুন্দরকে বিদেহী ও আধ্যাত্মিক সত্য বলে ঘোষণা করলেন।[৩]

খ্রীষ্টীয় আদর্শে বিশ্বাসী সন্ত অগাষ্টিন, সংগীতকে উন্নততর শিল্পরূপে গণ্য করেছিলেন।[৪] যেহেতু তিনিও নিউ-প্লেটোনিক আদর্শে বিশ্বাসী এবং স্বর্গীয় সৌন্দর্যকে জাগতিক সৌন্দর্যের মূলাধার মনে করেছিলেন, তাই তাঁর কাছেও ইহজগতে যা কিছু সুন্দর সবই বৃহত্তর ঐশ্বরিক সুন্দরের সঙ্গে একতানবদ্ধ। বৃহতের সংকেতটুকুমাত্র ক্ষুদ্র জগতে প্রতিবিম্বিত হতে দেখেছেন তিনি। পঞ্চদশ শতকের শেষ পাদে ইতালীয় রেনেসাঁস লগ্নের নিও-প্লেটোনিক দার্শনিক মার্সিলিও ফিসিনো তাঁর 'দ্য আমোর' গ্রন্থে প্রেমানুভূতিকে সৌন্দর্যবোধের উৎস বলে উল্লেখ করলেন। তাঁর মতে, প্রেমই অসুন্দরকে 'সুন্দর' করে এবং প্রেমের উদ্বোধনেই মানুষ সুন্দর সম্পর্কে আকর্ষণ বোধ করে।'[৫] ফিসিনো লিখছেন, সৃষ্টির আদিম অবস্থায় ছিল বিশৃঙ্খলা, তারপর প্রেমের বিকাশে বিশৃঙ্খলায় আসে রূপ এবং মৃতের বুকে সঞ্চারিত হয় প্রাণ। প্রেম অন্তরকে উদ্বোধিত করে, সুন্দরও সেই একই কাজ করে। সুন্দরের অনুভূতি একান্তই আত্মিক। যেহেতু সুন্দর

আত্মিক উপলব্ধি, অতএব সুন্দর সম্পূর্ণত দৈহিক গুণাগুণের উর্ধ্বে। ফিসিনো তাঁর বক্তব্য এইভাবে উপস্থিত করলেন : 'It is an incorporeal quality which pleases. What pleases is attractive, and what is attractive is, in short, beautiful.'৬

অতএব, দেখা যাচ্ছে প্লেটো জাগতিক সুন্দরকে স্বর্গীয় সুন্দরের প্রতিফলন বলে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু অ্যারিস্টটল বাহ্য শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্যকে সুন্দরের হেতু বলে ঘোষণা করলেন। নিও-প্লেটোনিক বলে চিহ্নিত দার্শনিকেরা প্লেটোর পদ্ধতি অনুসারেই সুন্দরের স্বরূপ আলোচনা করলেন এবং বিদেহী আধ্যাত্মিক সুন্দরকে স্বর্গীয় সুন্দরের সঙ্গে একতানবদ্ধ ও আত্মার উদ্বোধক বলে ঘোষণা করলেন। অর্থাৎ সৌন্দর্যের স্বরূপ সন্ধানে দার্শনিকেরা বাস্তব জগৎ ও বাস্তবাতীত ভাবজগৎ দুদিকেই তাঁদের বিশ্লেষণী দৃষ্টি প্রসারিত করেছেন। তারপর থেকে কেউ সৌন্দর্যের বাস্তব-রূপ কেউ বা সৌন্দর্যের একান্তই অনুভূতিগ্রাহ্য ভাবরূপ সন্ধান করেছেন।

অষ্টাদশ শতকের জার্মান দার্শনিক বৌমগার্টেন অ্যারিস্টটলীয় পদ্ধতিতে বস্তুর সমঞ্জস্যপূর্ণ ঐক্যকে বললেন সুন্দর। কিন্তু নিও-প্লেটোনিকদের ও একই সঙ্গে অ্যারিস্টটলকে অস্বীকার করে বললেন, সুন্দরের ভূমিকা হচ্ছে আমাদের কামনা উত্তেজিত করা। সুন্দরের অতীন্দ্রিয় অস্তিত্ব তিনি মানলেন না। এই পর্বেই ইংরেজ দার্শনিক শাফটেসবেরী সমানুপাতিক ও সুসমঞ্জসকে সুন্দর বলে ঘোষণা করলেন অ্যারিস্টটলীয় পদ্ধতিতে। কিন্তু তারপরই বললেন, যা সমানুপাতিক ও সুসমঞ্জস তাই সত্য। আবার যা সত্য ও সুন্দর তাই মঙ্গলদায়ক। ঈশ্বরই যাবতীয় সৌন্দর্যের স্রষ্টা। অ্যারিস্টটলীয় ও নিও-প্লেটোনিক বিশ্বাসের মিলন ঘটল শাফটেস্‌বেরীর মন্তব্যে। শতকের শেষার্দ্ধে বার্ক ব্যক্তি ও সমাজের অস্তিত্ব ও বিস্তারের পিছনে সুন্দরের সক্রিয় ভূমিকা লক্ষ্য করে সৌন্দর্য বিচারে নতুন মাত্রা সংযোজন করলেন। পরবর্তীকালে ডারউইন ও ফ্রয়েড নিজস্ব ভঙ্গিতে এই ধারণার বিস্তার ঘটিয়েছিলেন। সুন্দরের বোধ শুধু মানুষের মধ্যেই নেই, পশু পক্ষীর মধ্যেও আছে, বললেন ডারউইন। পাখীর সুন্দর বাসা, সুন্দর গান এ সবই সুন্দর, যদিও পাখীর বাসা-নির্মাণ ও সংগীত পরিবেশনে প্রয়োজনের ভূমিকা বর্তমান। সুন্দর বস্তুতে উদ্দেশ্যহীনতা থাকতে হবে,

এ বিশ্বাস ডারউইনের ছিল না। আর ফ্রয়েড তো শিল্পকর্মে শিল্পীর অপূর্ণ কামনার তৃপ্তিলাভের উদ্দেশ্য খুঁজে পেয়ে শিল্প ও সৌন্দর্যের চূড়ান্ত উদ্দেশ্যমূলকতা ঘোষণা করলেন। বার্ক-এর রচনায় যে ধারণার সংকেত ছিল তা একজাতীয় চূড়ান্ত মতবাদের প্রারম্ভিক সূচনা। এই মতবাদের বিপরীত ধারণা পোষণ করতেন কাণ্ট (১৭২৪-১৮০৪)। ইংরেজ দার্শনিক কেম্‌সের (১৬৯৬-১৭৮২) সঙ্গে কাণ্টের একটি বিষয়ে সাদৃশ্য চোখে পড়ে যে, কেম্‌সের মত কাণ্ট সৌন্দর্যকে taste বা আস্বাদন-নির্ভর অনুভূতিবিশেষ বলে উল্লেখ করেছেন এবং উভয়েই একমত যে সুন্দরবস্তুমাত্রই আনন্দদায়ক। কিন্তু কাণ্ট এই আনন্দকে বিশিষ্ট করে তুললেন, উদ্দেশ্য-নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ আনন্দ বলে। তাঁর 'ক্রিটিক অব যাজমেণ্ট' গ্রন্থে সৌন্দর্য সম্পর্কে কাণ্ট যে সমস্ত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছেন সেগুলি এইভাবে সূত্রাকারে নিবদ্ধ হতে পারে: (ক) সৌন্দর্য আস্বাদন-নির্ভর। (খ) সৌন্দর্য আনন্দদায়ক, কিন্তু এই আনন্দ নির্লিপ্ত মনের আনন্দ। (গ) সৌন্দর্য যে আনন্দ দান করে তা বিশ্বজনীন। কাণ্ট এইভাবে সৌন্দর্যের আস্বাদনে উদ্দেশ্যহীন নির্লিপ্ত মানসিকতার গুরুত্ব আবিষ্কার করে সুন্দরের বস্তুনিরপেক্ষ অতীন্দ্রিয় একটি ভাবরূপ প্রতিষ্ঠিত করলেন।

বস্তুজাগতিক প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে অতীন্দ্রিয় বিশুদ্ধ আস্বাদন রূপে সৌন্দর্যকে গ্রহণ করে কাণ্ট যে ধারা প্রবর্তন করেন, সেই ধারায় শিলার (১৭৫৯-১৮০৫), ফিক্‌টে (১৭৬২-১৮১৪) এবং পরে হার্বার্ট স্পেন্সরের (১৮২০-১৯০৩) মতবাদের বিকাশ। কাণ্ট-কে অনুসরণ করেই শিলার সৌন্দর্যকে ও শিল্পকে মানবাত্মার খেলা বা লীলা বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, সুন্দরের সঙ্গে মানুষ খেলা করে এবং তখনই এই খেলা সম্ভব হয় যখন মানুষ পূর্ণতা লাভ করে এবং পূর্ণ মানুষই শুধুমাত্র সুন্দরের সঙ্গে খেলা বা লীলা করে। শিলার মানবাত্মার খেলা করার প্রবৃত্তির চরম উদ্দেশ্য সন্ধান করেছিলেন সৌন্দর্যের জগতে। যে-খেলায় সৌন্দর্য মূল লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য ফললাভ; তাকে জুয়াখেলার পর্যায়ভুক্ত করা যেতে পারে; শিলারের বক্তব্য বোধহয় অনেকটা এই জাতীয়। স্পেন্সর শিলারকে অনুসরণ করেই সৌন্দর্যে মানবাত্মার খেলা বা লীলা লক্ষ্য করেছিলেন। জীবজন্তু, মানুষের মতই খেলা করে, তবে সে

খেলা তাদের জীবিকা-নির্বাহ কর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত। কিন্তু মানুষের জীবন প্রয়োজনের সীমাতেই বদ্ধ নয়, তার খেলাতে প্রকাশিত হয় তার জীবনের প্রয়োজনোত্তীর্ণ উদ্বৃত্তাংশ। শিল্প ও সৌন্দর্য এই উদ্বৃত্তাংশের সঙ্গে যুক্ত। মানবাত্মার একজাতীয় মুক্তি ঘটে তার শিল্পে, তার সৌন্দর্য বোধে। ফিক্‌টেও সৌন্দর্যের মধ্যে মুক্ত-আত্মার স্বাধীন সঞ্চরণ লক্ষ্য করেছিলেন। তাঁর মতে, বস্তুর গুণ বা ধর্ম ব্যক্তির গুণ বা আস্বাদনের উপর নির্ভরশীল। বস্তুর পৃথক্ কোন সৌন্দর্য বা অসৌন্দর্য নেই। অর্থাৎ ফিক্‌টে 'অহং'কেই প্রাধান্য দিলেন। কিন্তু জোসেফ ফন শিলিং (১৭৭৫-১৮৪৫) তাঁর জীবনের প্রথম দিকে ফিক্‌টের 'অহং'বাদে মুগ্ধ থাকলেও তাঁর দার্শনিক জীবনের দ্বিতীয় স্তরে (১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে) 'ট্রান্সেন্ডেন্টাল আইডিয়ালিষ্ট' রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এই সময় শিলিং সুন্দরকে সীমার মধ্যে অসীমের প্রকাশ বলে গ্রহণ করে বলেন, দক্ষতা বা জ্ঞানের দ্বারা শিল্পী সুন্দরকে মূর্তিদান করেন না। শিলিং-এর মত হেগেলও (১৭৭০-১৮৩১) সুন্দরকে সীমার মধ্যে অসীমের অভিব্যক্তি বলে গণ্য করেছেন। হেগেলের মতে, সৌন্দর্য হচ্ছে 'আইডিয়া'র সীমাশাসিত মূর্তি। প্রকৃতিতে সৌন্দর্য আছে, সৌন্দর্য আছে শিল্পেও। কিন্তু শিল্পের সৌন্দর্য হচ্ছে মনের মধ্যস্থতায় নবরূপ প্রাপ্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। হেগেল কাণ্টের মত বলেন নি যে, শিল্প প্রকৃতির অনুরূপ হলেই শিল্প সুন্দর হবে; বরং তাঁর মতে শিল্পের উপাদান প্রকৃতি থেকে সংগৃহীত হলেও শিল্পের সৌন্দর্য মনের সৃজন ক্ষমতার সৃষ্টি। অতএব শিল্পের সৌন্দর্যই মহত্তর। সৌন্দর্য ও শিল্প সম্পর্কে হেগেলের স্মরণীয় বক্তৃতাগুলি ১৮৩৫-এর আগে প্রকাশিত হয় নি। তার পূর্বেই অর্থাৎ শিলিং এবং হেগেলের রচনা প্রকাশের মধ্যবর্তীকালে শোপেনহাওয়ার-এর '**The World as Will and Idea**' (প্রথম প্রকাশ— ১৮১৯-এ পরিমার্জিত সংস্করণ ১৮৪৪-এ) প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে শোপেনহাওয়ার (১৭৮৮ - ১৮৬০) সৌন্দর্যবোধকে এমন একটি শক্তি বলে অভিহিত করলেন, যার সাহায্যে মনের কামনার পুরো-পুরি মোক্ষণ ঘটে। অষ্টাদশ শতকে বৌমগার্টেন বলেছিলেন, সুন্দর আমাদের কামনার জাগরণ ও উত্তেজনা ঘটায়, কিন্তু শোপেনহাওয়ার সুন্দরকে গ্রহণ করলেন কামনা-বাসনাহীন বিশুদ্ধ আনন্দসৃষ্টিক্ষম সত্য হিসেবে। অন্তরের বিশুদ্ধ একটি বাসনাহীন ধ্যানই রূপ নেয় শিল্প ও সৌন্দর্যের জগতে।

সৌন্দর্য সম্পর্কে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দার্শনিকদের এই সমস্ত মতবাদ

থেকে স্পষ্ট চোখে পড়ে— আসল সমস্যা ছিল এঁদের কাছে, সৌন্দর্য অজাগতিক, আধ্যাত্মিক, আস্বাদধর্মী? না, সুন্দরের অস্তিত্ব ও সার্থকতা বস্তুরূপনির্ভর? সৌন্দর্যের প্রয়োজনাত্মক এবং প্রয়োজন-সম্পর্ক-শূন্য মূল্য নিয়ে দার্শনিকদের মতভেদও আমরা দেখলাম। সৌন্দর্য নির্গুণ এবং সগুণ, সৌন্দর্য নির্বিশেষ ও বিশেষ, এই দু'জাতের মতই আমরা দেখেছি, বিকাশ পেয়েছে সেই সুপ্রাচীন কাল থেকে। বিশ শতকের প্রারম্ভে ক্রোচে আবার বিশুদ্ধ প্রকাশকে 'সুন্দর' এবং ত্রুটিপূর্ণ প্রকাশকে 'কুৎসিত' বলে সুন্দর ও অসুন্দরের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে গিয়ে নতুন তত্ত্ব উচ্চারণ করলেন। শিল্পে 'ফর্ম'টাই বড়, 'ফর্ম' ছাড়া কিছুই নেই আর; ক্রোচের এই ধারণাই তাঁকে এই জাতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্ররোচিত করেছিল। অথচ তাঁর প্রায় সমকালেই রুশদেশের মহান শিল্পী লিও-টলস্টয় ভাবপ্রকাশে শিল্পীর নিষ্ঠা, সততা ও আন্তরিকতার গুরুত্বের উপর জোর দিলেও 'সৌন্দর্য' শিল্পের অত্যাবশ্যক এবং অপরিহার্য গুন বলে গ্রহণ করতে সম্মত হলেন না। শুধু তাই নয়, ধিক্কার দিলেন সৌন্দর্যরসিক বিলাসী-শিল্পীদের, যাঁদের রূপ-পিপাসা শিল্পকে ধনীর বিলাসের উপকরণে পরিণত করে বৃহত্তর জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে।

ভারতীয় আলংকারিকেরা 'সৌন্দর্য' অর্থে 'চারুত্ব', 'চমৎকার' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তাঁদের কাছে 'সৌন্দর্য' কোন বস্তুর গুণ নয়, সৌন্দর্যবোধের অধিষ্ঠান রসিকের হৃদয়ে। তাঁর হৃদয়ের প্রসাদেই কোন বস্তু 'সুন্দর' অথবা 'অসুন্দর'। 'সৌন্দর্য'কে তাঁরা বলেছেন 'রস', বলেছেন 'চিত্তবিস্তারক'। অগ্নিপুরাণে 'সৌন্দর্য', 'রস' এবং 'আত্মচৈতন্য'কে সমার্থক বলে গণ্য করা হয়েছে। 'বক্রোক্তিজীবিত'কার কুন্তকের মতে সৌন্দর্য হচ্ছে 'কবিকর্ম' আর পণ্ডিত জগন্নাথের মতে নিষ্কাম পরিতৃপ্তি ও অজাগতিক আনন্দই প্রকৃত 'সৌন্দর্য'। ভারতীয় আলংকারিকরা 'রস' সম্পর্কেই বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং কাব্যপাঠের আনন্দকে 'সৌন্দর্য' বলে গণ্য করে 'রস' ও 'সৌন্দর্য' একার্থকরূপে গ্রহণ করায় পৃথক্‌ভাগে 'সৌন্দর্য' সম্পর্কে আলোচনার আর প্রয়েজেন বোধ করেন নি। একমাত্র চতুর্দশ শতকে আলঙ্কারিক বিশ্বেশ্বররচিত 'চমৎকার চন্দ্রিকা' ছড়া সৌন্দর্যবিষয়ক আর কোন গ্রন্থ চোখে পড়ে না।

বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র দার্শনিক-পন্থায় না হলেও 'সৌন্দর্য' সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন (আর্যজাতির সূক্ষ্মশিল্প: বঙ্গদর্শন, ১২৮১ ভাদ্র)। এই

প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র সৌন্দর্যসৃষ্টির সামগ্রী হিসেবে যে কয়েকটি উপাদানের উল্লেখ করেছেন, সেগুলি হচ্ছে—বর্ণ, আকার, গতি, রব এবং অর্থযুক্ত বাক্য। ফুলের সৌন্দর্য বর্ণ ও আকারগত, গতির দ্বারা নৃত্যের সৌন্দর্য, রবের দ্বারা সংগীত এবং অর্থযুক্ত বাক্যের দ্বারা কাব্যের সৌন্দর্য। 'সৌন্দর্য' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথই বিস্তারিত আলোচনা করেছেন তাঁর জীবনের বিভিন্ন স্তরে। তাঁর মতে: ১) 'সৌন্দর্য আত্মার সহিত জড়ের মাঝখানকার সেতু' (ব্যোমের উক্তি: পঞ্চভূত); ২) 'সৌন্দর্য অনুভব করিবার জন্য সুন্দর জিনিসের আবশ্যকতা নাই, ভক্তি বিতরণ করিবার জন্য ভক্তিভাজনের প্রয়োজন নাই—এরূপ পরম সন্তোষের অবস্থাকে আমি সুবিধা মনে করি না' (ক্ষিতির উক্তি: পঞ্চভূত); ৩) 'প্রেম যেখানে ভাব, সৌন্দর্য সেখানে তাহার অক্ষর; প্রেম যেখানে হৃদয়, সৌন্দর্য সেখানে গান; প্রেম যেখানে প্রাণ, সৌন্দর্য সেখানে শরীর; এই জন্য সৌন্দর্যে প্রেম জাগায় এবং প্রেমে সৌন্দর্য জাগাইয়া তুলে' ('আলোচনা' গ্রন্থে); ৪) 'অসীম ও সসীম এই সৌন্দর্যের মালা লইয়া মালাবদল করিয়াছে' (ঐ)। 'সৌন্দর্য'কে রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন অনেকটা নিও-প্লেটোনিকদের দৃষ্টি দিয়ে। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে উপনিষদের ঋষিকবিদের এবং বৈষ্ণব দার্শনিকদের দৃষ্টিভঙ্গির সাদৃশ্য সন্ধানও ব্যর্থ হবে না আশা করি। কিন্তু দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটিতে ক্ষিতির মুখ দিয়ে সৌন্দর্যবিচারে সুন্দর বস্তুর objective মূল্য রবীন্দ্রনাথ যেভাবে সংকেতে ব্যক্ত করেছেন 'বঙ্গদর্শনে' (২য় পর্যায়) প্রকাশিত এবং জাতীয় শিক্ষা পরিষদে প্রদত্ত বক্তৃতামালায় সেই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে সুন্দরের মধ্যে সামঞ্জস্য, মঙ্গল ও সত্য সন্ধান করেছেন। সুন্দর বস্তুর প্রতিটি অংশের সামঞ্জস্যই যে শুধু তাকে সুন্দর করে তা নয়, এই সামঞ্জস্য ক্রমশঃ বাহ্যরূপ অতিক্রম করে বৃহৎ জগতের বিভিন্ন বস্তুর সঙ্গে সুন্দরকে একসূত্রে আবদ্ধ করে, এই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্ত। এই জাতীয় সুন্দরকেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন মঙ্গলময় এবং যা সামঞ্জস্যপূর্ণ ও মঙ্গলময় তাকেই আবার গ্রহণ করেছেন সত্যরূপে। সত্যের সঙ্গে সুন্দরের সম্পর্ক আলোচনায় তিনি স্মরণ করেছেন কীট্‌সের সেই প্রবাদপ্রতিম উক্তি—সুন্দরই সত্য, সত্যই সুন্দর। ভারতীয় রসবাদীদের 'রসই কাব্যের আত্মা' এই সিদ্ধান্তে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাসী ছিলেন কিন্তু যখন বলেন: 'সৌন্দর্য প্রকাশই সাহিত্যের বা আর্টের মূল লক্ষ্য নয়। এ সম্বন্ধে আমাদের দেশে অলংকারশাস্ত্রে চরম কথা বলা হয়েছে; বাক্য রসাত্মকং কাব্যম্' তখন

তিনি যে রস ও সৌন্দর্যকে সংস্কৃত আলংকারিকদের মত সমার্থক মনে করেন নি সেই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করতে হয়। আমাদের এই সিদ্ধান্ত সত্য প্রমানিত হয় তাঁর এই মন্তব্যে: 'বলতুম, সুন্দর আনন্দ দেয় তাই সাহিত্যে সুন্দরকে নিয়ে কারবার। বস্তুত বলা চাই, যা আনন্দ দেয় তাকেই মন সুন্দর বলে, আর সেটাই সাহিত্যের সামগ্রী।' অর্থাৎ 'আনন্দ' ('রস' ও বলা যায় বোধ হয়) ও সুন্দর পৃথক দুটি গুণ তো বটেই, এমন কি সুন্দর স্বীকৃতি লাভ করে আনন্দদায়কত্বের জন্যই। অসাধারণ শব্দকুশলী শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ নানান উদাহরণ দিয়ে সুন্দর সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত জানালেন অনবদ্য ভঙ্গিতে: 'সুন্দর জিনিষের বাইরের উপকরণে আর ভিতরের পদার্থে হরিহর আত্মা— যেমন রূপ তেমনি ভাব। বহিরঙ্গ যা তার সঙ্গে অন্তরঙ্গের অবিচ্ছেদ্য মিলন ঘটিয়ে সুন্দর বর্তমান হল।' এবং 'আকাশের রামধনুতে যিনি সুন্দর, তিনি রয়েছেন পৃথিবীর ধূলিকণায়, তিনিই রয়েছেন অতলের তলাকার একটুকরো ঝিনুকের ভিতরে বাইরে সমান সৌন্দর্য ও শোভা বিকীর্ণ করে।' সুন্দরকে অবনীন্দ্রনাথ সীমার ধ্যান থেকে মুক্তি দিয়েছেন অথচ অসীমই যে সীমার মধ্যে শোভা পাচ্ছেন চিরপরিচয়ের মধ্যে নবপরিচয়ের ঔজ্জ্বল্যে (অনেকটা হেগেলের absolute-এর মত), এ সত্য তাঁর চোখ এড়িয়ে যায় নি। মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ বা অবনীন্দ্রনাথকে 'subjectivist' বা 'objectivist' বলে পৃথকীকৃত দুটি শ্রেণীর কোন বিশেষ একটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব নয়। তাঁরা নিজেরা ছিলেন শিল্পী, বিশ্বাসী ছিলেন ভারতীয় ঐতিহ্যে অথচ পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য ও দর্শনের সঙ্গে ছিল তাঁদের অন্তরঙ্গ পরিচয়। মনে হয়, এই কারণেই তাঁরা সৌন্দর্যের কমলবনে দার্শনিক মত্তহস্তীদের লড়াই-এ অংশ গ্রহণ করতে পারেন নি।

এখন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দার্শনিকেরা দীর্ঘকাল ধরে সৌন্দর্যের স্বরূপোদ্ঘাটনের যে প্রচেষ্টা করেছেন তা থেকে সৌন্দর্যের সংজ্ঞা নয়, সাধারণ একটা পরিচয় সংগ্রহের চেষ্টা করা যেতে পারে: ক) সৌন্দর্য উপলব্ধির জন্য সুন্দর বস্তুর অস্তিত্ব অত্যাবশ্যক কিন্তু বস্তুর বাহ্য অবয়বে সৌন্দর্য সীমাবদ্ধ নয়। বস্তুর বাহ্যরূপেই সৌন্দর্যের চরম পরিচয় থাকলে একই বস্তু বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে অথবা একই ব্যক্তির কাছে একই বস্তু বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আবেদন সৃষ্টি করত না। খ) সৌন্দর্য গাণিতিক পদ্ধতিতে প্রামাণ্য নয়। গাণিতিক সূত্রের বিরোধিতা করেও সুন্দর আপন অস্তিত্ব ঘোষণা করে থাকে।

গ) সুন্দর অথচ আনন্দদায়ক নয়, এমন কোন সুন্দরের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। এই আনন্দ অবশ্যই প্রাত্যহিক সংসারের লাভালাভের উপর নির্ভরশীল নয়। ঘ) সর্বোপরি, সৌন্দর্য চিন্ময় কিন্তু তাই বলে একান্ত ব্যক্তিক নয়।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, শিল্পের জগতে 'সৌন্দর্য' শব্দটি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা এবং সীমা কোথায়? একথা অনস্বীকার্য যে, শিল্প আমাদের আনন্দদান করে থাকে এবং স্পষ্টত কোন উদ্দেশ্য সফল করার দায়িত্ব স্বীকার করে না। কিন্তু শিল্প থেকে আনন্দলাভ হয় কেন? বিভিন্ন কারণের মধ্যে শিল্পের সুন্দররূপও আনন্দদানের অন্যতম কারণ। একখানি সুগীত সংগীত, একখানি রেখা-বর্ণের সার্থক সংস্থানে সু-অঙ্কিত চিত্র, সমৃদ্ধ শব্দভাণ্ডারে গঠিত একটি কবিতা আমাদের অন্য সবকিছু নিরপেক্ষভাবেই আনন্দ দিয়ে থাকে। সুতরাং বাহ্য সৌন্দর্য থেকে আনন্দলাভ হয়ে থাকে, সে কথা স্বীকার্য। আবার মহৎ ভাব, মহৎ আদর্শ যখন শিল্পে মূর্ত হয়ে ওঠে তখনও সেই শিল্পকে বলি সুন্দর। অর্থাৎ নৈতিক সৌন্দর্যও একজাতীয় সৌন্দর্য এবং শিল্পে তার রূপ আনন্দদায়ক। কিন্তু যাবতীয় সুন্দরই শিল্পে তখনই স্বীকৃত হয় যখন তা শিল্পের ধর্মকে ক্ষুণ্ণ করে কতকগুলি মন্তব্যে সীমাবদ্ধ হয়ে না থাকে। মোটকথা 'সৌন্দর্য' শিল্পে 'উপেয়' নয়, 'উপায়'। 'আনন্দ'কে যাঁরা লক্ষ্য মনে করেন তাঁরা তো বটেই, এমনকি সমাজপ্রগতিতে সাহিত্যের অংশগ্রহণকে সাহিত্যের উদ্দেশ্য বলে ঘোষণা করেছেন যাঁরা, তাঁরাও শিল্পে সুন্দরকে কামনা করেন শিল্পেরই স্বার্থে। শিল্প হিসেবে অসার্থক এবং অসুন্দর সৃষ্টিকে কোন সচেতন সাহিত্যরসিকই স্বীকৃতি দেন নি (তার বক্তব্য যত মহৎই হোক)। অতএব 'সৌন্দর্য' শব্দটিকে ভাববাদী বা বস্তুবাদীরা যে যে-ভাবেই ব্যাখ্যা করুন না কেন, অসুন্দর সৃষ্টিকে শিল্প-সাহিত্যের রাজত্বে রাজাসন দেন নি কেউই।

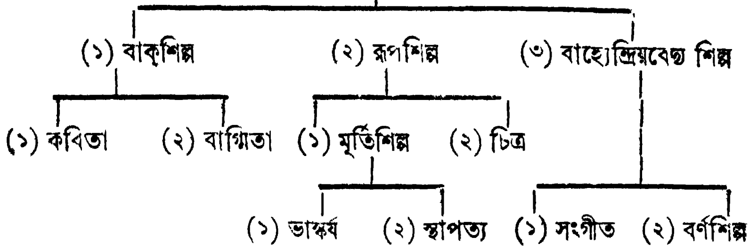
গ ॥ শিল্পে শ্রেণী বৈষম্য ও সাদৃশ্য

সাহিত্য, সংগীত, চিত্র, স্থাপত্য, ভাস্কর্য থেকে আরম্ভ করে উত্তম বক্তৃতা পর্যন্ত অনেক কিছুকেই আমরা 'শিল্প' আখ্যা দিয়ে থাকি। কিন্তু এই সমস্ত

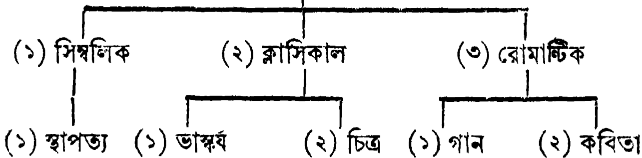
শিল্পকর্মের মধ্যে এমন কোন সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে কি যার সাহায্যে সাধারণ 'শিল্প' অভিধাতে সব কিছুকে চিহ্নিত করা সম্ভব? আবার সাধারণ ধর্মে ঐক্য থাকলেও বিভিন্ন শ্রেণীর শিল্পের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি? সুন্দররূপের মাধ্যমে আনন্দদান, এই হচ্ছে সমস্ত শিল্পের সামান্য ধর্ম ও মূল লক্ষ্য। 'আনন্দ' হিসেবে ভাল কাব্য-পাঠজনিত আনন্দের সঙ্গে ভাল সঙ্গীতশ্রবণ ও চিত্রদর্শন-জাত আনন্দের মধ্যে পার্থক্য নেই। সুন্দর রূপের মাধ্যমে আনন্দদান যেমন সমস্ত শিল্পের সাধারণ লক্ষ্য বলে শিল্পের জগতে একটা ঐক্য আছে তেমনি উপাদান ও পৃথক পৃথক ইন্দ্রিয়ের দুয়ারে প্রাথমিক আবেদনের জন্য বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে একটা অনৈক্যও স্পষ্ট। রঙে-রেখায় গড়ে ওঠা চিত্রের আবেদন দর্শনেন্দ্রিয়ের কাছে, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের আবেদন দর্শনেন্দ্রিয় ও স্পর্শেন্দ্রিয়ের কাছে এবং সুরের ইন্দ্রজালে শ্রবণেন্দ্রিয়কে মোহিত করে সংগীত। কিন্তু বাহ্যেন্দ্রিয়ের দুয়ারে এই সমস্ত শিল্পের প্রাথমিক আবেদন হলেও অন্তরই সমস্ত শিল্পের উৎকর্ষ ও অপকর্ষের সর্বশেষ সাক্ষ্যদাতা। কেবল কাব্য-সাহিত্যের প্রথম ও শেষ আবেদন অন্তরিন্দ্রিয়ের কাছে। অন্ধের পক্ষে চিত্র, ভাস্কর্য বা স্থাপত্যের রূপ-দর্শন ও রস-উপভোগ সম্ভব নয় কিন্তু অপরের কাব্য পাঠ শুনে অন্ধ ব্যক্তি আনন্দ পেতে পারেন। বধিরের পক্ষে সংগীতের সুরে মূর্ছিত হওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু কাব্যরসাস্বাদনে বধিরতা কোন বাধা নয়। বোধ হয় সেই কারণেই কাব্য-সাহিত্যকেই অনেক শিল্পী ও দার্শনিক শিল্পের জগতে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন। যেমন কাণ্ট ও হেগেল। কিন্তু শোপেনহাওয়ার ও ওয়াল্টার পেটার (আরও অনেকে) প্রাধান্য দিয়েছেন সংগীতকে। হ্যাজলিট শ্রেষ্ঠ গণ্য করেছিলেন চিত্রকে। রোজার ফ্রাই আবার সরাসরি অধিক আবেদনসমৃদ্ধ বলে চিত্র, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যকে কাব্য-সাহিত্যের ঊর্ধ্বে স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু কবিতা, গান ও ছবির সুদক্ষ শিল্পী রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য হচ্ছে, তিনি প্রতিটি শিল্পের স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাস করেন, বৈপরীত্যে নয়। কিন্তু এও জানেন যে- কোন শিল্পই অন্য শিল্পকে আতিথ্য দানে অকুণ্ঠিত। অতএব চিন্তাবিদ্‌দের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। সেটা স্বাভাবিকও। কারণ শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে আছে রুচির প্রশ্ন। আর রুচির অনৈক্য ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করে।

বিভিন্ন শিল্পের উপাদান ও আবেদন গত পার্থক্যের দিক থেকে কাণ্ট ও হেগেল পৃথক ভঙ্গিতে হলেও শিল্পের জগৎকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করেছেন।

কাণ্ট



হেগেল



কবিতা ও বগ্মিতা উভয়কেই কাণ্ট এক বাক্‌শিল্পেরই অন্তর্গত করেছেন। তাঁর মতে, যদিও বাগ্মীর অলংকৃত বাগ্‌বিন্যাস এবং কবির কবিতার প্রধান মাধ্যম ভাষা তবু কবিতা শিল্প হিসাবে বক্তৃতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কবিতায় কল্পনার স্বাধীন লীলা। বাক্‌কুশলীও চিন্তার লীলাবিলাসে আবিষ্ট। বাগ্মীর বক্তব্যে বাস্তবজীবন সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি থাকে বিস্তর যা পালন না করে শ্রোতাকে অনায়াসে বঞ্চিত করতেও পারেন তিনি, আর কবি তাঁর পাঠককে পাইয়ে দেন অনেক অকল্পনীয় ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার। জন ষ্টুয়ার্ট মিল তাঁর 'Thoughts on the poetry and its varieties' প্রবন্ধে (১৮৩৩, সংশোধিত ১৮৫৯) কবিতার সঙ্গে বাগ্মিতার পার্থক্য ও সম্পর্ক আলোচনা করেছেন যা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। মিল বলছেন, যদি

বাগ্মিতা ও কবিতার বৈপরীত্যে আমরা বিশ্বাস না-ও করি তবু পার্থক্য আছেই এবং তা হচ্ছে এই: **'eloquence is heard, poetry is overheard'**। তাছাড়া বাগ্মীর সম্মুখে থাকে শ্রোতা, কিন্তু কাব্যপাঠকের অবস্থান কবির অচেতনলোকে। কবিতা স্বগতোক্তি সদৃশ; কিন্তু বাগ্মী অপরের সহানুভূতি ও মনোযোগ আকর্ষণের বিষয়ে সজাগ, অপরকে প্রভাবিত করার দিকে উন্মুখ। সর্বোপরি কবিতা নির্জনতা ও ধ্যানের ফসল, কিন্তু বাগ্মিতার জন্ম জাগতিক প্রয়োজনে এবং সামাজিক মানুষের সঙ্গে মেলামেশা ও আদান-প্রদানের ফলে। ...শেষের বাক্যাটিতে মিল কবিতাকে নির্জনতা ও ধ্যানের ফসল বলেছেন, কিন্তু এই জাতীয় মন্তব্যে কবি যে জগৎ সম্পর্কশূন্য আত্মমগ্ন ব্যক্তি মাত্র, এই বিশ্বাসই প্রবল হয়ে ওঠে যা নির্দ্বিধায় কিছুতেই মানা সম্ভব নয়। তাছাড়া এই মত অনুসরণ করে আরও কিছু দূর অগ্রসর হলে কবিকে দৈবানুপ্রেরিত বলার জন্য প্রলোভন জাগতে পারে। তা ভিন্ন কবি ও পাঠক, বাগ্মী ও শ্রোতার সম্পর্ক নিয়ে তাঁর বক্তব্য অবশ্য স্বীকার্য, যেমন শ্রদ্ধেয় এ বিষয়ে কাণ্টের সিদ্ধান্ত। কাণ্ট 'স্থাপত্য' ও 'ভাস্কর্য' সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। এই দুই শ্রেণীর শিল্পের মধ্যে সাদৃশ্য এইখানে যে, উভয় শ্রেণীর শিল্পই দর্শন ও স্পর্শেন্দ্রিয়বেদ্য। কিন্তু একই রূপশিল্পের অন্তর্গত হলেও চিত্রের আবেদন দর্শনেন্দ্রিয়ের নিকট, স্পর্শেন্দ্রিয়ের নিকট নয়; কারণ স্থাপত্য-ভাস্কর্যের মত চিত্রের কায়িক প্রসার নেই। আবার একই মূর্তিশিল্পের অন্তর্গত দলেও স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। ভাস্কর তাঁর অস্ত্রের আঘাতে পাথরের বুকে এমন রূপ ফুটিয়ে তুলতে পারেন বাস্তবে যার অস্তিত্ব অবশ্যই সত্য, কিন্তু স্থাপত্যে রূপ পায় কল্পনার সত্য। তা ছাড়া স্থাপত্যের একটা প্রয়োজনাত্মক মূল্য থাকায় শিল্পের জগতে স্থাপত্যের বিশুদ্ধ নান্দনিক মূল্য অন্যান্য শিল্পের তুলনায় কম। কিন্তু পাশাপাশি ভাস্কর্য উদ্দেশ্য-নিরপেক্ষ বলে বিশুদ্ধ শিল্পের মর্যাদার দাবিদার। স্থপতি যে মন্দির, অট্টালিকা ও স্মৃতিবোধ গড়ে তোলেন (এমনকি গৃহের আসবাবপত্রকেও কাণ্ট স্থাপত্যের অন্তর্ভুক্ত করেছেন) তার গুণ ফুটে ওঠে যথাযোগ্যতার মধ্যে। আর মানুষ, দেবতা বা জীবজন্তুর প্রতিমূর্তি গড়েন যে ভাস্কর তাঁকে উপযুক্ততার সমস্যা নিয়ে বিব্রত হতে হয় না। ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের মধ্যে প্রভেদ তো রয়েছেই, এমন কি চিত্রকেও কাণ্ট দু'ভাগে

ভাগ করেছেন :—ক) বিশুদ্ধ চিত্র, যা একান্ত কল্পনার সৃষ্টি ; খ) ঘাস, ফুল, গাছ, পাহাড় প্রভৃতি প্রাকৃতিক বস্তু অবলম্বনে অঙ্কিত চিত্র যা শুধুই কল্পনার খেয়াল নয়। সংগীত ও বর্ণশিল্পকে কান্ট একই ইন্দ্রিয়বেদ্য শিল্পের অন্তর্গত বলে উল্লেখ করেছেন, যদিও সংগীতের আবেদন শ্রবণেন্দ্রিয়ের দুয়ারে এবং বর্ণ আকর্ষণ করে দর্শনেন্দ্রিয়কে। শিল্পের বিভিন্ন শ্রেণীর স্বরূপ ও তাদের ভিতরকার সম্পর্ক আলোচনা শেষে কান্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, যাবতীয় শিল্পের মধ্যে কবিত-ই সর্বশ্রেষ্ঠ। কল্পনার স্বাধীন লীলার দ্বারা কবিতা মানব-মনের পরিপূর্ণ বিস্তার ঘটায়। শব্দের সীমাশাসন থেকে কল্পনা কবিতাকে মুক্তি দেয় সীমাহীন বিস্তারে।[১]

হেগেল, ভাব রূপ ও কল্পনার ভূমিকার দিকে লক্ষ্য রেখে শিল্পকে 'সিম্বলিক', 'ক্লাসিকাল' ও 'রোমান্টিক' এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করলেন। 'স্থাপত্য' হচ্ছে, তাঁর মতে, নির্বস্তুকভাবের দর্শন ও স্পর্শগ্রাহ্যরূপের উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত বা 'সিম্বলিক আর্ট'এর নমুনা। কিন্তু 'সিম্বলিক আর্ট-এ 'আইডিয়া'র প্রাধান্যের জন্য ভাব ও রূপের মধ্যে থাকে দ্বৈততা এবং এই শ্রেণীর শিল্পে রূপের উপর ভাবের প্রাধান্য। 'ক্লাসিকাল আর্ট'-এ ভাব ও রূপের পূর্ণ সামঞ্জস্য। 'ভাস্কর্য' ও 'চিত্র' 'ক্লাসিকাল আর্ট-এর দৃষ্টান্ত। তবে চিত্রে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের মত দৃষ্টিগ্রাহ্যতা থাকে কিন্তু চিত্র 'objective totality' থেকে মুক্ত। সংগীত ও কবিতা হচ্ছে 'রোমান্টিক আর্টের' দৃষ্টান্ত। সংগীতে যদিও ইন্দ্রিয়ের ভূমিকা অগ্রাহ্য করার মত নয়, তবু সুর বিষয়কে ভাষা ও বাস্তবজগতের বন্ধন থেকে দেয় পূর্ণমুক্তি ও স্বাধীনতা। তবে অন্যান্য সমস্ত শিল্প অপেক্ষা ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণের বহু ঊর্ধ্বে অবস্থান করে কবিতা সর্বাধিক স্বাধীনতা ভোগ করে। শুধু তাই নয়, সংকেতধর্মী ভাষার সহায়তায় কবি কাব্যে চিত্রের স্পষ্টতা ও সঙ্গীতের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করতে পারেন। কান্টের মত হেগেলও কবিতাকে যাবতীয় শিল্পের ঊর্ধ্বে স্থাপন করে মন্তব্য করেছেন, —'Poetry, is in short, the universal art of the mind, which has become essentially free, and which is not fettered in its realization to an externally sensuous material, but which is creatively active in the space and time belonging to the inner world of ideas and emotions'.[২]

কান্ট কবিতাকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছিলেন, যেহেতু কবিতা মানবমনকে পরিপূর্ণ বিস্তার দেয়। হেগেল কবিতাকে শ্রেষ্ঠ শিল্প বলেছেন, কারণ কবিতায় আছে মনের পূর্ণমুক্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য। অন্যদিকে শোপেনহাওয়ার সংগীতে বিশুদ্ধ 'will-less contemplation'-এর সন্ধান পাওয়ায় সংগীতকে স্থাপন করেছেন কবিতার ঊর্ধ্বে। ওয়াল্টার পেটারও সংগীতকে শ্রেষ্ঠাসন দিয়েছিলেন যেহেতু তিনি সংগীতে পেয়েছিলেন ভাব ও রূপের সর্বাধিক বাঞ্ছিত মিলন।

সুতরাং সমস্ত শিল্পের রসিকমাত্রেরই প্রধান প্রাপ্তি 'আনন্দ' হলেও শিল্পের জগতে শ্রেণীবৈষম্য স্বীকার করেছেন দার্শনিকেরা। অথচ রবীন্দ্রনাথ যে বলেছিলেন, প্রত্যেক শিল্পই অন্য শিল্পকে আতিথ্য দানে অকুণ্ঠ তার প্রমাণও দুর্লভ নয়। ক্লদ লোর্‌ঁয়া ও সালভাতোর রোসা-র ছবি অষ্টাদশ শতকের পাশ্চাত্ত্যের ভূদৃশ্যের বর্ণনা সম্বলিত বহু কবিতাকে যে প্রভাবিত করেছিল তা প্রমাণিত সত্য। লোর্‌ঁয়া-র আঁকা একটি ছবি থেকেই তাঁর অতি বিখ্যাত কবিতা 'Ode on a Grecian Urn' রচনার প্রেরণা লাভ করেছিলেন রোমান্টিক কবি জন কীট্‌স্। উগো, গোতিয়ের বা মালার্মে-রও বহু কবিতা আছে যেগুলি রচনার পশ্চাতে রয়েছে কোন না কোন প্রখ্যাত ছবির আদর্শ। সরাসরি কবিতার উপর ছবির এই প্রভাব ছেড়ে দিলেও ছবির ধর্ম 'প্রত্যক্ষতা' যে বহু শ্রেষ্ঠ কবির কবিতাকে বিশিষ্টতা দিয়েছে তার প্রমাণ আছে তাঁদের (কবিদের) 'ইমেজ' সমৃদ্ধ পঙক্তিগুলিতে। একটি উদাহরণ নিচ্ছি শেলীর বিখ্যাত দুটি পঙক্তি থেকে — 'Life, like a dome of many coloured glass, / Stains the white radiance of eternity.' জীবন সম্পর্কে দার্শনিক মন্তব্য করতে গিয়ে কবি যেন এখানে ভাষা নিয়ে ছবি এঁকেছেন, অনির্দিষ্টকে এনে দিয়েছেন ধরা ছোঁয়ার মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ এই ব্যাপারটি অতি সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন —"কথার দ্বারা যাহা বলা চলে না ছবির দ্বারা তাহা বলিতে হয়। সাহিত্যে এই ছবি আঁকার সীমা নাই। উপমা-তুলনা-রূপকের দ্বারা ভাবগুলি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতে চায়। 'দেখিবারে আঁখি-পাখি ধায়' এই এক কথায় বলরাম দাস কী না বলিয়াছেন? ...দৃষ্টি পাখির মতো উড়িয়া ছুটিয়াছে, এই ছবিটুকুতে প্রকাশ করিবার বহুতর ব্যাকুলতা মুহূর্তে শান্তিলাভ করিয়াছে।" সুতরাং শিল্প হিসেবে কবিতা ও ছবির মধ্যে শ্রেণী বৈষম্য যদি থাকেও, প্রয়োজনে কবিতা ছবির কাছ থেকে ঋণ হিসেবে গ্রহণ করে তার প্রত্যক্ষতার ধর্ম। আবার কখনও সাহিত্যের ভাষার ঋজুতা ও বলিষ্ঠতা লক্ষ্য করে আমরা লেখকের ভাষার ভাস্কর্যধর্ম সম্পর্কে

সশ্রদ্ধ মন্তব্য করি। যেমন রবীন্দ্রনাথের 'মেঘদূত' প্রবন্ধের ভাষা (১২৯৮ অগ্রহায়ণ): 'সেই সেখানকার উপবনে কেতকীর বেড়া ছিল, এবং বর্ষার প্রাক্‌কালে গ্রামচৈত্যে গৃহবলিভুক্ পাখীরা নীড় আরম্ভ করিতে মহাব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, এবং গ্রামের প্রান্তে জম্বুবনে ফল পাকিয়া মেঘের মতো কালো হইয়াছিল, সেই দশার্ণ কোথায় গেল?' এতো শুধু ছবি নয়, ভাষা যেন এখানে পাথরের বুকে খোদাইকরা ঋজু মূর্তি যা শুধু দেখা নয়, ছোঁয়াও যায়। পুনশ্চ সংগীতের সঙ্গে কাব্যের সম্পর্কও অতি নিকট। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: 'চিত্র এবং সংগীতই সাহিত্যের প্রধান উপকরণ। চিত্র ভাবকে আকার দেয় এবং সংগীত ভাবকে গতিদান করে। চিত্র দেহ এবং সংগীত প্রাণ'। সংগীতের ধর্ম যে গতি তা সাহিত্যে সত্য হয়ে ওঠে ভাষার সঙ্গে সুরের স্পর্শ ঘটায়। শুধু তাই নয় অর্থ বিশ্লেষণ করলে যে ভাষা বা শব্দ যৎকিঞ্চিৎ, সংগীতযুক্ত হলেই তা অসামান্য হয়ে ওঠে। সংগীতের এই অসামান্য শক্তির প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যগুলি। সোজাসুজি কবিতা হিসেবে 'শাপমোচন' যা ছিল, সংগীতের রূপে সমর্পিত হয়ে তার গতি ও ব্যঞ্জনা বেড়ে গেল কতখানি! পাঠ্য নাটক হিসেবে 'শ্যামা' বা 'চণ্ডালিকা'র যা আবেদন নৃত্য ও গীতের সমবায়ে তা কি আরও ব্যাপকতা লাভ করেনি? সুতরাং একাধিক শিল্পগুণ একত্র হলে যদি স্বাদ বেড়ে যেতে পারে অনেকখানি, তাহলে শিল্পের ভিতর শ্রেণী-ভেদ স্বীকার্য হলেও শ্রেণীদ্বন্দ্ব স্বীকার্য নয়। কাব্য-সাহিত্য যেমন সংগীত ও চিত্রের ধর্ম অঙ্গীকার করে নিজের আবেদন বৃদ্ধি করেছে, সংগীত এবং চিত্রও অনেক সময় সাহিত্যের বিষয়বস্তু গ্রহণ করে নিজের ক্ষেত্র ব্যাপক করে। আবার শিল্পীদের মধ্যে যিনি কাব্যের জগতে অতুলনীয় সেই রবীন্দ্রনাথের গান এবং ছবিও বিশ্বসভায় রসিকসুজনের কাছে পরম আদরের সামগ্রী। ইংরেজ কবি উইলিয়ম ব্লেকও একই হাতে কলম দিয়ে কবিতা লিখেছেন, এবং তুলি দিয়ে ছবি এঁকেছেন। অবনীন্দ্রনাথ, যাঁর তুলির টান আমাদের বিস্মিত করেছে, সেই তিনিও ভাষার যাদুশক্তির সাহায্যে অসাধারণ সাহিত্যসৃষ্টি করেছেন। সুতরাং শিল্পের জগতে কোন দণ্ডধারী সীমান্ত-প্রহরী নেই। যে কেউ অনায়াসে অপরের ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারেন অথবা অপরের কাছ থেকে উপাদান নিয়ে নিজের ক্ষেত্র উর্ব্বর করে তুলতে পারেন। তবে কবি-সাহিত্যিকই বোধ হয় সবচেয়ে স্বাধীন এবং কাব্য-সাহিত্যের শোষণ-শক্তি সবচেয়ে অধিক। সংগীতে, চিত্রে, স্থাপত্যে বা ভাস্কর্যে কাব্য বা সাহিত্য থেকে প্রাপ্ত উপাদানকে যেখানে শিল্পীরা নিজেদের শিল্পী-স্বভাবকে

অক্ষুণ্ণ রেখে প্রকাশ করেন, কবি বা সাহিত্যিক যেখানে অন্য শিল্পথেকে উপাদান তো গ্রহণ করেনই এমনকি চিত্রের প্রত্যক্ষতা, সংগীতের গতি, ভাস্কর্যের ঋজুতা ও (অর্থাৎ অপর শিল্পের মৌলিক ধর্ম) আত্মস্থ করেন। সহিত্যের এই শ্রেণীজ্ঞান-রাহিত্যই শিল্প হিসেবে সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে এবং সাহিত্যের অধিকাংশ (সব নয়) মূল সমস্যার সমাধান সমগ্রভাবে শিল্পের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়ে থাকে।

২॥ অন্তঃপুরে

ক ॥ প্রেরণা ও প্রতিভা ।

'স্বচ্ছশীর্ণ ক্ষিপ্রগতি স্রোতস্বিনী তমসার তীরে' উদ্বেগাকুল হৃদয়ে একাকী ভ্রমণরত মহর্ষি বাল্মীকি আপনার অন্তরে নবজাত 'পরিপূর্ণ বাণীর সংগীত'কে রূপদানের কামনায় তখন বেদনাকাতর। 'তরুণ গরুড় সম কী মহৎ ক্ষুধার আবেশ/পীড়ন করিছে তারে'। এমন সময় সন্ধ্যালগ্নে আবির্ভূত দেবর্ষি নারদ "কহিলা হাসি, 'সেই সত্য যা রচিবে তুমি,/ঘটে যা তা সব সত্য নহে'। অতঃপর 'বাল্মীকি বসিলা ধ্যানাসনে'। ধ্যানের গভীর লোক থেকে জন্ম নিল অপূর্ব রামায়ণ সংগাত।'[১]

অনুভূতির জাগরণ ও তাকে কাব্যরূপদানের মধ্যবর্তী অবকাশমুহূর্তে কবির অন্তর্লোকে যে বিচিত্র ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার জাগরণ ঘটে, ভাবলোকের সত্যকে সর্বসাধারণের সম্পদে পরিণত করার জন্য যে বিবিধ আয়োজন চলে তার রহস্যময়তা এতই গভীর যে তাকে আলৌকিক বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন অনেকে সেই প্রাচীনকাল থেকেই। যেহেতু জাগতিক কার্য-কারণের সাধারণ নিয়মে কাব্য-সৃষ্টি কৌশলের অপূর্বতা ব্যাখ্যা করা যায় না, যেহেতু প্রতিভার সর্বব্যাপকতায় লুপ্ত হয়ে যায় স্বর্গ-মর্ত্যের প্রভেদ, ঘুচে যায় অনেক আপাত-বিপরীতের চিরন্তন বিভেদ রেখা তা-ই কাব্যসৃষ্টির পিছনে সন্ধান করা হয়েছে 'বিধাতা প্রদত্ত' অলৌকিক শক্তি। কাব্যসৃষ্টির কারণ স্বরূপ অলৌকিক কোন শক্তির সুনিশ্চিত উপস্থিতি সম্পর্কে নিঃসংশয় ছিলেন বলেই হোমর goddess of song কে স্মরণ করে আরম্ভ করেছেন তাঁর 'ইলিয়ড' মহাকাব্য এবং এই সাহিত্য-সংগীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী 'মিউজ'এর কাছে প্রার্থনা করেছেন 'ওডেসি' কাব্যের কাহিনী অনাবৃত করার জন্য।[২] 'মিউজ'ই যেন সমস্ত শিল্পের মূলাধার। শিল্পীর মাধ্যমে জগৎ সমক্ষে অপ্রকাশিত সত্যকে নিরাবরণ করেন তিনি। এই 'মিউজ'কে কবি ভের্জিল তাঁর 'ইনিড' কাব্যের প্রারম্ভে স্মরণ করলেন এবং

দান্তেও তাঁর 'ডিভাইন কমেডি'র দ্বিতীয় সর্গে শরণাপন্ন হলেন তাঁরই।' 'মিউজ'কে হোমর দেখেছিলেন সংগীত তথা শিল্পের প্রেরণাদাত্রী রূপে এবং ভের্জিল ও দান্তে দেখেছিলেন তাঁকে কল্পনা, স্মৃতি, প্রতিভা ও কার্য-কারণবোধের জননীরূপে। এই মিউজেরই ভারতীয় সংস্করণ ব্রহ্মার মানসকন্যা দেবী সরস্বতী। দণ্ডী এই সর্বশুক্লা সরস্বতীকে বন্দনা করেছেন তাঁর 'কাব্যাদর্শে'র প্রারম্ভে এবং অভিনব-গুপ্তাচার্যের গুরু ভট্টতৌত তাঁর 'কাব্যকৌতুকে' শাস্ত্র এবং কাব্যের দেবী রূপে উল্লেখ করেছেন এই বাগদেবী সরস্বতীর।[৫] প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্‌বেদে এই সরস্বতী ছিলেন সত্য বাক্যের দেবী, বুদ্ধির প্রকাশিকা ও পালয়িত্রী।[৬] সুতরাং ভারতীয় ও পাশ্চাত্ত্য কবি-সাহিত্যিকেরা কাব্য-কবিতার কল্পনাসমৃদ্ধ অসাধারণত্বের জন্য কল্পনা করে নিয়েছেন যথাক্রমে দেবী সরস্বতী ও মিউজ-এর অস্তিত্ব। সাহিত্য বা কাব্যরচনা যেহেতু সর্বসাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়, অতএব এই সমস্ত সৃষ্টিকর্মের পিছনে অবশ্যই অবস্থান করছেন অবাঙ্‌মনসোগোচর কোন কাল্পনিক সত্তা। এই বিশ্বাস থেকেই জন্ম নিয়েছে 'মিউজ' বা 'সরস্বতী' কল্পনা।

ভাবলে বিস্ময় জাগে, কবিদের কাব্যরচনা শুধু কুপ্রবৃত্তির জাগরণ ঘটিয়ে সাধারণ মানুষের সৎনাগরিক হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করা —এই বিশ্বাসে কবিদের যিনি নির্বাসিত করার পক্ষপাতী ছিলেন সেই প্লেটো তাঁর 'Ion' (534) 'Phaedrus' (250) এবং 'Meno' (98D—99E) গ্রন্থ তিনখানিতে গুরু সক্রেটিসের মুখ দিয়ে কাব্যসৃষ্টির পিছনে কখনও 'মিউজ'-এর ভূমিকা বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন, কখনও কাব্যসৃষ্টিকে বর্ণনা করেছেন দিব্যোন্মাদনার প্রকাশ রূপে। 'আয়ন' ও 'সক্রেটিসে'র মধ্যে কথোপকথনকালে যখন 'আয়ন' বিস্মিতকণ্ঠে সক্রেটিসকে জানিয়েছিলেন তিনি জানেন না কি করে হোমর সম্পর্কে তিনি অনেকের চেয়ে ভালো বলতে পারেন, অথচ অপরের সম্পর্কে সেই পরিমাণ ভালো বলতে পারেন না; তখন সক্রেটিস উত্তর দিয়েছিলেন হোমর সম্পর্কে সুন্দর আলোচনা করার যে সহজাত ক্ষমতা তাঁর আছে তা 'আর্ট' নয়, তা হচ্ছে 'ইন্‌স্‌পিরেশন' বা প্রেরণা-সম্ভূত। অর্থাৎ এর পিছনে 'আয়নে'র সক্রিয় প্রচেষ্টা নেই, আছে আয়ত্তাতীত এক অলৌকিক দিব্যশক্তির প্রভাব। এই যে স্বর্গীয় শক্তির প্রভাব 'আয়ন'কে পরিচালিত করছে তা হচ্ছে অয়স্কান্তের অনুরূপ যার আকর্ষণে শুধু লৌহ-অঙ্গুরীয় আকৃষ্ট হয় না, আকৃষ্ট অঙ্গুরীয়ও অপর অঙ্গুরীয়কে আকৃষ্ট করার উপযোগী চৌম্বকধর্মের অধিকারী হয় এবং এই নতুন

চৌম্বক-শক্তিসম্পন্ন লৌহ আবার নতুন লৌহকে আকৃষ্ট করে। এইভাবে গড়ে ওঠে একটি সুদীর্ঘ শৃঙ্খল যার প্রতিটি অংশ মূল চুম্বক-প্রস্তরের কাছ থেকেই লাভ করে থাকে আকর্ষণের শক্তি। ঠিক সেইভাবে 'মিউজ' প্রথমে নিজে প্রেরণা দেন কিছু মানুষকে এবং সেই অনুপ্রেরিত মানুষগুলিই আবার অন্য মানুষদের আকৃষ্ট ও অনুপ্রেরিত করে থাকেন। অতঃপর সক্রেটিস জানালেন, সমস্ত মহৎ গীতি কবিতা ও মহাকাব্যের কবিগণ তাঁদের কাব্যসৃষ্টি করেন 'আর্ট'-এর দ্বারা নয়, করেন প্রেরণা ও আবেশের বশে।[৭] গীতিকবিগণ 'মিউজে'র 'উদ্যান' এবং 'উপত্যকা'য় ফুল থেকে ফুলে পরিভ্রমণ ক'রে সংগৃহীত মধু পরিবেশন করেন তাঁদের কাব্যের মাধ্যমে। প্লেটো-র সক্রেটিস কবিকে বলেছেন লঘুপক্ষ এক স্বর্গীয় সত্তা যিনি আত্মবিস্মৃত এবং অনুপ্রেরিত না হওয়া পর্যন্ত কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারেন না। মানুষের জীবন সম্পর্কে অনেক মূল্যবান সত্যই হয়তো কবির বলার থাকতে পারে, কিন্তু তা সম্ভব হয় না যতক্ষণ না 'মিউজ' তাঁকে প্রেরণা দেয়। এই 'প্রেরণা' নামক একটা ব্যাপার আছে বলেই কোন ব্যক্তি এক সময় মহৎকাব্য সৃষ্টি করলেও পরে হয়ত দুর্বলতর কাব্যরচনা করে থাকেন। যদি 'আর্ট'-এর নিয়মকানুন কাব্যস্রষ্টাকে পরিচালিত করত তাহ'লে যে-কোন লোক যা ইচ্ছে সৃষ্টি করতে পারতেন এবং কারুর রচনার উত্তম ও অধম নমুনা খুঁজে পাওয়া যেত না। সবই একরকম হত। কাব্যসাহিত্য যেহেতু শিক্ষণীয় নয়, নিয়ম-তন্ত্রের বশীভূত নয়, তা-ই প্রেরণাবশে সৃষ্টির ভালো-মন্দ ঘটে থাকে। সক্রেটিস মনে করতেন, ঈশ্বরই কবিদের মারফৎ তাঁর নিজের বক্তব্য পেশ করেন। অর্থাৎ শ্রীঅরবিন্দ যেমন বলেছিলেন, কবিরা হচ্ছেন 'mouthpiece of the Gods'[৮]। কিন্তু কবিরা যদি ঈশ্বরের মুখপাত্র হন, ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রেরণা পেলে তবেই কাব্যসৃষ্টি করতে পারেন তাঁরা, নতুবা নয়, তাহ'লে কবির ইচ্ছা বলে কিছু থাকে না এবং কাব্য-কবিতা যে নিতান্ত স্বগতোক্তি নয়, বা দৈববাণী নয়, জগৎবাসীকে শোনানোর জন্যও কাব্য লিখতে হয় সে সত্য বিস্মৃত হতে হয়। প্লেটো-র সক্রেটিস সে সত্য বিস্মৃত হয়েছিলেন বলে 'Phaedrus' এবং 'Meno' তে কবিকে তুলনা করেছিলেন ঊর্ধ্বচারী লঘুপক্ষ বিহঙ্গের সঙ্গে যার উপর এই পৃথিবীর কোন রকম নিয়ন্ত্রণই থাকে না। এবং পার্থিব দুঃখ-সুখে অবিচলিত দৈবানুগৃহীত এই কবি প্রাণের আনন্দে গান গেয়ে যাবেন যা শুনে সাধারণ মানুষেরা তাঁকে ভাববেন 'উন্মাদ'। কবি যে শুধু জাগতিক দুঃখ-সুখে

অবিচল তাই নয়, কাব্য-রচনার কলাকৌশল সম্পর্কে কোন নির্দেশও তাঁর উপর বলবৎ হবে না। সর্ববন্ধনমুক্ত নিয়ন্ত্রণাতীত এই কবি সাধারণ উন্মাদ নয়, 'দিব্যোন্মাদ'। প্লেটোর পরবর্তীকালে নিউ-প্লেটোনিক দার্শনিক প্লোটিনিউ প্রমুখ প্লেটোর মতই জগদতীত এক সত্তার অস্তিত্ব কল্পনা করেছিলেন যেখান থেকে এই পৃথিবীতে নেমে আসে সৌন্দর্যের চমক। বস্তুতঃ কবিকল্পনার মাহাত্ম্য ও রচনার নৈপুণ্য যতদিন না প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ততদিন কাব্য রচনার পিছনে দিব্যলোকের অস্তিত্ব কল্পনা করে নিয়েছিলেন দার্শনিক ও সাহিত্যিকেরা। এমন কি উনবিংশ শতকের আমেরিকায় এমার্সন এবং বিশ শতকের ভারতবর্ষে শ্রীঅরবিন্দ মহৎ কাব্যে যথাক্রমে 'মিউজ' ও 'Overmind' এর মাহাত্ম্য ও প্রেরণা লক্ষ্য করেছিলেন— (ক) 'Thou shalt leave the world, and know the muse only' (কবিদের উদ্দেশে এমার্সন। 'The poet' প্রবন্ধে) (খ) 'To get the Overmind inspiration is so rare that there are only a few lines or short passages in all poetic literature that give at least some appearance or reflection of it' (2. 6. 1931 তারিখের একটি চিঠিতে)। তবে এঁরা রূপরচনার কৌশলকে মর্যাদা দিয়েছিলেন যা প্লেটো দেন নি। বিজ্ঞানের চরম উন্নতির দিনের এই সমস্ত ভাববাদীদের কথা বাদ দিলে দীর্ঘকালপর্যন্ত কাব্য প্রেরণাকে 'দৈব' বলার দিকে সকলেরই ঝোঁক ছিল প্রবল। একমাত্র উজ্জ্বল ব্যতিক্রম ছিলেন প্লেটোর শিষ্য অ্যারিষ্টটল, যিনি খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দ কালের মানুষ হয়েও দৈব-প্রেরণাতত্ত্বকে বর্জন করে মানবচরিত্রের অতি স্বাভাবিক অনুচিকীর্ষা-বৃত্তিকে কাব্যপ্রেরণা বলে ঘোষণা করার মত বলিষ্ঠতার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও পাশ্চাত্ত্যে প্লেটোর প্রভাবই ছিল দীর্ঘস্থায়ী। এলিজাবেথীয় যুগে স্পেন্সের প্লেটো-র পদ্ধতিতে বলেছিলেন, কবিতা কোন শিল্প নয়, স্বর্গীয় প্রেরণাসম্ভূত সৃষ্টি; শ্রম বা শিক্ষালব্ধ নয়, কিন্তু শ্রম ও শিক্ষার দ্বারা সুগঠিত। অর্থাৎ স্পেন্সর শ্রম বা শিক্ষাকে কাব্য সৃষ্টির ক্ষেত্র মুখ্য নয়, গৌণভূমিকা দান করেছিলেন মাত্র। কবির শ্রম ও শিক্ষা সম্পর্কে অনুরূপ কথাই পরের শতকে (১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে) উইলিয়ম টেম্পল-এর মুখে ভাষা পেল। কবির অশিক্ষিত পটুত্বের মহিমা জানাতে গিয়ে টেম্পল কবিকে তুলনা করলেন মধুকরের সঙ্গে। কবির প্রতিভার মাহাত্ম্য ঘোষণার জন্য টেম্পল-এর মত আরও অনেকে কাব্যসৃষ্টিকে তুলনা করেছিলেন মধুচক্র রচনার সঙ্গে অথবা উদ্ভিদের আত্মপ্রকাশের সঙ্গে। এডিসন তাঁর 'স্পেক্টেটর' পত্রিকার একটি সংখ্যায় মহৎ কবিপ্রতিভার স্বাভাবিক-বিকাশ বোঝাতে গিয়ে লিখলেন—শেক্স্পীয়র প্রমুখ

শিল্পীরা, যাঁরা সহজাত প্রতিভার অধিকারী তাঁরা যেন সুপরিবেশসমন্বিত বর্ধিষ্ণু ভূমি যেখানে অজস্র ফলফুলের সমারোহ অথচ কোন নিয়ম বা শৃঙ্খলার অভাব নেই। আর কৃত্রিম প্রতিভার অধিকারী বলে তিনি গণ্য করেছিলেন যাঁদের সেই ভের্জিল ও মিল্টন সম্পর্কে বললেন, এঁরাও যেন শেক্স্‌পীয়রের অনুরূপ একইজাতের ভূমি, ফলফুলের সম্ভারে সুগঠিত, কিন্তু এই ভূমিতে উদ্যান-পালকের সুশিক্ষিত হস্তের স্পর্শ সর্বত্র অনুভূত। পোপও এডিসনের মতই শেক্স্‌পীয়র ও প্রতিভাবান শিল্পীদের নিসর্গ প্রকৃতির মত অপরের দ্বারা অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীন স্রষ্টা বলে বর্ণনা করেছেন। শেক্‌স্‌পীয়র-গ্রন্থাবলীর মুখবন্ধে তিনি শেক্স্‌পীয়রের নাটকের সঙ্গে অন্য সকলের নাটকের তুলনা করে শেক্‌স্‌পীয়রীয় নাটকের অসাধারণত্ব বোঝাতে গিয়ে উপমার আশ্রয়ে বললেন, শেক্স্‌পীয়রের নাটক গোথিক স্থাপত্যের সদৃশ এবং তার পাশে অন্যান্য নাট্যকারদের নাটক যেন অট্টালিকাতুল্য। হোমরের 'ইলিয়ড' অনুবাদের মুখবন্ধে পোপ ইলিয়ডকে বলেছেন 'a wild paradise'। বলেছেন, এই জাতের সৃষ্টি মনে করিয়ে দেয় বৃহৎ বনস্পতির কথা, অসাধারণ শক্তিশালী বীজ থেকে যার জন্ম এবং উপযুক্ত পরিচর্যার দ্বারা যা পুষ্পিত ও ফলবান হয়ে ওঠে অনন্যসাধারণ মহিমায়। শেক্স্‌পীয়রের প্রতিভার অসাধারণত্ব সম্পর্কে বিস্মিত তাঁর অনুজ মহাকবি মিল্টন প্রায় এডিসন ও পোপের মতই সশ্রদ্ধচিত্তে বলেছেন 'Sweetest Shakespeare fancies childe/Warble his native wood-notesw ilde'। ম্যাথু আর্নল্ড পর্যন্ত শেক্স্‌পীয়র সম্পর্কে তাঁর বিহ্বল উত্তরসূরীদের অনেকেই শেক্স্‌পীয়রের প্রতিভার দিব্যতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ ছিলেন। তাঁকে কেন্দ্র করে এঁরা সকলেই যেন এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে, চর্চার দ্বারা অথবা অপরকে অনুকরণ করে অথবা পূর্বনির্দিষ্ট কোন বিধি নির্দেশের দ্বারা পরি-চালিত হয়ে এইজাতীয় মহৎ স্রষ্টা হওয়া সম্ভব নয় কারুর পক্ষে। মহৎ কবিপ্রতিভাকে বৃক্ষের স্বাভাবিক বিকাশের সঙ্গে অথবা প্রাচীন স্থাপত্যের গম্ভীর মহিমার সঙ্গে তুলনা করে সকলেই এঁরা যে সত্যের দিকে সংকেত দিয়েছেন তা হচ্ছে—(ক) কাব্য-সৃষ্টি আকস্মিক, পূর্ব-অপরিকল্পিত ও প্রয়াসপ্রযত্নহীন। যেন আকস্মিকভাবেই কাব্যের সমগ্রতা লাভ ঘটে। লেখককে যেন বিষয়বস্তু গ্রহণ-বর্জন বা তাকে একটি শিল্পসম্মত রূপ দেওয়ার জন্য পরিশ্রম করতে হয় না। কবিতা একটি স্বতোৎসারিত ব্যাপার। (খ) কাব্যসৃষ্টি হচ্ছে অনৈচ্ছিক ও স্বয়ংক্রিয়। গ) সৃষ্টির মুহূর্তে সাময়িক

উত্তেজনা কবির মধ্যে সঞ্চারিত হলেও অবশেষে একধরণের স্বর্গীয় আনন্দ ও প্রশান্তি লাভ করেন তিনি। (ঘ) সৃষ্টিকর্ম সুসম্পন্ন হওয়ার পর লেখক মনে করেন এর পিছনে তাঁর কোন সক্রিয় ভূমিকা ছিল না, তাঁকে দিয়ে যেন অন্য কেউ কাজ করিয়ে নিয়েছেন।...কিন্তু কাব্যসৃষ্টিকে এইভাবে বিচার করলে স্রষ্টার ব্যক্তিমানুষের উর্ধ্বে অন্য আর একজনের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে হয়। অস্বীকার করতে হয় কাব্যরচনার পূর্বে কবির সুদীর্ঘকালের চর্চা ও কঠোর অধ্যবসায়কে। যদিও রবার্ট হেরিকের কথায় ভুল ছিল না যে, প্রতিটি দিনই কবিতা লেখার দিন নয় এবং শেলীও যথার্থ বলেছিলেন, কবিতা লিখব বলে কোন মানুষ কবিতা লিখতে পারেন না, কিন্তু তা-ই বলে কবিতা লেখার আগে কবিকে ভাবসংযম অভ্যাস করতে হয় না বা লেখনীকে নিয়ন্ত্রিত করার শিক্ষা নিতে হয় না, তা বোধ হয় ঠিক নয়। হয়ত মহান, শুধু মহান কেন, যে-কোন স্রষ্টাই তাঁর আবেগকে রূপদানের জন্য অপরের কাছ থেকে রূপ বা রীতি ভিক্ষা করেন না, তাঁর রূপকল্পনা ভাব বা আবেগেরই সহগামী কিন্তু তার দ্বারা প্রমাণ হয় না কাব্যরচয়িতাকে কাব্যরচনার জন্য কোনরকম আয়াস স্বীকার করতে হয় না। রবীন্দ্রনাথের 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতার বাল্মীকি যখন 'অপূর্ব উদ্বেগভরে সঙ্গিহীন ভ্রমিছেন একাকী' তখনই তো তাঁর হৃদয় থেকে জন্ম নেয় নি মহাকাব্য 'রামায়ণ', প্রয়োজন হয়েছিল 'ধ্যানাসনে' উপবিষ্ট হওয়ার। যদি বেদনা ও কাব্যের জন্ম হত সমকালীন তা'হলে সেই অনিয়ন্ত্রিত যন্ত্রণা কোনদিন রামায়ণ-কাব্যের জন্ম দিতে পারত না। কাব্যসৃষ্টি কবি করবেন কেমন করে তা নিশ্চয়ই কেউ শিখিয়ে দেয় না, অথবা প্রাকৃতিক জগতের বিচ্ছিন্ন বস্তুকে যখন কবি এক অখণ্ড মূর্তি দান করেন, বহু আপাতবিপরীতের সমন্বয় সাধন করেন, তখন তিনি পরিচিত জগতের যে রাসায়নিক পরিবর্তন সাধন করেন হয়ত নিজেও তা নিপুণ বিশ্লেষণ করে বোঝাতে পারেন না; কিন্তু যে 'প্রতিভা' নামক শক্তির দ্বারা তিনি কাব্যকে রূপ দিলেন তার সবটুকুই কি ব্যাখ্যার অতীত? ভারতীয় আলংকারিক ভট্টতৌত 'প্রতিভা'কে বলেছিলেন 'প্রজ্ঞা নবনবোল্লেখশালিনী প্রতিভা মতা' আর অভিনব গুপ্ত বলেছিলেন 'প্রতিভা অপূর্ববস্তু নির্মাণক্ষমা প্রজ্ঞা'। অপূর্ববস্তু নির্মাণক্ষমতা না থাকলে তাকে প্রতিভা বলা যায় না। এই 'প্রতিভা' কাণ্ট-কথিত 'কল্পনা'রই অনুরূপ 'innate mental aptitude through which nature gives the

rule to art'. এই প্রতিভার স্পর্শে জন্ম নিল যে সাহিত্য বা শিল্প তা পূর্বপ্রতিষ্ঠিত নিয়মতন্ত্রের অধীন না হলেও নিজস্ব নিয়মে গঠিত এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ। 'প্রতিভা'র এই ক্রিয়ার দিকে লক্ষ্য রেখে দার্শনিক শিলিঙ বলেছিলেন, চেতন ও অচেতনের, মুক্তি ও বন্ধনের, বুদ্ধি ও ভাবাবেগের দ্বন্দ্ববিরোধের অবসান ঘটিয়ে শিল্পকে রূপায়িত করার নামই প্রতিভা। তাঁর অন্তর্গত 'unconscious infinity'-কে শিল্পী শিল্পের 'finite'-এর মধ্যে ধরতে পারেন এই প্রতিভাশক্তির দ্বারাই। কিন্তু 'finite'-এ রূপায়িত করা শুধু প্রেরণার দ্বারা সম্ভব নয়, তা সে অলৌকিক হলেও। এইজন্য প্রয়োজন হয় রূপনির্মাণ-সচেতনতা, চর্চা ও দক্ষতা। অবনীন্দ্রনাথ অতি সুন্দর বলেছেন, 'অর্জন নেই, ইন্‌সপিরেশান এলো— গড়তে গেলেম তাজ, হয়ে উঠলো গম্বুজ, গড়তে গেলেম মন্দির, হয়ে পড়লো ইষ্টিশান বা সৃষ্টিছাড়া বেয়াড়া বেখাপ্পা কিছু! ইন্‌সপিরেশানের খেয়াল ছোট বয়সে শোভা পায় আর শোভা পায় পাগলে। শিল্পের অধিকার নিজেকে অর্জন করতে হয়। পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত ধন যে আইনে আমাদের হয় তেমন করে শিল্প আমাদের হয় না।'[৯] অথবা, অন্তঃপ্রেরণায় বিশ্বাসী কবি জীবনানন্দ লিখছেন, 'আমার পক্ষে অন্তত — ভালো কবিতা লেখা অল্প কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার নয়; কবিতাটিকে প্রকৃতিস্থ করে তুলতে সময় লাগে। কোনো-কোনো সময় কাঠামোটি, এমন কি সম্পূর্ণ কবিতাটিও, খুব তাড়াতাড়ি সৃষ্টিলোকী হয়ে ওঠে প্রায়। কিন্তু তারপর প্রথম লিখবার সময় যেমন ছিল তার চেয়ে বেশী স্পষ্টভাবে—চারিদিক্‌-কার প্রতিবেশ চেতনা নিয়ে শুদ্ধ প্রতর্কের আবির্ভাবে, কবিতাটি আরও সত্য হয়ে উঠতে চায়; পুনরায় ভাবপ্রতিভার আশ্রয়ে। এরকম অঙ্গাঙ্গিযোগে কবিতাটি পরিণতি লাভ করে।'[১০] অবনীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দ এই দুই শিল্পীর কথা থেকে এই সত্য স্পষ্ট যে তাঁরা প্রেরণায় বিশ্বাস করলেও অনুশীলন ও শ্রম ছাড়া যে শিল্প সৃষ্টি হয় না সে বিষয়ে ছিলেন নিঃসংশয়। অবশ্য সেই 'শ্রম' বা 'অনুশীলন'ও নিতান্ত কায়িক নয়, তা 'সৃষ্টিমুখী' অতএব ভাব-প্রতিভার আবশ্যিকতা দেখা দেয় সেক্ষেত্রেও। 'টেক্‌নিক্' শিল্পের অপরিহার্য উপাদান কি-না তা নিয়ে যদি তর্কের কোন অবকাশ থাকেও কলা নির্মাণের জন্য কৌশলের প্রয়োজন নেই তা মোটেও যথার্থ নয়। শিল্পসৃষ্টির পিছনে দিব্যপ্রভাব থাক্ বা না-থাক শিল্পের যখন একটা দৃষ্টিগ্রাহ্যরূপ আছেই তখন চর্চাহীন প্রতিভা নিষ্ফল হতে বাধ্য।[১১] এই চর্চার সার্থকতা ধরা পড়ে শিল্প

প্রকাশিত হওয়ার পর। প্রকাশিত হওয়াই শিল্পের শিল্পত্ব লাভের প্রথম ও প্রধান শর্ত। আবার মানুষের হৃদয়ের ভিতর প্রকাশের যে নিত্য আবেগ শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাই গ্রহণ করে 'প্রেরণা'র ভূমিকা।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'আমরা যে মূর্তি গড়িতেছি, ছবি আঁকিতেছি, কবিতা লিখিতেছি, পাথরের মন্দির নির্মাণ করিতেছি, দেশে বিদেশে চিরকাল ধরিয়া অবিশ্রাম এই যে একটা চেষ্টা চলিতেছে, ইহা আর কিছুই নয়, মানুষের হৃদয় মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অমরতা প্রার্থনা করিতেছে।'[১২] নিজের অন্তরের অনুভূতি শিল্পকর্মের মাধ্যমে সর্বসমক্ষে নিবেদন করা বা পাঠকসাধারণের হৃদয়ের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিয়ে অমরত্ব কামনা করা শিল্পসৃষ্টির পিছনকার প্রেরণা, রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্যে প্রকাশ কামনার তাৎপর্য ধরা পড়েছে মনে হয়। বস্তুতঃ যতক্ষণ পর্যন্ত অনুভূতি থাকে লেখকের একান্ত অন্তর্গত ততক্ষণ পর্যন্ত বাইরের জগতে তার কোন মূল্য থাকে না। কিন্তু যেই সেই ভাব প্রকাশিত হ'ল তখনই একের বক্তব্য সত্য হয়ে উঠল অপরের কাছে। এখন অপরের কাছে উপস্থাপিত করার জন্যই প্রয়োজন হয় নানাবিধ কলা-কৌশল, আভাস, ইঙ্গিত ও অলংকার। অতএব কাব্যসৃষ্টির পিছনে যাঁরা দিব্য প্রেরণায় বিশ্বাসী, স্বীকার করেন না কলাকৌশলের আবশ্যিকতা তাঁরা বিস্মৃত হন ভাবপ্রকাশ ও ভাবসঞ্চারের আদিম কামনা। কিন্তু পাঠকের মনস্তুষ্টি-সাধন লেখকের একমাত্র বাসনা না হলেও পাঠকের উপস্থিতি সম্পর্কে যখন লেখককে অমনোযোগী থাকলে চলে না, শিল্পের জগতে শিল্পরসিকের ভূমিকা স্বীকার করতেই হয় তখন দৈবশক্তিতে পরিচালিত কবির গগন বিহারের যাথার্থ্য স্বীকার করা যায় কি? আর্ট যেহেতু 'ভাব' বা 'আবেগ' মাত্র নয়, আবেগ-এর 'প্রকাশ' এবং সেই প্রকাশের মাধ্যম শব্দ বা ভাষার দ্বারাই লেখকের অনুভূতি পাঠকের ভিতর সঞ্চারিত হয় অতএব শুধু প্রকাশ নয়, প্রকাশের উপায় বা মাধ্যম নিয়েও ভাবতে হয় লেখককে। অপরের হৃদয়ে অমরত্ব লাভের জন্যই সাহিত্যিককে চিন্তিত হতে হয় ভাবপ্রকাশ ও ভাবসঞ্চারের প্রসঙ্গ নিয়ে। অতএব 'অমরত্ব' লাভ যদি হয় প্রেরণা তাহলে 'প্রকাশ' ও 'সঞ্চার' ক্ষমতা হচ্ছে সেই অমরত্ব লাভের উপায়। আবার পৃথক্‌ভাবে 'ভাবপ্রকাশ' এবং 'ভাবসঞ্চার' কামনাও সাহিত্যিকের জীবনে প্রেরণার ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু যে-টলস্টয় 'ভাবসঞ্চার' ক্রিয়ার উপর গুরুত্ব

আরোপ করেছিলেন তিনি শিল্পীর উপর অর্পণ করেছিলেন এক গুরু দায়িত্ব। তাঁর ধারণা ছিল, শিল্পের কাজ জনসাধারণের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করা, হিংসা দূর করা। সুতরাং প্রশ্ন জাগতে পারে টলস্টয় শিল্পসৃষ্টির প্রেরণা হিসেবে গন্য করেছিলেন কাকে? হতে পারে হিংসা দূর করা, মানুষে মানুষে যোগাযোগ স্থাপন করাকেই তিদি গন্য করেছিলেন প্রেরণা বলে, অথবা এও হতে পারে প্রেরণারূপে মেনেছিলেন 'সঞ্চার' করার বাসনাকে এবং জন-যোগাযোগ ছিল লব্ধ ফলমাত্র। আসলে একটা স্তরে 'প্ররণা' ও 'ফললাভে' পার্থক্য করা অসুবিধা হয়ে পড়ে অনেকক্ষেত্রে। দিব্যপ্রেরণাবাদীদের সেই সমস্যা ছিল না, কারণ তাঁদের কাছে কবি মানুষটিই জাগতিক লাভালাভ সমস্যার উর্ধ্বে এক গগনবিহারী অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্র। কিন্তু যখন কবিদের মনে করা সম্ভব 'unacknowledged legislators of the world', এবং কবি নিজেকে সমাজ পরিবর্তনের সক্রিয় শক্তি হিসেবেও গন্য করেন তখন 'সমাজ' পরিবর্তনকামনাও' কাব্যসৃষ্টির প্রেরণা হিসেবে স্বীকৃত হতে পারে নিশ্চয়ই। বিশ শতকের সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদীরা সাহিত্যে বাস্তবের যথাযথ রূপ কামনা করেন নি, তাঁরা সাহিত্যের মাধ্যমে চেয়েছিলেন সমাজ-বাস্তববাদের প্রচার। সুতরাং এই সমস্ত শিল্পী-সাহিত্যিকদের জীবনে 'সমাজপরিবর্ত্তনকামনা'ই কাজ করেছে প্রেরণারূপে। আবার একেই যদি বলি ইচ্ছাপূরণের প্রেরণা, তবে তার আরও দুটি প্রকাশ দেখি যথাক্রমে নীৎসে ও ফ্রয়েডের মতবাদে। নীৎসে দুঃখ-দৈন্যে ভরা এ জগতে শিল্প-সাহিত্যকেই দেখেছিলেন মানবজীবনের কল্প-আশ্রয়রূপে। এই জগৎকে, সাময়িক ভাবে হলেও, সুসহ করার প্রেরণা থেকেই সাহিত্যসৃষ্টি হয়ে থাকে, নীৎসের এই বিশ্বাসের পিছনে ছিল সাহিত্যকে সাহিত্যিকদের 'ইচ্ছাপূরণের' মাধ্যমরূপে স্বীকার করে নেওয়ার চেষ্টা। ফ্রয়েডও সাহিত্যকে দেখেছিলেন সাহিত্যিকের ব্যক্তিজীবনের প্রেমকামনা, ক্ষমতাপ্রিয়তা ও অতৃপ্ত বহুবাসনার সফল রূপ প্রকাশের মাধ্যমরূপে — 'like any other with an unsatisfied longing, he turns away from reality and transfers all his interest, and all his libido too, on to the creation of his wishes in the life of Phantasy'।[১৪]

ব্যক্তিগত ইচ্ছাপূরণের প্রেরণা হোক অথবা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কামনার প্রেরণাই হোক, আত্মপ্রকাশের প্রেরণা হোক অথবা মানুষে মানুষে যোগাযোগ রক্ষার প্রেরণাই হোক, কোনটিই 'দিব্য' বা অলৌকিক প্রেরণা নয়। একালের শিল্পী বা সমালোচকেরা অলৌকিক সত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয়।

আবার শিল্পীর প্রতিভাশক্তিতে বিশ্বাসী হলেও একালে সহজাত ক্ষমতাসম্পন্ন অশিক্ষিত পটু শিল্পীর কথা বলেন না কেউ। একালের লেখক যিনি পাঠকের উপস্থিতি বিষয়ে সর্বদা সচেতন, সমকাল ও জনজীবনের অভীপ্সা সম্পর্কে সজ্ঞান ও সতর্ক তাঁর প্রেরণা যেমন স্বর্গলোক থেকে আসে না, তেমনি তাঁর শিক্ষা ও চর্চার দ্বারা সুপরিণত প্রতিভাশক্তিও দিব্যলোক-সম্ভূত নয়। প্রতিভা শিক্ষা-নিরপেক্ষ দেবদত্ত সামগ্রী—এই বিশ্বাস থেকেই এই সমস্ত গল্প কাহিনীর জন্ম হয়েছিল যে, হোমর ছিলেন অন্ধ, বাল্মীকি ছিলেন দস্যু, কালিদাস ছিলেন মূর্খ আর শেক্স্পীয়র মন্থপ, উচ্ছৃঙ্খল ও নাটুকে। তা ছাড়া শেক্স্পীয়র ভিন্ন অন্য কারুর আবির্ভাবকাল ও পরিবেশ সম্পর্কে যেহেতু সুনিশ্চিত নির্ভরযোগ্য কোন তথ্য পাওয়া যায় নি, অতএব অসাধারণ কাব্যগুণ-সমৃদ্ধ এঁদের রচনায় কোন্ বিশেষ সমাজ ও দেশকালের চিহ্ন সাক্ষীকৃত হয়েছিল সে গবেষণাও সুফলপ্রসূ হয় নি। বস্তুতঃ ইতিহাসের কার্য-কারণ সম্পর্কে যখন কোন সৃষ্টি বা স্রষ্টাকে সংযুক্ত করা সম্ভব হয় নি তখনই কাব্য ও কবি সম্পর্কে যত অলৌকিক-তত্ত্বের জন্মলাভ ঘটেছে। কিন্তু কাব্য-সাহিত্য রচনার প্রেরণা যে দ্যুলোক থেকে আসে না, আসে অনুচিকীর্ষা ও আনন্দদায়ক রূপ নির্মাণের কামনা থেকে, দৈব-প্রেরণাবাদী প্লেটো-র শিষ্য বিশ্বাকর প্রতিভাধর দার্শনিক অ্যারিস্টটল খ্রীষ্টপূর্বাব্দ-কালেই সে কথা স্পষ্টভাবে জানালেন এবং গুরু প্লেটো-র 'মাইমেসিস' তত্ত্বকে নতুন বিস্তার ও মর্যাদা দিয়ে শিল্প-সাহিত্যের রহস্য ব্যাখ্যায় অগ্রসর হলেন।

খ ॥ অনুকরণ

প্লেটো কোন কোন সাহিত্যকর্মে দেখেছিলেন বিবৃতিমুখ্যতা, কোন কোন সাহিত্যে অনুকরণ প্রাধান্য এবং অন্যত্র বিবৃতি ও অনুকরণের সংমিশ্রণ। যেমন 'ডিথিরাম্ব'-এ লেখকই একমাত্র বক্তা অর্থাৎ বিবরণই প্রধান, ট্রাজেডি ও কমেডিতে অনুকরণ প্রধান এবং মহাকাব্যে বিবরণ ও অনুকরণের সংমিশ্রণ। ট্রাজেডি ও কমেডি-র বিরুদ্ধে প্লেটো-র অভিযোগ ছিল, অভিযোগ ছিল তাঁর শিল্পের মাইমেটিক ধর্মের বিরুদ্ধে। বস্তুতঃ যে শিল্প-সাহিত্য নৈতিক চরিত্রের সংস্কার সাধনে এবং মানুষকে সুনাগরিক করে তোলার ব্যাপারে দায়িত্বমুক্ত 'প্লেটো' সেই শিল্পকে শ্রদ্ধা জানাতে পারেন নি। তাঁর কল্পিত আদর্শরাষ্ট্রে, প্লেটো সেই কবিদেরই

স্থান নিতে সম্মত যাঁরা মানুষের সদ্‌গুণাবলীর রূপায়ণ করেন ('দি রিপাব্লিক' ৩য় খণ্ড)। 'দি রিপাব্লিক' গ্রন্থের তৃতীয় এবং দশমখণ্ডে প্লেটো 'মাইমেসিস' তত্ত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তৃতীয়খণ্ডে প্লেটো-ব্যবহৃত 'মাইমেসিস'-এর ইংরেজী প্রতিশব্দ হতে পারে 'Impersonation'। লেখক যখন নিজে বক্তার ভূমিকায় না থেকে অন্য চরিত্রকে 'ডায়ালগ' বা কথোপকথনের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করার সুযোগ দিয়ে থাকেন তখন তাকেই বলা হচ্ছে Impersonation। গীতকবিতায় লেখক নিজেই বক্তা, কিন্তু নাটকে রূপায়িত চরিত্রগুলির উক্তি নাট্যকারই লিখে থাকেন। অপরের ভূমিকায় লেখক এই যে দায়িত্ব গ্রহণ করছেন, যাকে বলা যায় 'ইমপার্সোনেশন', প্লেটো বলছেন, তার ফলে আগামী দিনের গ্রীক নাগরিকেরা নিজেদের স্বভাব প্রচ্ছন্ন রেখে অপরের হয়ে বলতে শিখবেন। কিন্তু যথার্থ প্রজাতন্ত্রে যেহেতু সকল নাগরিকেরই চরিত্র স্ব-ভাবে বিকশিত হওয়ার সুযোগ পাওয়া উচিত অতএব এই সমস্ত ট্রাজেডি ও কমেডি জনগণের জীবন বিকাশের ক্ষেত্রে সহায়ক না হয়ে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে। নিজের ব্যক্তিত্ব বিলুপ্ত করে যদি জনসাধারণ অনুচিকীর্ষু হয়ে ওঠেন তাহলে তাঁরা হারাবেন তাঁদের দেহ ও মনের সবলতা। তবে, প্লেটো মনে করেন, এই নাগরিকেরা যদি একান্তই অনুকরণ করতে চান তাহলে অধম নীচ বা হীন চরিত্র নয়; বীর ও পবিত্র, সৎ ও স্বাধীন চরিত্র অনুকরণ করবেন এটাই কাম্য। অর্থাৎ প্লেটো অনুকরণের ঘোরতর বিরুদ্ধাচারী হয়েও শেষ পর্যন্ত সৎ ও সুন্দরকে অনুকরণীয় বলে ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু 'দি রিপাব্‌লিক' গ্রন্থের দশমখণ্ডে প্লেটো 'মাইমেসিস'কে 'Impersonation' অর্থে নয়, 'অনুকরণ' বা 'রূপায়ণ' অর্থে ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে, শিল্প-সাহিত্যে যেহেতু বস্তুপৃথিবী ও পরিবেশ অনুকৃত হয়ে থাকে, তাই মূল সত্য থেকে শিল্প-সাহিত্য বিচ্যুত। 'মাইমেসিস' হচ্ছে সদৃশ বস্তুর সৃষ্টি বা রূপায়ণ। অতএব 'মাইমেসিস'-প্রধান শিল্প-সাহিত্য মূল সত্য থেকে তিনধাপ দূরে। প্লেটো মনে করেন, ইহজগতে যা আছে তা হচ্ছে অপার্থিব 'আইডিয়া'-এর ত্রুটিপূর্ণ অনুলিপি। কবি-শিল্পী যখন আবার ইহজগৎকে অনুকরণ করেন তখন তিনি মূল সত্যের বিকৃত নকলের নকল করে প্রকৃত সত্য থেকে তিন ধাপ (প্রাচীন গণনা-পদ্ধতি অনুসারে) দূরে সরে যান। অতএব এইজাতীয় অনুকরণ-প্রধান শিল্প-সাহিত্য থেকে শেখা যায় না কিছুই, এই হচ্ছে প্লেটোর সিদ্ধান্ত। একটি বিছানার উদাহরণ দিয়ে তিনি বললেন,

জগৎস্রষ্টা নির্মাণ করেছেন একটি আদর্শ বিছানা (বিশেষ বিছানা নয়), জনৈক সূত্রধর এই আদর্শের অনুকরণে প্রস্তুত করেন, প্রকৃত বিছানা নয়, একটি বিশেষ বিছানা। অতঃপর জনৈক চিত্রকর সেই বিছানাকে তাঁর বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে যেমনভাবেই হোক চিত্রে নিবিষ্ট করলেন। প্লেটোর মতে, কবির ভূমিকা এই চিত্রকরের অনুরূপ যিনি সত্যকে অনুকরণ করেন না, রূপায়িত করেন সত্যের আপাতরূপ মাত্র। এই অনুকরণ-প্রধান শিল্প সম্পর্কে, অতএব প্লেটোর সিদ্ধান্ত হচ্ছে 'The imitative art is an inferior who marries an inferior and has inferior offspring'[১]। আসলে প্লেটোর মনে বাস্তবাতীত এক আদর্শজগতের অস্তিত্ব ছিল বলেই তিনি এই আদর্শজগৎকে 'সত্য' বলে গ্রহণ করে অন্য সংকিছুকে তার ব্যর্থ অনুকরণ অতএব 'মিথ্যা' বলে গণ্য করেছিলেন। কিন্তু তাঁর 'সোফিষ্ট' গ্রন্থে স্ট্রেঞ্জারের মুখ দিয়ে প্লেটো বলেছেন—অনুকরণও একধরণের সৃষ্টি। অবশ্য সেই সঙ্গে এই কথাটিও যুক্ত হয়েছিল,—সে সৃষ্টি সত্যবস্তুর সৃষ্টি নয়। প্লেটো অনুকরণকে 'eikastike' ও 'Phantastike' এই দুইভাগে ভাগ করে 'eikastike' বা সত্য অনুকরণকে নীতির দিক থেকে গ্রহণীয় এবং 'Phantastike' (মিথ্যা-অনুকরণ)-কে বর্জনীয় বলে ঘোষণা করলেন। কিন্তু অনুকরণকারী শিল্পীদের বিরুদ্ধে এতবড় সরব প্রতিবাদী হয়েও প্লেটো কবিদের দৈবানুপ্রেরিত বলে মনে করতেন, এটাই বড় বিস্ময়ের। যিনি দৈবানুপ্রেরিত তিনি মিথ্যাচারী হন কি করে? অথবা যিনি স্বভাবতঃই মিথ্যাচারী দিব্যপ্রভাব তাঁকে স্পর্শই বা করে কি করে? কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে প্লেটো বিরক্তিকর ও মামুলি জীবনরূপের রচয়িতাদের সম্পর্কেই ক্ষুব্ধ ছিলেন এবং তাঁদেরই বিতাড়িত করতে চেয়েছিলেন জীবনের প্রাঙ্গণ থেকে, যাঁরা সৎ ও সত্যের রূপনির্মাতা তাঁদের বিরুদ্ধে প্লেটো-র বক্তব্য বিশেষ কিছু ছিল না (কলিংউড তাঁর 'The principles of Art'-এ প্লেটো-র বিরুদ্ধে তাঁর সমালোচকদের অভিযোগ খণ্ডন করতে গিয়ে এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন।)।

শিষ্য অ্যারিষ্টটল গুরু প্লেটো-র শিল্প সাহিত্যের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক মন্তব্যের প্রতিবাদেই যেন তাঁর 'কাব্যশাস্ত্র' ('পোয়েটিক্স') প্রণয়ন করেন। কিন্তু অনন্যসাধারণ মনীষার অধিকারী অ্যারিষ্টটল কাব্যশাস্ত্র ছাড়াও তাঁর 'পদার্থবিদ্যা', 'অধিবিদ্যা', 'নীতিবিদ্যা', 'অলংকারশাস্ত্র' প্রভৃতি গ্রন্থে শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে

আলোচনা করেন। 'কাব্যশাস্ত্র' তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের তুলনায় পরিণত এবং পরবর্তীকালের রচনা বলে মনে হয়। অ্যারিষ্টটল বললেন, অনুকরণের বাসনা থেকে শিল্পের জন্ম এবং অনুকৃত বস্তুর রূপদর্শন করেই মানুষ আনন্দ লাভ করে। মানুষকে আনন্দদানই শিল্পের উদ্দেশ্য। আর প্লেটো বলেছিলেন, সৎ ও সুন্দর জীবন যাপনে প্রেরণা লাভ করা যায় না যে কাব্য-সাহিত্য থেকে তা সর্বদা বর্জনীয়। ট্রাজেডি সম্পর্কে প্লেটো কোন শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন নি, কিন্তু অ্যারিষ্টটল তাঁর 'পোয়েটিক্স' যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছিলেন 'ট্রাজেডি' প্রসঙ্গে, তা আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে লক্ষিত হয় এবং তাঁর 'ক্যাথারসিস'-তত্ত্ব আলোচনার ঝড় তোলে। প্লেটো অনুকার্য বিষয়বস্তুর সৌন্দর্যকে মনে করতেন শিল্পের জগতে সৌন্দর্য সৃষ্টির কারণ আর অ্যারিষ্টটল বিশ্বাস করতেন আপাত কুৎসিত বিষয়বস্তুর অনুকরণও কাব্য-সাহিত্যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে পারে। প্লেটো কাব্যের সত্যকে মনে করতেন মূল সত্য থেকে তিনধাপ দূরবর্তী আর অ্যারিষ্টটল বলেছিলেন কাব্যের সত্য চিরন্তন সত্য এবং এই কারণে ইতিহাস ও দর্শনের ঊর্ধ্বে শিল্প-সাহিত্যের স্থান। প্লেটোর সঙ্গে অ্যারিষ্টটলের মতাদর্শের এই বৈপরীত্যের অন্যতম প্রধান কারণ 'অনুকরণ' সম্পর্কে গুরু-শিষ্যের মতের মৌলিক পার্থক্য। প্লেটো যে 'আইডিয়াল'-এর অপূর্ণ অনুকরণরূপে জগৎকে দেখে 'সাহিত্য'কে সেই ত্রুটিপূর্ণ অনুকরণের অনুকরণ বলে ছোট নজরে দেখেছিলেন, অ্যারিষ্টটল সেই রকম কোন 'আইডিয়াল'-এর অস্তিত্বের কথা বলেন নি কোথাও। বরঞ্চ শিল্প-সাহিত্যের স্বরূপ আলোচনার ক্ষেত্রে অ্যারিষ্টটল মাঝে মধ্যে জীব বিজ্ঞানের সহায়তা গ্রহণ করেছিলেন, এবং অলৌকিক ভাববাদের আওতা থেকে নিজেকে রেখেছিলেন দূরে।

তাঁর 'কাব্যশাস্ত্রে' নয়, 'খবহবিদ্যা' (মিটিওরলোজি) গ্রন্থে অ্যারিষ্টটল বলেছিলেন—শিল্প (techne) প্রকৃতিকে অনুকরণ করে এবং 'রাষ্ট্রবিদ্যা'র (পলিটিক্স) বললেন, প্রত্যেক শিল্প এবং শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে প্রকৃতিরাজ্যের অপূর্ণতাকে সম্পূর্ণ করা। পুনশ্চ, 'শিল্পী' প্রকৃতির ভিতরকার হারিয়ে যাওয়া সত্যকে উদ্ধার করে শিল্পে তাকে সমেত প্রকৃতির পূর্ণাঙ্গ মূর্তি নির্মাণ করেন—এই জাতীয় কথা বললেন 'পদার্থ-বিদ্যায়' (ফিজিক্স)। বিভিন্ন প্রসঙ্গে শিল্পে অনুকরণের ভূমিকা নিয়ে অ্যারিষ্টটলের এই সমস্ত মন্তব্য থেকে প্রথমেই প্লেটো-র সঙ্গে তাঁর মত-পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শিল্প-সাহিত্যে প্রকৃতির অপূর্ণতা দূর করে

তাকে পূর্ণ মূর্তিতে উদ্ভাসিত করে তোলা হয়, এই রকম ধারণা ছিল না প্লেটোর। আবার একথাও অ্যারিষ্টটল বলেন নি কোথাও, শিল্প যাকে অনুকরণ করে তা আসলে সত্যের বিকৃতি এবং প্রকৃত সত্য থেকে তিনধাপ দূরে। 'মাইমেসিস' বলতে অ্যারিষ্টটল সঠিক কি বুঝতেন এবং প্লেটো-র সঙ্গেও বা তাঁর ধারণার পার্থক্য কি তা স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। প্লেটোর ব্যাখ্যা থেকে মনে হয়েছে তাঁর 'দি রিপাব্লিক'-এর তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি 'মাইমেসিস' ও 'ইম্পার্সোনেশন'কে একার্থক বলে গ্রহণ করেছেন যদিও দশম অধ্যায়ে 'মাইমেসিস' তাঁর কাছে হয়ে উঠেছে 'ইমিটেশন' এবং 'রিপ্রেজেনটেশন'-এর সমার্থক। কিন্তু 'মাইমেসিস'কে 'ইম্পার্সোনেশন' বা 'ইমিটেশন' কোন অর্থে ধরলেই বোধ হয় অ্যারিষ্টটলের শিল্প-তত্ত্বালোচনার গভীরে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। প্লেটো 'মাইমেসিস'কে যখন 'ইমিটেশন' অর্থে গ্রহণ করেন তখন শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর বিমুখতার কারণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'ইমিটেশন' শব্দের তাৎপর্য হচ্ছে : (ক) বস্তুটি আসল নয়, নকল ; (খ) কিন্তু নকল হলেও আসলের অনুরূপ মূর্তিতে তাকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। যেমন 'ইমিটেশন পার্ল' বলতে আমরা বুঝি মুক্তাটি আসল নয়, নকল ; কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে আসলের সঙ্গে তার কোন পার্থক্য নির্ণয় করা অসুবিধা। এখন এই অর্থে সাহিত্যকে 'মাইমেসিস' বা 'ইমিটেশন' বললে কোন একটি আসল বস্তুর প্রচ্ছন্ন উপস্থিতি মেনে নিতে হয়। তা মেনে নিয়েছিলেন বলেই তো প্লেটো অলৌকিক 'আইডিয়াল' জগতের নকলের নকল বলে শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু অ্যারিষ্টটল-ব্যবহৃত 'মাইমেসিস' শব্দটি কদাপি সেদিকে ইঙ্গিত করে না। এই গ্রীক শব্দের সার্থক প্রতিশব্দ ইংরেজীতে বা বাঙলায় কি হতে পারে তা আমাদের জানা নেই। তবে বুচার, বাইওয়াটার থেকে আরম্ভ করে 'পোয়েটিক্স'-এর সমস্ত অনুবাদক ও ভাষ্যকারেরাই 'মাইমেসিস'এর প্রতিশব্দরূপে 'ইমিটেশন' ব্যবহার করেছেন। এবং বাঙলায় তা থেকে আমরা 'অনুকরণ' শব্দটি ব্যবহার করে আসছি।

অ্যারিষ্টটল 'অধিবিদ্যায়' বলেছেন (১০৩২ এ) প্রকৃতি এবং শিল্প এই জগতের দুটি প্রধান 'initiating force'। পার্থক্য এখানে যে, প্রাকৃতিক জগতে সৃষ্টির প্রবর্তনা রয়েছে প্রকৃতির মধ্যেই আর শিল্পসৃষ্টির প্রবর্তনা শিল্পীর হৃদয়ে। উত্তাপ ও শৈত্য লৌহের ভিতর গুণগত পার্থক্য ঘটায়, এটা বাস্তব ঘটনা। কিন্তু দক্ষ কারিগরের যন্ত্রের সুনিপুণ পরিচালনায় সেই লৌহই

রূপান্তরিত হয় তরবারিতে। তরবারি হচ্ছে শিল্পকর্ম এবং উত্তাপ ও শৈত্য প্রাকৃতিক শক্তি। কোন বস্তুর প্রকৃতিপ্রদত্ত একটা রূপ আছে, কিন্তু তার রূপান্তর এবং জন্মান্তর ঘটে শিল্পীর হস্তক্ষেপে। মানবসন্তানের জন্মগ্রহণ করা এবং স্থপতির কীর্তি গড়ে ওঠায় উপাদানগত পার্থক্য থাকলেও সৃষ্টি-প্রক্রিয়ায় এদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, বলেছেন অ্যারিষ্টটল (অধিবিদ্যা ১০৩৪এ)। প্রকৃতির জগতে বস্তু থেকে জন্ম নেয় রূপ, শুক্রকীট থেকে জন্ম নেয় জীবদেহ। অ্যারিষ্টটল বস্তুকে বললেন নির্জীব, ঘুমন্ত পদার্থ এবং রূপকে জাগ্রতমূর্তি। বস্তু থেকে রূপের জন্মের মধ্যে রয়েছে সৃষ্টির রহস্য। তাঁর মতে, প্রকৃতির ভিতর বৃক্ষ সৃষ্টিতে যে সৃজন-প্রক্রিয়া চলে, সেই একই সৃষ্টি প্রক্রিয়া রয়েছে ব্রোঞ্জ থেকে পাত্র নির্মাণের মধ্যে। বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ তার নিজস্ব সৃজন-প্রক্রিয়ায় প্রাকৃতিক জগতের উপাদান নিয়ে গড়ে তোলে নতুন বস্তু। এই নতুন বস্তু বাহ্য উপাদান থেকে স্বতন্ত্র, কারণ সংগৃহীত উপাদানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শিল্পীর কল্পনা, দক্ষতা তথা বিধাতা-সদৃশ সৃজনকৌশল। শিল্পী তাঁর শিল্পের জগতে দ্বিতীয় ঈশ্বর (পদার্থবিদ্যা ১৯৪এ, আবহবিদ্যা ৩৮১বি, দ্র মানডো ৩৯৬বি)। সুতরাং 'আর্ট ইমিটেট্স্ নেচার' বলে অ্যারিষ্টটল শিল্প ও শিল্পীর মহিমা বাড়িয়ে দিয়েছেন অনেকখানি যা প্লেটোর পক্ষে ছিল অভাবনীয়। চলমান পৃথিবীর এই নিত্য গতি ও স্থিতিকে সুনিপুণ গৃহিণীর মত সুশৃঙ্খলিত করে রাখছে যে প্রকৃতি তারও গৃহিণীপনার অপূর্ণতাটুকু নিজের ক্ষমতায় পূরণ করে দিচ্ছেন শিল্পী। অতএব তাঁকে অ্যারিষ্টটল তুচ্ছ 'অনুকারী'র মর্যাদা দেবেন কি করে ?

আবার শিল্প যে শিল্পীহৃদয়ের আদর্শেরই পূর্ণরূপ, একটি আকস্মিক 'প্রকাশ' মাত্র নয় সে সত্য বোঝাতে গিয়ে অ্যারিষ্টটল বললেন—সন্তানের দেহ ও মনের গঠন যেমন কোন আকস্মিক কিছু নয়; জন্মদাতার সঙ্গে সন্তানের যোগাযোগ থাকে ঘনিষ্ঠ ঠিক তেমনি শিল্পের মধ্যে থাকে শিল্পীর আদর্শবোধ, ব্যক্তিত্ব ও হৃদয়ের স্পর্শ অতএব শিল্প ও আকস্মিক কিছু নয়।[২] মোট কথা, অ্যারিষ্টটল মনে করতেন, প্রকৃতির সৃজন-প্রক্রিয়া শিল্পী অনুকরণ করেন, প্রকৃতির উপাদান শিল্পীকে তাঁর সৃষ্টিকর্মে সাহায্য করে, প্রকৃতির ভিতর যদি কোন উদ্দেশ্য থাকে তবে শিল্পীও সেই উদ্দেশ্যেই শিল্প সৃষ্টি করেন। কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে শিল্পীর এই সম্পর্ক আলোচনা থেকে শিল্পীর ভূমিকা যে প্রকৃতির অন্ধ দাসত্ব করা এমন কথা তিনি বলেছেন না। যা ঘটেছে যা রোজই ঘটছে, অথবা যা

খালি চোখে দেখছি তার বর্ণনা দেওয়াই যে শিল্প-সাহিত্যের কাজ নয় সে কথা অ্যারিষ্টটল আরও স্পষ্টভাবে আলোচনা করেছেন তাঁর ('পোয়েটিক টুথ' অধ্যায়ে) 'কাব্যশাস্ত্র' গ্রন্থে। তিনি কবির সঙ্গে ঐতিহাসিকের পার্থক্য নির্ণয় করে বললেন, এঁদের মৌলিক পার্থক্য এইখানে নয় যে, একজন পদ্যে লিখে থাকেন আর অন্যজন গদ্যে। হোমর ও হেরোডোটাসের পার্থক্য শুধু তাঁদের ভাবপ্রকাশের বাহন কবিতা ও গদ্যের পার্থক্যের মধ্যে নেই। আসলে একজনের অবলম্বন যা ঘটেছে (তিনি হেরোডোটাস), আর অপর জনের (হোমরের) যা ঘটতে পারে। প্রথমজন বিশেষকে মূর্ত করেছেন, দ্বিতীয়জন বিশেষের মাধ্যমে নির্বিশেষ সত্যকে রূপায়িত করেছেন। ট্রাজেডি প্রসঙ্গেও দেখি অ্যারিষ্টটল ভীতি ও করুণা উদ্রেককারী, 'ক্যাথারসিস'-সৃষ্টিক্ষম ট্রাজেডিতে মানবজীবনের যথাদৃষ্টমূর্তির রূপায়ণ-কে শিল্পকর্ম বলেন নি। অতএব যিনি মনে করেন শিল্পে মানবজীবন ও মানবহৃদয়ই অনুকার্য, বাহ্যজগৎ পশ্চাৎপট নির্মাণে সহায়কমাত্র (বুচার-ভাষ্য); আপাত অসুন্দরও শিল্পে সুন্দর হয়ে উঠতে পারে এবং সম্ভাব্যের উপস্থাপনাই শিল্পীর সাধনা, তিনি যে 'মাইমেসিস' শব্দটি 'ইম্পার্সোনেশন' অথবা 'ইমিটেশন' অর্থে ব্যবহার করেন নি সে বিষয়ে সংশয় নেই।

'মাইমেসিস' শব্দটিকে অ্যারিষ্টটল গভীর তাৎপর্যবহ করে ব্যবহার করলেও পরবর্তীকালে বস্তুজগতের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক নিয়ে সাহিত্যিক ও দার্শনিকদের মধ্যে বিভিন্ন মতের প্রচলন দেখা গিয়েছে। ঘটমানের সঙ্গে সাহিত্যের দূরবর্তী সম্পর্ক বোঝাতে গিয়ে কেউ কেউ যেমন সাহিত্যিকের মন ও কল্পনাশক্তির প্রাধান্য মেনে নিয়েছেন যেমন কান্ট, হেগেল ও রোমান্টিক কবিরা; তেমনি বস্তুজগতের ভূমিকার প্রাধান্য ঘোষণা করেছেন 'ন্যাচারালিষ্ট' ও রিয়ালিষ্ট' শিল্পীরা। শিল্পীর কল্পনার মাহাত্ম্যে বিশ্বাসী যাঁরা তাঁরা মনে করেন শিল্পকর্ম প্রকৃতির সৃষ্টির চেয়ে উন্নততর, যেহেতু শিল্প সৃষ্টির পিছনে থাকে মনের মধ্যস্থতা।* (যদি শিল্প প্রকৃতিকে অনুকরণের চেষ্টা করে তবে তা হবে বিরাট হাতির পিছনে হামাগুড়ি দিয়ে চলার মত।*) সুতরাং শিল্পীকে প্রকৃতির ভিতর থেকে কোন কিছু মনোনয়ন করতে হয়, গ্রহণ-বর্জনের পর মনের সহায়তায় তাকে নতুন করে গড়তে হয়। প্রকৃতিকে অনুকরণ করার মত পণ্ডশ্রম না করে মন ও কল্পনা দিয়ে শিল্পী যা গড়লেন তা হয়ে উঠল প্রকৃতির সৃষ্টির চেয়ে পূর্ণতর ও উন্নততর। কল্পনার সর্বব্যাপী মহিমায় বিশ্বাসী রোমান্টিকেরা তো প্রকৃতিকে টেনে নিলেন

মনের গভীরে। দার্শনিক শিলার বললেন, সভ্যতার ক্রমবিকাশে প্রকৃতি ধীরে ধীরে মানুষের অধীনতা স্বীকার করেছে এবং প্রকৃতি শিল্পী-সাহিত্যিকের ভাব ও ভাবনার উদ্দীপনা ঘটাতে সাহায্য করেছে। দমন-পীড়নের সম্পর্ক না থাকায় অনন্ত রূপৈশ্বর্যময়ী প্রকৃতি শিল্পীর হৃদয়ে আনন্দময় রূপসৃষ্টির ব্যাপারে প্রেরণা যোগাচ্ছে অহরহ। কখনও ভাবাবিষ্ট কবি 'বসুন্ধরা' ও সমুদ্রের সঙ্গে দেখছেন তাঁর নাড়ীর যোগ, জন্মজন্মান্তরের আন্তরিক সম্পর্ক; কখনও বা প্রকৃতিকে বলেছেন জীবনের শিক্ষালয়; আবার কখনও নিজের অন্তরের উন্মাদনাকে পশ্চিমাঝড়ের প্রমত্ততার সঙ্গে দিয়েছেন মিলিয়ে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে প্রকৃতিকে অনুকরণ নয়, কল্পনার সহায়তায় প্রকৃতিকে নতুন অর্থতাৎপর্যে নবজন্ম দান করা হয়েছে। কিন্তু ক্লাসিকাল যুগে যেমন বস্তুর 'objective' মূর্তি রূপায়ণের দিকে ঝোঁক দিয়ে লেখকের subjectivityকে অস্বীকার করার প্রবণতা দেখা গিয়েছিল, উনিশ শতকে 'রিয়ালিষ্ট' ও 'ন্যাচারালিষ্ট'রা সেই প্রবণতার চূড়ান্ত রূপ দিলেন তাঁদের সাহিত্যে এবং অন্যান্য শিল্পকর্মে। জোলা, স্ট্রিণ্ডবার্গ, ইবসেন, হেমিংওয়ের মত লেখকেরা যেন পাঠককে দিয়ে বলিয়ে নিতে চেয়েছেন—হ্যাঁ, জীবন এইরকমই ঘটতে দেখেছেন তাঁরা। কিন্তু অ্যারিষ্টটল তো একে 'মাইমেসিস' বলেন নি। তাঁর বক্তব্য ছিল—যা ঘটছে বা ঘটেছে তা নয়, যা ঘটতে পারে সেই সম্ভাব্যের সত্যরূপই ফুটবে শিল্পে। 'মাইমেসিস' তত্ত্বের আর এক পরীক্ষা 'ইম্প্রেশনিস্ট'দের সৃষ্টিতে। 'ইম্প্রেশনিজ্‌ম্'ও একটি objective style। কিন্তু ইম্প্রেশনিস্টরা বিশেষ দৃষ্টিকোণে উদ্ভাসিত কোন বস্তুর যথাযথ প্রতিরূপ নির্মাণ করতে আগ্রহী। 'ইম্প্রেশনিজ্‌ম্'-এর প্রয়োগ যদিও চোখে পড়ে মূলতঃ ছবিতে, তবু মালার্মে-লিলিয়েনক্রনের কবিতায়, টমাস মানের উপন্যাসে বস্তুজগতকে লেখকের বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে যথাযথরূপে ফুটিয়ে তোলার যে প্রচেষ্টা চোখে পড়ে তা 'ইম্প্রেশনিজ্‌ম্'-এরই দৃষ্টান্ত। এখানেও শিল্পীর মনই সক্রিয়-ভূমিকা পালন করে, শুধুই জ্ঞানেন্দ্রিয় বা কর্মেন্দ্রিয় নয়। 'এক্সপ্রেশনিস্ট', 'সিম্বলিষ্ট' বা 'সুর-রিয়ালিস্ট'রা অতঃপর এমন সত্যকে সাহিত্যের সত্য বলে মেনে নিলেন জাগতিক কার্য-কারণের সম্পর্কে যাকে ব্যাখ্যা করা যায় না। রূপক, প্রতীক, চিত্রকল্প এঁদের শিল্পকে এমন স্তরে উন্নীত করল যেখানে 'মাইমেসিস'তত্ত্ব কোন অর্থেই সত্য হয়ে উঠতে পারে না। বিখ্যাত ফরাসী চিত্রকর Rouault তাঁর বন্ধু Jacques Maritain-কে যখন বলেন সূর্যের

আলোয় আলোকিত তুষারাবৃত গ্রামাঞ্চল দেখে বসন্তের গাছ আঁকতে প্রেরণা পান তিনি অথবা রেনোয়া বলেন 'মডেল'গুলি তাঁর কল্পনার সাহসিকতা বাড়িয়ে দেয় মাত্র তখন একথাই কি মনে হয় না শিল্পের প্রকৃত জন্ম শিল্পীর হৃদয়লোকে, বাইরের উপাদানের সঙ্গে তার সম্পর্ক অনিবার্য নয়? শিল্পীর হৃদয়লোকের স্পর্শেই কোন বস্তু 'সত্য' হয়ে ওঠে, এই ধারণা থেকেই অস্কার ওয়াইল্ড গত শতকের শেষ দিকে বলেছিলেন, শিল্প প্রকৃতিকে অনুকরণ করে না; প্রকৃতিই শিল্পকে অনুকরণ করে এবং প্রকৃতি-জগতে কোন বস্তু 'They did not exist till Art has invented them'.[৫] শিল্পীর কল্পনার গুণেই যখন কোন বস্তুর সৌন্দর্য আবিষ্কৃত হয় তখন শিল্পী ছাড়া সুন্দরের অস্তিত্বই নেই। এই কল্পনা-শক্তির অধিকারী বলেই শিল্পী অতিক্রম করেন প্রকৃতিকে এবং কল্পনার দ্বারা গঠিত বলেই শিল্প অতিক্রম করে যায় বহির্জাগতিক তথ্যপুঞ্জকে। এঙ্গেল্‌স্ ঠিকই বলেছেন, সাধারণ প্রাণীরা প্রকৃতি-জগতের বাসিন্দা এবং বসবাস করা ছাড়া প্রকৃতির বুকে পরিবর্তন আনার কোন ক্ষমতা নেই তাদের, কিন্তু মানুষ প্রকৃতিকে পরিবর্তিত করে এবং তার উপর প্রভুত্ব করে।[৬] মানুষ যে প্রকৃতির উপর আধিপত্য স্থাপন করেছে তার কারণ তার 'ইচ্ছা' ও 'কল্পনাশক্তি'। কার্ল মার্ক্স এই সত্যটিই বোঝালেন একটি উপমার সাহায্যে—একজন তৃতীয় শ্রেণীর স্থপতির সঙ্গে উত্তম একটি মৌমাছির পার্থক্য এইখানে, বাস্তবে কোন কিছু রূপ দেওয়ার পূর্বে মনের মধ্যে কল্পনায় তাঁর একটি মূর্তি গঠন করে নেন স্থপতি যা মৌমাছির দ্বারা সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর রূপান্তর ঘটিয়ে যে নতুন বস্তু সৃষ্টি করলেন শিল্পী তিনি তার উদ্দেশ্য সম্পর্কেও সচেতন।[৭] সুতরাং যে কারণে প্রকৃতির অন্যান্য প্রাণীদের ঊর্ধ্বে মানুষ আপনার আধিপত্য বিস্তার করতে পেরেছে বলে এই দুই সমাজ-বাস্তববাদী দার্শনিক মনে করেন তা হচ্ছে, মানুষ ইচ্ছা ও কল্পনাশক্তিসম্পন্ন জীব এবং নিজের কাজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন। অর্থাৎ প্রকৃতি-জগতের সৃষ্টি-প্রক্রিয়া ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে শিল্পীর সৃষ্টিকৌশল ও শিল্পের উদ্দেশ্যের পার্থক্য স্বীকার করেছেন এঁরা। সুতরাং বাচ্যার্থে অ্যারিস্টটলের 'আর্ট ইমিটেট্‌স্ নেচার' এর যাথার্থ্য 'ইম্প্রেশনিস্ট', 'এক্সপ্রেশনিস্ট', 'সিম্বলিস্ট', 'সুররিয়ালিস্ট' এবং সমাজ-বাস্তববাদীরা স্বীকার করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না, যেমন পারেন নি কল্পনার মহিমায় বিশ্বাসী রোমান্টিকেরা।

গ ॥ কল্পনা

কল্পনার ভূমিকা সম্পর্কে অ্যারিষ্টটল তাঁর সচেতনতার প্রমাণ রাখেন নি কোথাও, যদিও কাব্যসৃষ্টির প্রেরণা রূপে তিনি প্লেটো-র মত অলৌকিক কোন শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করেন নি। তাঁর পর খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ কালের ইতালীয় কবি-সমালোচক হোরেস তাঁর 'Ars Poetica'তে যদিও বলেছিলেন কবিতা লিখতে গেলে বিষয় নির্বাচনের পর প্রয়োজন দীর্ঘকালীন ভাবনার অবকাশ তবু 'কল্পনা'র কথা স্পষ্ট করে বলেন নি তিনিও।[১] শিল্প-সাহিত্য যে মুহূর্তের উদ্দীপনার সৃষ্টি নয়, সময়সাপেক্ষ মানসিক ক্রিয়ার ফসল, হোরেস-এর সংকেত ছিল সেইদিকে। হোরেস-এর পর লঞ্জাইনাস তাঁর 'On the sublime' (প্রথম খ্রীষ্টাব্দের রচনা) গ্রন্থের পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে[২] 'ইমেজ' সৃষ্টির কৌশলকে গণ্য করলেন কবির বিশেষ ক্ষমতা রূপে, বললেন এই 'ইমেজ'-এর দ্বারাই কবি-বর্ণিত বিষয়বস্তু পাঠকের মনের দর্পণে অবিকল প্রতিবিম্বিত হয়। এই গ্রন্থেরই চতুর্বিংশতিতম পরিচ্ছেদে[৩] অনুভূতির বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতার একীকরণ-শক্তিকে 'সাব্লাইম' সৃষ্টির উপায় বলে বর্ণনা করলেন তিনি। হোরেস ও লঞ্জাইনাস স্পষ্টতঃ কল্পনাশক্তির কথা বললেন না ঠিকই, কিন্তু কবিতা রচনার জন্য ভাবনার অবকাশের প্রয়োজনীয়তা ও বিচিত্রের একীকরণের ক্ষমতার গুরুত্ব স্বীকার করে 'কল্পনা' সম্পর্কে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও কোল্‌রিজের আলোচনার ভূমিকা প্রস্তুত ক'রে দিলেন। লঞ্জাইনাস এবং তাঁর ইংরেজ অনুগামী জন ডেনিস সম্পর্কে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও কোল্‌রিজের অত্যধিক আগ্রহ ছিল, বলেছেন ভি কোয়েল্সি। সুতরাং কল্পনার সরব মহিমাঘোষক না হলেও হোরেস ও লঞ্জাইনাসই কল্পনাবাদের শ্রদ্ধেয় সূত্রধার।

শেক্সপীয়র তাঁর 'A Midsummer Night's Dream'-এ থিসিউস-এর জবানীতে কল্পনার অসাধ্য সাধন ক্ষমতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে লিখেছিলেন '...As imagination bodies forth / The forms of things unknown ; the poet's pen/Turns them to shapes, and gives to airy nothings / A local habitation and a name.' শেক্‌স্‌পীয়রের এই উক্তিটির ভিতর থেকে তিনটি সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায় : (ক) কবিতা 'কল্পনা'র ফসল, কবিতার আবেদন কল্পনার দুয়ারে। (খ) নিরবয়ব সত্যের আবেদন বুদ্ধির কাছে, কল্পনার কাছে নয়। (গ) কবি নিরবয়ব ভাবকে কল্পনার

দ্বারা অবয়বী করে তোলেন। অজ্ঞাতপরিচয় বস্তুকে কবি যে-শক্তির দ্বারা নির্দিষ্ট রূপে বিধৃত করতে পারেন সেই কল্পনাশক্তির দ্বারা কবি স্বর্গ থেকে মর্ত্যে অনায়াসে যাতায়াত করেন। অর্থাৎ কবির কল্পনাশক্তি স্বর্গ-মর্ত্যের সেতুবন্ধ রচনার প্রধান উপায়। এলিজাবেথীয় যুগের শিল্পীর দ্বারা স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যে যোগাযোগকারী কল্পনার এই মাহাত্ম্যপ্রতিষ্ঠার পিছনে ছিল নিও-প্লেটোনিক দার্শনিকদের প্রভাব। গ্রীক-দর্শনের সঙ্গে নিও-প্লেটোনিক খ্রীষ্টীয় ভাবাদর্শের মিলন সপ্তদশ শতকে দার্শনিক হব্‌স্-এর আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত ছিল অচঞ্চল।

হব্‌স্ শিল্পতত্ত্বে মনস্তাত্ত্বিক জিজ্ঞাসা প্রয়োগ করে নতুনত্ব সৃষ্টি করেন। হব্‌স্ ছিলেন অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক। তাঁর মতে সেই জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ যা আমাদের ইন্দ্রিয়ের পথে আবির্ভূত হয়। সুতরাং সচেতন সক্রিয় ইন্দ্রিয়ই সব কিছুর প্রধান বিচারক। তাঁর 'লেভিয়াথানে'র (১৬৫১) প্রারম্ভিক পরিচ্ছেদে হব্‌স্ বললেন, আমাদের ইন্দ্রিয়ের পথে আগত কোন বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান বা বোধ স্মৃতির মধ্যে ধীরে ধীরে সঞ্চিত হয় 'ইমেজের' আকারে। এই 'ইমেজ'গুলি বস্তুর অনুপস্থিতিকালেও বর্তমান থাকে। এই ইমেজের সঞ্চয় থেকেই 'জাজমেণ্ট' এবং 'ফ্যান্সি' বা 'ইমাজিনেশন' জন্ম গ্রহণ করে (হব্‌স্ 'ফ্যান্সি' ও 'ইমাজিনেশনের' মধ্যে কোন পার্থক্য করেন নি)। হব্‌স্ বলছেন, বিসদৃশ বস্তুসমূহের মধ্যে পার্থক্য নির্ণীত হয় যে ক্ষমতার দ্বারা তাকে বলে 'জাজমেণ্ট' এবং বিসদৃশের মধ্যে সাদৃশ্য সন্ধান করা যায় যে শক্তির দ্বারা তা-ই 'ফ্যান্সি'। তাঁর মতে, 'জাজমেণ্ট' ছাড়া 'ফ্যান্সি' শ্রদ্ধেয় নয়, যদিও 'ফ্যান্সি' ছাড়াই জাজমেণ্টের অস্তিত্ব ও পৃথক্‌মূল্য থাকা সম্ভব এবং থাকেও। দেখা যাচ্ছে, হব্‌সের মতে, 'ফ্যান্সি' বা 'ইমাজিনেশন' অর্থাৎ কল্পনা 'জাজমেণ্ট' বা বিচারবুদ্ধির দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত হওয়া প্রয়োজন। একমাত্র বিচার-বুদ্ধি-শাসিত কল্পনাশক্তিই মানুষের হৃদয় ও মনকে অভিভূত ও পরিচালিত করতে পারে। এইভাবে হব্‌স্ স্পষ্টতঃই কল্পনাকে বিচারবুদ্ধির অধীনে করে নিলেন। বোধহয়, 'কল্পনা'কে উন্মাদের অনিয়ন্ত্রিত ভাববিলাস থেকে পৃথক্ করতে চেয়েছিলেন তিনি। হব্‌স্, অ্যারিস্টটলের মত ঐতিহাসিকের ঊর্ধ্বে কবিকে স্থাপন করলেন, কিন্তু দার্শনিকের ঊর্ধ্বে নয়। হব্‌স্-এর মত 'লক'ও ছিলেন অভিজ্ঞতায় বিশ্বাসী। হব্‌স্‌কে অনুসরণ করে তাঁর 'Essay concerning Human understanding' (১৬৯০) গ্রন্থে লক মানবমনের দুটি পৃথকশক্তির কথা জানালেন। একটি শক্তির দ্বারা বিভিন্ন

পৃথক জাতীয় বোধের মধ্যে সাদৃশ্য আবিষ্কার করা হয়ে থাকে, এবং অপরশক্তির সহায়তায় সম্ভব হয় বিভিন্নবোধের মধ্যে পার্থক্য সন্ধান করা। কিন্তু হব্‌স্‌-এর সঙ্গে লক-এর পার্থক্য এইখানে যে, সমস্তজীবন ধরে হব্‌স্‌ ছিলেন সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি, আর লক সাহিত্যকে দেখেছিলেন ছোট নজরে। তাই হব্‌সের 'কল্পনা' সম্পর্কে বক্তব্যের উপর লক আঘাত করলেন তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণে (১৭০০) 'কল্পনার' সঙ্গে 'ভাবানুষঙ্গ' তত্ত্বকে একাকার করে। তাঁর অভিমত হচ্ছে, কোন বিশেষ পরিবেশ-জাত বিশেষ উপলব্ধি ভিন্ন পরিবেশে জাগ্রত হলে কল্পনার পটে পূর্বের পরিবেশকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। লক-এর এই ব্যাখ্যা-অনুযায়ী কাব্য-সাহিত্য পাঠে পাঠকের মনের জগতে ভেসে ওঠে যে ছবি সেই ছবি পাঠকের অভিজ্ঞতা থেকে সংগৃহীত এবং স্মৃতিলোকে সঞ্চিত 'কল্পনা' বলে কথিত হ'য়ে থাকে। 'কল্পনা'র সঙ্গে পূর্ব-অভিজ্ঞতার একটা সম্পর্ক আছে এবং পাঠকের কাব্যোপলব্ধির ক্ষেত্রে এই 'কল্পনা' বা পূর্ব-অভিজ্ঞতার মূল্য অপরিসীম। প্রশ্ন হচ্ছে পাঠকের তরফ থেকে কল্পনার এই ধরণের ব্যাখ্যা সম্ভব হলেও লেখকের 'কল্পনাশক্তি', যার দ্বারা সাহিত্যসৃষ্টি হয়ে থাকে তাঁর স্বরূপ কী ? উত্তর নেই। হব্‌স্‌ এর মতবাদ যেমন কবি ড্রাইডেনকে প্রভাবিত করেছিল, লক-এর মতবাদও তেমনি এডিসন ও দার্শনিক হার্ট্‌লেকে পথ দেখাল। হার্টলে বললেন, কোন বস্তু প্রথমত আমাদের ইন্দ্রিয়ের পথে আবেদন সৃষ্টি ক'রে মনে 'আইডিয়া' হিসেবে বিরাজ করে। বস্তুর অনুপস্থিতিতেও সেই আইডিয়া বর্তমান থাকে 'মেমারি' বা 'স্মৃতি'তে। অতঃপর বিভিন্ন 'আইডিয়া' বা 'ইমেজ' থেকে গড়ে ওঠে 'কমপ্লেক্স আইডিয়া' বা ভাবনা। মনের যে পৃথক একটি সৃজনক্ষমতা আছে তা লক বা হার্টলে স্বীকার করলেন না, 'মেমারি' এবং 'ইমেজ'-এর উপরই গুরুত্ব আরোপ করলেন তাঁরা। কিন্তু বার্ক তাঁর 'On Taste'-এ শিল্পীর ইন্দ্রিয়ের পথে আগত 'ইমেজ'গুলি নতুন পদ্ধতিতে বিভিন্ন ক্রমে সাজিয়ে নতুন রূপসৃষ্টি করার ক্ষমতাকে 'কল্পনা-শক্তি' বলে উল্লেখ করে লক ও হার্টলে-র ভাবাদর্শ থেকে দূরে সরে এলেন। শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'ইমাজিনেশন'-এর গুরুত্ব যিনি সবিস্তারে আলোচনা করলেন তিনি দার্শনিক কাণ্ট। কাণ্ট 'কল্পনা'কে ভাগ করলেন (১) Reproductive (২) Productive এবং (৩) Aesthetic এই তিনভাগে। প্রথমশ্রেণীর কল্পনা হচ্ছে, কোল্‌রিজ যাকে বলেছিলেন 'ফ্যান্সি', বাঙলায় যাকে বলা যায় লঘুকল্পনা এবং রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন 'কাল্পনিকতা'।

দ্বিতীয়শ্রেণীর কল্পনাশক্তির সাহায্যে ইন্দ্রিয়বোধ থেকে জন্ম নেয় উপলব্ধি। চিন্তার জগতের সঙ্গে বস্তুজগতের সেতুবন্ধন রচিত হয় এই কল্পনার দ্বারাই। তৃতীয়শ্রেণীর 'কল্পনা'শক্তি থেকে আসে অতীন্দ্রিয়তার বোধ ও সৌন্দর্যবোধ। যদিও কাব্যের জগৎ সৌন্দর্য ও আনন্দের জগৎ তবু যে শক্তির সাহায্যে বিচিত্রের সন্নিবেশ ও নতুনের রূপ-নির্মাণ ঘটছে সেই 'কল্পনা'র প্রতিটি ভাগই শিল্প-সাহিত্যে কম-বেশী মূল্যবান। কান্ট বলছেন এই কল্পনাশক্তির সাহায্যেই পরিচিত জগতের উপাদান নিয়েই শিল্পী গড়ে তুলছেন নতুন জগৎ এবং যাকে আমরা 'প্রতিভা' বলি তা 'কল্পনা' ও 'চিন্তা'র সমবায়ে গড়ে ওঠে। কান্টের প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল ইংরেজ রোমান্টিক কবিদের উপর, বিশেষ করে কোলরিজের উপর।

ইংরেজ রোমান্টিক কবিরা প্রথমেই বর্জন করলেন তাঁদের পুরোবর্তী অগাস্টান কবিদের যুক্তি ও বুদ্ধি-শাসিত 'কল্পনা' সম্পর্কে অনুরাগ। শেক্‌স্‌পীয়রের অনুরাগী কীট্‌স্‌ বললেন—কবিতা রচনার প্রথম প্রয়োজনীয় উপাদান হচ্ছে 'কল্পনা'। কবি তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতাসমূহ এই কল্পনাশক্তির দ্বারাই গড়ে তোলেন এক একটি কবিতা। কবি-কল্পনা সেই কেন্দ্রানুগ শক্তি যার দ্বারা বর্তমান বা পুরাঘটিতের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ ঐক্য রচনা করা সম্ভব। কীট্‌স্‌ 'কল্পনা'কে এতই উচ্চস্থান দিলেন যে তাঁর মতে, কল্পনা যাকে সুন্দর বলে স্বীকার করেছে তা-ই 'সত্য' বলে গণ্য হবে, বাস্তবে তার অস্তিত্ব থাক বা না-থাক।* এই 'কল্পনা' এমন একটি শক্তি যার সাহায্যে সৃষ্ট কবিতাকে মনে হয় বৃক্ষে নবপত্রোদ্গমের মতই স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক। কীট্‌স্‌, পূর্বেই বলেছি, পূর্বসূরী শেক্‌স্‌পীয়র-এর অনুরাগী ও অনুসারী এবং শেক্‌স্‌পীয়রের মতই কল্পনার দিগ্বিজয়ী মূর্তি দেখেছিলেন তিনি। তবে তাঁর সমকালীন ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ ও কোলরিজের মত পাণ্ডিত্যপূর্ণ পদ্ধতিতে 'কল্পনা'কে 'ফ্যান্সি' ও 'ইমাজিনেশন' এ বিভক্ত করেন নি বা সেইভাবে চিন্তাও করেন নি। পূর্বে বলা হয়েছে ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ ও কোলরিজ, ইংরেজী রোমান্টিক কাব্যধারার এই দুই সূত্রধার ছিলেন লঞ্জাইনাস ও তাঁর ভাবাশয় জন ডেনিসের ভক্ত। তদুপরি কান্ট, শিলিং প্রমুখ জার্মান দার্শনিকের রচনার সঙ্গে উভয়েই এবং বিশেষভাবে কোল্‌রিজ ঘনিষ্ঠ ছিলেন।

'লিরিকাল ব্যালাড্‌স্‌'-এর মুখবন্ধে ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ এবং 'বায়োগ্রাফিয়া লিটারেরিয়া'য় কোল্‌রিজ 'কল্পনা' সম্পর্কে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেন উনবিংশ

শতকের প্রথমভাগেই। 'লিরিকাল ব্যালাড্‌স্‌'-এর মুখবন্ধে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ কাব্যকে বললেন অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ। কথাটা একাধিকবার উচ্চারণ করেছিলেন তিনি। কিন্তু তারপর অনুভূতির মৌহূর্তিক অসংযত প্রকাশই যে কাব্য নয়, সে বিষয়ে সতর্ক হয়ে বললেন 'নিস্তাপ স্মৃতির অন্তর রোমন্থন'* থেকে কাব্যের জন্ম। স্মৃতির এই রোমন্থনই কল্পনার শক্তি যা লেখককে অবাস্তব উচ্ছ্বাসের অমার্জিত আধিপত্য থেকে মুক্তি দেয়। উচ্ছ্বাসই কবিত্ব নয়, উচ্ছ্বসিত মন্তব্যই কবিতা নয়। এই ধারণা ওয়ার্ডস্বার্থ ও কোল্‌রিজ উভয়েরই ছিল। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে লেখা 'লিরিকাল ব্যালাড্‌স্‌'-এর মুখবন্ধে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ সুনিপুণ ভঙ্গিতে না হলেও 'ফ্যান্সি' ও 'ইমাজিনেশন'-এর পার্থক্য নির্ণয়ের চেষ্টা করেছিলেন। এরপর উইলিয়ম টেলর ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর একটি রচনায়* 'ইমাজিনেশন'-এর ঊর্ধ্বে 'ফ্যান্সি'কে আসন দেওয়ায় ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর একটি প্রবন্ধে° টেলর-কে আক্রমণ করতে গিয়ে স্পষ্ট ভাষায় 'ফ্যান্সি' অপেক্ষা 'ইমাজিনেশন'কে উন্নততর শক্তি বলে ঘোষণা করলেন। 'ফ্যান্সি'র লীলা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ দেখেছেন বিস্ময়কর, হাস্যকর ও আমোদজনক রচনায় আর 'কল্পনা', তাঁর মতে, সেই শক্তি যা উন্নততর বোধ ও স্মৃতিকণাগুলিকে দান করে অখণ্ডতা। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের একটি রচনায় কোল্‌রিজ 'কল্পনা'কে বিপরীতের সমন্বয় সাধক ও ভাবোদ্দীপক শক্তি বলে উল্লেখ করলে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রতিবাদ জানালেন এই বলে যে, আসলে 'ফ্যান্সি' ও 'ইমাজিনেশন' একই শক্তির যথাক্রমে নিম্ন ও উন্নত স্তর মাত্র। কিন্তু ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'বায়োগ্রাফিয়া লিটারেরিয়া'র চতুর্থ পরিচ্ছেদে প্রতিভাবান বন্ধু ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতায় গভীর অনুভূতির সঙ্গে প্রগাঢ় চিন্তাশক্তির সমন্বয়ের প্রশংসা করেও কোল্‌রিজ, 'ইমাজিনেশন' প্রসঙ্গে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের দেওয়া তত্ত্বের বিরোধিতা করে বললেন 'ফ্যান্সি' ও 'ইমাজিনেশন' একই শক্তির দুটি পৃথক নাম নয়, সম্পূর্ণ দুটি পৃথক শক্তি। কোল্‌রিজ, কান্টের পথ অনুসরণ করে 'কল্পনা'কে 'ফ্যান্সি', 'প্রাইমারি ইমাজিনেশন' ও 'সেকেণ্ডারি ইমাজিনেশন' এই তিনভাগে বিভক্ত করলেন। কান্ট যাকে বলেছেন 'Reproductive Imagination' কোল্‌রিজ তাকে বলেছেন 'Fancy', কান্ট যাকে বলেছেন 'Productive Imagination' কোল্‌রিজের ভাষায় তা হচ্ছে 'Primary Imagination' এবং কান্টের 'Aesthetic Imagination' হচ্ছে কোল্‌রিজের 'Secondary Ima-

gination'। কাণ্ট-এর 'Productive Imagination' সেই শক্তি যার সাহায্যে বস্তুজগৎ ও চিন্তা বা ভাবজগতের মধ্যে যোগসূত্র রচনা সম্ভব হয়ে থাকে। 'Primary Imagination' বলতে কোলরিজও মূলত এই কথাই বলেছেন। 'Secondary Imagimation' কেই কোল্‌রিজ বলেছেন যথার্থ সৃজনধর্মী বা 'Creative Imagination'। এই শক্তির দ্বারাই বিপরীত ধরণের অভিজ্ঞতা বা বস্তুর মধ্যে প্রথমে পৃথকীকরণ ও পরে একীকরণ করা সম্ভব হয়ে থাকে। অর্থাৎ সৃজনধর্মী কল্পনাকে কোল্‌রিজ একই সঙ্গে 'যাজমেণ্ট' ও 'ফ্যান্সি (হব্‌স্‌ এর ভাষায় 'ফ্যান্সি', যা কি-না 'ইমাজিনেশন' থেকে পৃথক নয়।) বলে চিহ্নিত করলেন। কান্টীয় পদ্ধতি অনুসারেই কোল্‌রিজ সৃজনধর্মী কল্পনাকে যুক্তিনিয়ন্ত্রিত শক্তি বলে উল্লেখ করলেন। এর বিপরীতে অবশ্যই 'ফ্যান্সি'র অবস্থান, যেহেতু 'The Fancy is emancipated from the order of time and space'। কোল্‌রিজের ব্যাখ্যানুযায়ী তাঁর মূল বক্তব্য এইভাবে উপস্থাপিত করা যেতে পারে: 'কল্পনা' অনৈক্যের সঙ্গে ঐক্যের, নির্বিশেষের সঙ্গে বিশেষের, ভাবের সঙ্গে রূপের, আবেগের সঙ্গে শৃঙ্খলার, স্বাভাবিকতার সঙ্গে কৃত্রিমতার ভারসাম্য রক্ষা করে। কোল্‌রিজের 'বায়োগ্রাফিয়া লিটারেরিয়া' প্রকাশের চার বছর পরে লেখা (১৮২১ ফেব্রুয়ারী-মার্চ)'এ ডিফেন্স অব পোয়েট্রি'তে শেলী কবিতার কথা বলতে গিয়ে যেন পূর্ববর্তীদের সিদ্ধান্ত থেকেই শুরু করলেন এই বলে, কবিতা হচ্ছে কল্পনার রূপ। তিনি 'ফ্যান্সি' ও 'ইমাজিনেশন'-এর মধ্যেকার পার্থক্য আলোচনায় কালক্ষেপ না করে অসীম, চিরন্তন ও 'এক'-এর রূপকার কবিদের বললেন 'unacknowledged legislators of the world'; কবিতাকে বললেন স্বর্গীয় এক আনন্দের গঙ্গোত্রী। 'কল্পনা'র সাহায্যে প্রকাশিত কবিতা, শেলীর মতে, পাঠকের কল্পনা-শক্তির বিস্তারক এবং তা সৌন্দর্যের উপরকার আবরণ ধীরে ধীরে অপসারিত ক'রে অলৌকিক পদ্ধতিতে মানুষের নৈতিক উন্নতিসাধন করে। এই হচ্ছে, শেলীর মতে, কবি, কবিতা ও মানবজীবনে কবিতার ভূমিকা। মোটকথা, যিনি যে-ভাবেই ব্যাখ্যা করুন না কেন, এই ইংরেজ রোমান্টিক কবি-চতুষ্টয় 'কল্পনা'কেই মেনে নিয়েছিলন কাব্যের নিয়ন্ত্রী শক্তিরূপে, প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন অগাষ্টানদের 'কল্পনা'র উপর বুদ্ধি ও যুক্তিকে স্থাপনের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে। রোমান্টিক রবীন্দ্রনাথ রোমান্টিক কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও কোল্‌রিজের মত সাবস্তারে না হলেও

'ইমাজিনেশন' ও 'ফ্যান্সি'র মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করেছিলেন এইভাবে— 'কল্পনা এবং কাল্পনিকতা দুইয়ের মধ্যে একটা প্রভেদ আছে। যথার্থ কল্পনা, যুক্তিসংযম এবং সত্যের দ্বারা সুনির্দিষ্ট আকারবদ্ধ—কাল্পনিকতার মধ্যে সত্যের ভান আছে মাত্র, কিন্তু তাহা অদ্ভুত আতিশয্যে অসংগতরূপে স্ফীতকায়। তাহার মধ্যে যেটুকু আলোকের লেশ আছে ধূমের অংশ তাহার শতগুণ। যাহাদের ক্ষমতা অল্প তাহারা সাহিত্যে প্রায় এই প্রধূমিত কাল্পনিকতার আশ্রয় লইয়া থাকে; কারণ, ইহাকে দেখিতে প্রকাণ্ড, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত লঘু'।[৮] রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন 'কল্পনা' তা হচ্ছে কোল্‌রিজের Secondary Imagination এবং কাণ্ট তাকে বলেছিলেন 'Aesthetic Imagination' আর রবীন্দ্রনাথের 'কাল্পনিকতা'ই কোল্‌রিজের Fancy এবং কাণ্টের 'Reproductive Imagination,'

ইংলণ্ডের ভিক্‌টোরীয় যুগে জন রাস্কিন তাঁর 'মডার্ণ-পেইণ্টার্স'-এর দ্বিতীয়খণ্ডে (১৮৪৩) প্রসঙ্গক্রমে 'কল্পনা' সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে 'ফ্যান্সি' ও 'কল্পনা'র মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করলেন ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থীয় পদ্ধতিতে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মত রাস্কিনও 'ফ্যান্সি' ও 'ইমাজিনেশন'কে গ্রহণ করলেন একই শক্তির যথাক্রমে লঘু ও গুরু এই দুই স্তরে। রাস্কিন বললেন, 'ফ্যান্সি'র দ্বারা কোন বস্তুর বহির্দৃশ্যের পরিচ্ছন্ন ও বিস্তারিত রূপ দেওয়া সম্ভব, অন্যদিকে 'ইমাজিনেশন'ই কোন বস্তুর অন্তরের গভীরে নিমজ্জিত হতে সহায়তা করে।[৯] রাস্কিন-এর সমকালেই সমালোচক ই. এস. ডালাস[১০] 'কল্পনা'কে গ্রহণ করলেন মানবমনের অবচেতনের ক্রিয়ারূপে। কবিদের কবিতা যতক্ষণ পর্যন্ত মনের গোপন গভীরে আবেদন উপস্থিত করে ততক্ষণ তার মূল্য। বিজ্ঞানের আবেদন সজ্ঞান মনের কাছে, আর আত্মসচেতনতা বা সজ্ঞানতা কাব্যের পক্ষে ক্ষতিকর। যে শক্তির সাহায্যে মানুষের পক্ষে বিশেষ থেকে নির্বিশেষ, ক্ষণকালীন থেকে চিরন্তন, ব্যক্তি থেকে নৈর্ব্যক্তিক সার্বভৌমের দিকে অগ্রসর হওয়া সম্ভব, ডালাসের মতে, তা হচ্ছে 'কল্পনা'। ডালাসের 'কল্পনা' অবচেতনের শক্তি। বিরোধীবস্তুর সমন্বয় সাধনকারী শক্তি বলে গ্রহণ করে কোল্‌রিজ-ও কল্পনাকে গোপন ও মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার বলে মেনেছিলেন, কিন্তু সমন্বয়ের ক্ষেত্রে সচেতন যুক্তিশাসিত মনের ও আধিপত্যের স্বীকার করেছেন। সুতরাং কোল্‌রিজ শিল্পসৃষ্টির ব্যাপারে অবচেতনের ক্রিয়া ও যুক্তি উভয়কেই স্বীকার করে 'কল্পনা'কে

শিল্পের এমন অন্তরঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ উপাদানে পরিণত করেছিলেন যা অন্য কারুর বিশ্লেষণে স্পষ্ট হয় নি.।

বর্তমান শতকের গোড়ার দিকে কবি রিল্‌কে কবি-কল্পনাকে এক 'যন্ত্র' রূপে গণ্য করেছিলেন যার সাহায্যে পুরাঘটিতের সঙ্গে ঘটমানের সংযোগ রক্ষা সম্ভব। অন্যদিকে আই. এ. রিচার্ডস্ লক্ষ্য করেছেন, অন্ততঃ ছয়টি পৃথক অর্থে 'ইমাজিনেশন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[১১] বিস্তারিত আলোচনার মধ্য থেকে 'ইমাজিনেশন' সম্পর্কে রিচার্ডস্-এর এই ধারণা প্রকাশ পেয়েছে—জটিল চিন্তা-ভাবনার মধ্যে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ সুশৃঙ্খল ঐক্যরচনা সম্ভব হয় যে-শক্তির সহায়তায় তারই নাম 'কল্পনা'। শিল্প-সাহিত্যের জগতে এই 'কল্পনা'র ভূমিকা বস্তুবাদীরাও স্বীকার করেছিলেন, কারণ 'কল্পনা' ব্যতীত বস্তুর বিবৃতিমাত্র যে সাহিত্য হয় না সে বিষয়ে তাঁরা ছিলেন সম্পূর্ণ সচেতন। সাহিত্যে 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদে'র পুরোহিত মাক্সিম গোর্কি বলেছিলেন, জীবন-সংগ্রামে মানুষ আত্মরক্ষার জন্য দুটি সৃজনধর্মী হাতিয়ার ব্যবহার করেছে—একটি 'জ্ঞান', অপরটি 'কল্পনা'। প্রকৃতির বিভিন্ন প্রকাশকে বীক্ষণ ও পর্যালোচনা এবং সমাজজীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ করার দক্ষতা জন্মে যার সাহায্যে তারই নাম 'জ্ঞান'। জ্ঞান হচ্ছে চিন্তন। যদিও 'কল্পনা' একধরণের 'চিন্তন' কিন্তু সেখানে চিন্তা-র প্রকাশ ঘটে 'ইমেজে'র মূর্তিতে। বলা যেতে পারে, 'কল্পনা' এমন একটি শক্তি যার সাহায্যে মানুষ প্রাকৃতিক বিষয়বস্তুর উপর মানবিকগুণ, অনুভূতি ও বৈশিষ্ট্য আরোপ করে থাকে।[১২] বস্তুতঃ যেহেতু সমাজতান্ত্রিকেরা মানুষকে স্থাপন করেন সর্বোচ্চে, মানুষের দুঃখ-সুখই তাঁদের আলোচ্য, অতএব কল্পনার স্বেচ্ছাচারিতায় বা সর্বময়-প্রভুত্বে তাঁদের বিশ্বাস না থাকলেও 'কল্পনা'কে তাঁরা মানুষের চিত্তমুক্তির প্রকাশ রূপে গণ্য করেন। মানুষ যে মৌমাছি নয়, মার্ক্স বলেছেন, তার কারণ মানুষের রয়েছে কল্পনাশক্তি এবং উদ্দেশ্য সচেতনতা। লেনিনও মায়াকভস্কি অপেক্ষা পুশ্‌কিনের লেখা অনেক বেশী আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করেছেন যেহেতু তিনি মনে করতেন মানবজীবন ও সভ্যতার বিকাশে 'কল্পনা' একটি অপরিহার্য উপাদান এবং সার্থক সমাজবাদের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় কল্পনা-শক্তিহীন ব্যক্তিদের দ্বারা। মোটকথা, ভাববাদী দার্শনিকদের কাছে 'কল্পনা' যেখানে আধ্যাত্মিকজগৎ ও শিল্প-সাহিত্যের জগতের অন্তরঙ্গ উপাদান সেখানে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদী 'কল্পনা'কে মনে করেন জীবন-বিকাশের সমস্ত ক্ষেত্রে অপরিহার্য অঙ্গ। সাহিত্যও

যেহেতু মানুষের ভাব ও ভাবনা প্রকাশের একটি সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম (বিজ্ঞান ও সাহিত্যকে সমাজবাদী মনে করেন জীবনের দুটি দিকের প্রকাশ। কি করতে হবে তার নির্দেশ আছে সাহিত্যে এবং কেমন করে করতে হবে তার পথ দেখায় বিজ্ঞান) অতএব সেক্ষেত্রে 'কল্পনা' অনিবার্য উপাদান। কিন্তু এই 'কল্পনা' শুধু লেখকেরই সহায় নয়, পাঠকের পক্ষেও 'কল্পনা' কাব্যোপলব্ধির ক্ষেত্রে অপরিহার্য। লেখক ও পাঠকের পারস্পরিক সহযোগিতায় গড়ে উঠছে যে সাহিত্যের জগৎ সেখানে উভয় তরফের কল্পনাশক্তির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন স্টিফেন স্পেণ্ডার তাঁর 'The Struggle of the Modern' গ্রন্থে : 'Through the fusion of the imagination of the writer with that of the reader, the reader is able to hear with the ears, see through the eyes, feel with the feelings of the writer, the world which becomes that of both'.[১৩]

সুতরাং সাহিত্যের জগতে 'কল্পনা' লেখকের শক্তি, পাঠকেরও শক্তি। একজন কল্পনা-শক্তির সহায়তায় যে অরূপ-কে রূপদান করেন, অন্যজন কল্পনার সহায়তায় সেই 'রূপবান'কে আপন অন্তরে 'অরূপরতনে' পরিণত করেন। শিল্পীর সাধনা অরূপ থেকে রূপের দিকে এবং রসিকের সাধনা রূপ থেকে অরূপের অভিমুখে। আর কল্পনা হচ্ছে অরূপ থেকে রূপে এবং রূপ থেকে অরূপে যাতায়াতের প্রধান পাথেয়।

ঘ ॥ স্রষ্টা ও প্রকাশ

'কল্পনা'র সাহায্যে শিল্পী গড়ে তোলেন যে শিল্পের জগৎ, যেখানে তিনি স্বয়ং ঈশ্বরসদৃশ, সেই জগতের রূপনির্মাণের প্রেরণা আসে শিল্পীর আত্মপ্রকাশ-কামনা থেকে। প্লেটো যদিও সেই প্রেরণাকে মনে করতেন দিব্যলোক-সম্ভূত কিন্তু যেহেতু তাঁর সেই অনুমানে বৈজ্ঞানিক (কার্য-কারণের) বুদ্ধির কোন স্থান ছিল না তা-ই মধ্যযুগব্যাপী সেই মতবাদের ব্যাপক প্রসার সত্ত্বেও একালে তার গুরুত্ব শুধু হ্রাস পায় নি, দিব্য-প্রেরণাতত্ত্বই বর্জিত হয়েছে সাহিত্যের জগৎ থেকে। একালে সাহিত্য-সৃষ্টির কারণরূপে যে সমস্ত 'প্রেরণা'র অস্তিত্ব

স্বীকার করা হয়েছে তার মধ্যে প্রথমতম হচ্ছে 'প্রকাশ কামনা'—'সাহিত্যের মধ্যেও হৃদয়ের প্রকাশধর্মের লক্ষ্যহীন নৃত্যচাঞ্চল্য যথেষ্ট স্থান পাইয়াছে। ...সাহিত্যে মানুষ কেবল যে আপনার ভাবের প্রাচুর্যকেই প্রকাশ করিয়া থাকে তাহা নহে, সে আপনার প্রকাশ শক্তির উৎসাহমাত্রকেই ব্যক্ত করিয়া আনন্দ করিতে থাকে। কারণ প্রকাশই আনন্দ।'[১] মানুষের সমস্ত কর্মের মধ্যে রয়েছে তার প্রকাশ কামনা এবং সাহিত্যেও সেই প্রকাশ বাসনা মূর্তিমান। তবে সে প্রকাশ, রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র বলেছেন, 'ভাবের প্রাচুর্যের' প্রকাশ, জ্ঞানের প্রকাশ নয়। জ্ঞানের প্রকাশ বিজ্ঞানে-দর্শনে, কিন্তু 'ভাবের প্রকাশ' সাহিত্যে। বহির্জগৎ সাহিত্যিকের অন্তরে প্রবেশ করে রূপ নিচ্ছে অপরূপ মানসজগতে। কিন্তু সেই মানস-জগৎকে সাহিত্যিক যতদিন না বাইরে প্রকাশ করতে পারছেন ততদিন তা নিরর্থক। সুতরাং ভাবের জগৎ বা মানস-জগতের সার্থকতা সকলের সামনে প্রকাশিত হওয়ার মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'যে কাঠ জ্বলে নাই তাহাকে আগুন নাম দেওয়া যেমন, যে মানুষ আকাশের দিকে তাকাইয়া আকাশেরই মতো নীরব হইয়া থাকে তাহাকেও কবি বলা সেইরূপ। প্রকাশই কবিত্ব, মনের তলার মধ্যে কী আছে বা না আছে তাহা আলোচনা করিয়া বাহিরের লোকের কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।'[২] যদিও সব প্রকাশই কবিতা নয়, বিশেষ ধরণের প্রকাশের নাম কবিতা, তবু কবিতাকে কবিতা-রূপে স্বীকৃতি লাভের জন্য প্রকাশিত হতে হবে; এর কোন বিকল্প নেই। 'প্রকাশ' ছাড়া সাহিত্য নেই, তা-সে 'কল্পনার প্রকাশ' বা 'কল্পনার দ্বারা প্রকাশ' যাই হোক না কেন। কিন্তু 'কল্পনা' ও 'প্রকাশ' এই দুটি ক্রিয়াকে স্বতন্ত্ররূপে চিহ্নিত করার দিকে সাধারণ মানুষের প্রবণতা দীর্ঘকালের। সাধারণের ধারণা—র‍্যাফেল-এর হাতে ম্যাডোনার ছবি ফুটে উঠেছিল তার কারণ অন্তরের অনুভূতিকে বাইরে রূপদান করার দক্ষতা ছিল তাঁর নতুবা ম্যাডোনার মূর্তিকল্পনা অনেকের মনের ভিতরেই জেগেছে, অথবা মিল্টনের 'প্যারাডাইস লস্ট'-এর অনন্যতা এই কারণে নয় যে, সাধারণ মানুষের চেয়ে মিল্টনের আবেগ বা অনুভূতি অনেক বেশী, আসলে অন্তরের ভাবকে প্রকাশ করার দক্ষতা ছিল তাঁর, যা অন্য সকলের ছিল না। অনুভূতি বা কল্পনার সঙ্গে প্রকাশের ক্রিয়াকে স্বতন্ত্র করার এই প্রবণতার বিরোধিতা করে শিল্পতত্ত্বের জগতে নব দিগন্ত উন্মোচিত করলেন ইতালীয় নন্দনতাত্ত্বিক বেনেদেত্তো ক্রোচে।

ক্রোচে ভাব বা অনুভূতি থেকে 'প্রকাশ'কে পৃথক্ রূপে দেখলেন না। 'নির্বাকমিন্টন'-এর কোন অস্তিত্বই মানলেন না তিনি। ক্রোচে বললেন, শিল্প হচ্ছে মানবচৈতন্যের জ্ঞানার্জনী বৃত্তির প্রকাশ (Knowing or Theoretic activity-র দুটি ভাগ করেছেন তিনি—(ক) শিল্প, (খ) বিশুদ্ধ বিজ্ঞান বা দর্শন)। তিনি চৈতন্যের ক্রিয়াকে প্রথমে দুটি স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠে ভাগ করে নিলেন —জ্ঞানার্জনী বৃত্তির ক্রিয়া এবং কার্যকারিণী বৃত্তির ক্রিয়া। তার মতে 'শিল্প' হচ্ছে নৈতিক বা অর্থনৈতিক কার্যকারিণী-বৃত্তির সম্পর্ক-বহির্ভূত একটি জ্ঞানাত্মিকা ব্যাপার। এইভাবে ক্রোচে তাঁর পুরোবর্তী নন্দনতাত্ত্বিকদের শিল্পের জগতে সুখ ও সুখানুভূতির উপর গুরুত্ব আরোপ করার প্রবণতাকে দূরে সরিয়ে 'চৈতন্য' ও 'জ্ঞানের' শক্তিকে স্থাপন করলেন শিল্পতত্ত্বালোচনার অগ্রভাগে। কিন্তু এই 'জ্ঞান' সাধারণ দার্শনিক বা নৈয়ায়িক জ্ঞান নয়। ক্রোচে বলছেন, জ্ঞান দ্বিবিধ—(১) নৈয়ায়িক জ্ঞান (Logical knowledge), (২) প্রাতিভানিক জ্ঞান বা স্বজ্ঞা (Intuitive knowledge)। তন্মধ্যে শিল্পে যে জ্ঞানের প্রকাশ তা নৈয়ায়িক জ্ঞান নয়, প্রাতিভানিক জ্ঞান। এখন 'প্রাতিভানিক জ্ঞান' বা 'ইন্‌ট্যুশন' বলতে ক্রোচে কি বুঝিয়েছেন দেখা দরকার।

'ইন্‌ট্যুশন' (বা স্বজ্ঞা) শব্দটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ক্রোচে তাকে বিশ্লিষ্ট করে নিলেন সংবেদন, উপলব্ধি, অনুষঙ্গ প্রভৃতি থেকে। অতঃপর 'ইন্‌ট্যুশন'কে চিহ্নিত করলেন, বাস্তবের প্রতীতির (বা উপলব্ধির) এবং সম্ভাব্যের প্রতিরূপের অবিচ্ছিন্ন ঐক্য-সম্পর্কে গঠিত এবং স্থান-কাল নিরপেক্ষ তথাকথিত বাস্তব ও অবাস্তবের দ্বন্দ্বোত্তীর্ণ প্রকাশধর্মী জ্ঞান বলে'।* প্রকাশ ছাড়া এই স্বজ্ঞা বা ইন্‌ট্যুশনের কোন অস্তিত্ব নেই। মনের মধ্যে খণ্ড খণ্ড বিশৃঙ্খল 'ইমেজ' রূপে নয়, অখণ্ড মূর্তিতে যে ইন্‌ট্যুশনের আবির্ভাব (খণ্ড খণ্ড 'ইমেজ'-এর একীকরণ 'অসত্য ইন্‌ট্যুশন') তারই প্রকাশ শিল্পে-সাহিত্যে। যে 'ইন্‌ট্যুশন' প্রকাশ পায়নি, তার কোন অস্তিত্বই নেই, এই ধারণা থেকে ক্রোচে ঘোষণা করলেন, প্রকাশ আছে স্বজ্ঞা নেই বা স্বজ্ঞা আছে প্রকাশ নেই তা হতেই পারেনা।* 'স্বজ্ঞা'র অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় প্রকাশে। অর্থাৎ ক্রোচে 'ইন্‌ট্যুশন' ও 'এক্স-প্রেশন'কে সমীকৃত করলেন। ইতালীয় সমালোচক গিয়োভানি পাপিনি লক্ষ্য করেছিলেন, ক্রোচের কাছে 'ইন্‌ট্যুশন'ই শুধু 'এক্সপ্রেশনের' সমার্থক নয়; 'আর্ট', 'ইন্‌ট্যুশন', 'ইমাজিনেশন', 'এক্সপ্রেশন', 'ফ্যান্সি', 'বিউটি' সবই অভিন্ন

তাৎপর্যবহ। ক্রোচের কাছে স্বজ্ঞা ছাড়া প্রকাশ নেই এবং প্রকাশ ছাড়া স্বজ্ঞা নেই তা-ই স্বজ্ঞা ও প্রকাশ অভিন্ন। আবার যার প্রকাশ সফল বা সার্থক তা-ই সুন্দর (অসুন্দর হচ্ছে অসার্থক প্রকাশ) এবং প্রকাশ মানে 'ইন্‌ট্যুশনে'র প্রকাশ, যে-ইন্‌ট্যুশনের সঙ্গে 'কল্পনা'র কোন পার্থক্য নেই। সুতরাং ইন্‌ট্যুশন, 'সুন্দর' ও 'কল্পনা' অভিন্নার্থক। যদিও পাপিনি বলেছেন, ক্রোচের কাছে 'ফ্যান্সি' ও 'ইমাজিনেশন' সমার্থক কিন্তু 'এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা'র চতুর্দশ সংস্করণের 'ইস্থেটিক্‌স্‌' প্রবন্ধে ক্রোচ শিল্পকে যেমন দর্শন, ইতিহাস ও প্রকৃতি-বিজ্ঞান থেকে পৃথক করে নিয়েছেন, তেমনি বলেছেন 'Art is not the play of fancy, because the play of fancy passes from image to image in search of variety…'। ক্রোচে এখানে কবিকল্পনা বা সৃজনধর্মী কল্পনার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন, 'ফ্যান্সি'র উপর নয়। 'ফ্যান্সি'র গতি, তাঁর মতে, 'ইমেজ' থেকে 'ইমেজে' বৈচিত্র্য সন্ধানের পথে এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে যেখানে সাদৃশ্য সেই দিকে। কিন্তু বিশৃঙ্খল আবেগকে একটি নির্দিষ্ট সংহত-রূপে পরিণত করে যে-শক্তি তা-ই ইচ্ছে সৃজনধর্মী কল্পনা বা কবি-কল্পনা। মোট কথা, ক্রোচে স্বীকার করলেন 'কল্পনা'কে, বিশৃঙ্খল অনিয়ন্ত্রিত অতিরেক দোষদুষ্ট 'ফ্যান্সি'কে নয়। উচ্ছৃঙ্খল 'প্যাশনের' তাড়না থেকে যে-রোমান্টিকের জন্ম এবং প্যাশন-হীন বিশুদ্ধ বোধ বা জ্ঞান থেকে যে-ক্লাসিকের জন্ম তাঁদের উভয়ের প্রতিভাকেই ক্রোচে বলেছেন নিম্নস্তরের। ক্রোচে কামনা করেছেন একই সঙ্গে প্রশান্তি ও বিক্ষোভ, 'প্যাশন' ও সেই মন যা তাকে নিয়ন্ত্রিত করে (১৯৩৩-এ Oxford-এ প্রদত্ত বক্তৃতায়)। কোন অনুভূতির অসংস্কৃত প্রকাশ-মাত্রই ক্রোচের কাছে শিল্পের মর্যাদা লাভ করেনি। ১৮৭৭-এর একটি প্রবন্ধে ক্রোচে লিখেছিলেন, অনুভব করাই যথেষ্ট নয়; অনুভূতির স্বতন্ত্র কোন মূল্য নেই যদি না বুদ্ধির দ্বারা শাসিত লেখনী সেই অনুভূতিকে রূপায়িত করতে সক্ষম হয়। কবিতার জগতে অনুভূতিকে অতিরিক্ত প্রশ্রয়দানের প্রচেষ্টা ক্রোচে ভালো চোখে দেখেন নি এবং ভালো মনে করেন নি শুধুই ভাবুক বা যথেচ্ছাচারী ব্যক্তি হিসেবে লেখককে। ব্যক্তিজীবনের দুঃখ-সুখের দ্বারা আন্দোলিত হয়ে নিছক একটি আবেগ বা অনুভূতিকে জনসমক্ষে 'ফাঁস' করে দেওয়াই কবির পক্ষে যথেষ্ট নয়। উচ্ছ্বসিত আবেগ-কে নয়, 'Contemplation of feeling'কে ক্রোচে অভিহিত করলেন 'বিশুদ্ধ স্বজ্ঞা' নামে ('pure intuition') এবং

বললেন এই 'বিশুদ্ধ স্বজ্ঞা'ই কাব্য। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'প্রকাশই কবিত্ব' আর ক্রোচে বলছেন 'বিশুদ্ধ স্বজ্ঞাই কাব্য'। এই দুই মতে কোন পার্থক্য নেই। কারণ ক্রোচের কাছে 'স্বজ্ঞা' ও 'প্রকাশ' অভিন্ন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে অর্থে 'প্রকাশ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন ক্রোচের 'expression' শব্দটির ব্যবহার সে অর্থে নয়। বাইরে যা রূপ নিয়েছে রবীন্দ্রনাথ তাকেই বলেছেন 'প্রকাশ' আর 'ক্রোচে' মনে করতেন মনে যা 'একদৃষ্টি-প্রসূত অখণ্ড-উদ্ভাস' তা-ই 'প্রকাশ'। বাইরে তার প্রকাশ হোক বা না-হোক। ১৮৭৭-এর প্রবন্ধে ক্রোচে যদিও লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশের কথা বলেছিলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে বাইরে রূপ না নিলেও কোন কিছুর গভীর ধ্যান বা মননই যে প্রকাশের নামান্তর সে কথাই বলেছেন নানাভাবে। 'Aesthetic' গ্রন্থে (দ্বিতীয় অধ্যায়, দশম অধ্যায়) 'অনুভূতি' শব্দটিকে ক্রোচে মোটামুটি যে তিনটি অর্থে ব্যবহার করেছেন তার মধ্যে একটি হচ্ছে 'বিশুদ্ধ স্বজ্ঞা'। এই অর্থেই কাব্যের সঙ্গে 'ইন্‌ট্যুশনে'র সম্পর্ক। 'বিশুদ্ধ স্বজ্ঞা' হচ্ছে আবার অনুভূতির গভীর চিন্তন বা ধ্যান। অতীতের যে চিন্তা-ইচ্ছা-ক্রিয়া সমেত সমগ্র মন, যা বর্তমানের চিন্তা, ইচ্ছা, যন্ত্রণা বা উল্লাস রূপে অন্তরের গোপনে বিরাজ করে, তাকে অন্ধকার থেকে উদ্ধার করে আপন জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করে কবিতা। সুতরাং শূন্য মস্তিষ্ক থেকে শিল্পের জন্ম হয় না। অনুভূতির জগৎ বা ধ্যানলোকের গভীর থেকে জন্ম নেয় কাব্য। একেই ক্রোচে বলেছেন 'গীতিকাব্যিক স্বজ্ঞা' বা lyrical intuition। ক্রোচের কাছে গীতিকাব্য এমন একটি শিল্পরূপ যেখানে 'অহং' নিজেকে দেখে, বিবৃত করে এবং নাট্যায়িত করে। সুতরাং গীতিকবিতা ব্যক্তিগত দুঃখ বা উল্লাসের অভিব্যক্তি মাত্র নয়। তিনি গীতিকবিতার সঙ্গে নাটক ও মহাকাব্যের পার্থক্য লক্ষ্য করেছেন শুধুমাত্র দৈর্ঘ্যে এবং বাহ্যরূপে। গীতিকবিতার উপর এই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ প্রমাণ করছে ক্রোচে বিশেষের মধ্যে বিশ্বরূপ দর্শন করেছিলেন এবং কাব্য বা সাহিত্যের মধ্যে শ্রেণী বিভাজনের দীর্ঘকালীন প্রয়াসকে অস্বীকার করেছিলেন। পোলোনিয়াসের মুখ দিয়ে শেক্‌স্‌পীয়র কয়েক শতাব্দী পূর্বে সাহিত্যের অন্তহীন শ্রেণী-বিভাজন প্রচেষ্টার প্রতি যে বিদ্রূপ বর্ষণ করেছিলেন তাকেই ভাববাদী দার্শনিকের ভিত্তিভূমি থেকে নতুন অর্থতাৎপর্যময় করে প্রকাশ করলেন ক্রোচে। অ্যারিস্টটলের কাল থেকে সাহিত্যে যে সমস্ত শ্রেণী ক্রমশঃ প্রতিষ্ঠালাভ করছিল ক্রোচে প্রকৃতপক্ষে তাদের অস্বীকার করলেন।

শিল্প-সাহিত্যকে যদি 'স্বজ্ঞা'র প্রকাশ বলে একটি সাধারণ সূত্রের অধীনস্থ করা যায় এবং বহু সমস্যার কারণ 'ফর্ম' ও 'কণ্টেণ্ট'-এর সুচিরকালীন দ্বন্দ্বের অবসান ঘটানো সম্ভব হয় তাহলে ক্রোচকে অনুসরণ করে শিল্পের সত্তার একটি সঠিক পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। শিল্প যেহেতু 'স্বজ্ঞা' এবং 'স্বজ্ঞা' মানেই 'প্রকাশ' তাহলে অখণ্ড অবিভাজ্য শিল্পমূর্তি থেকে আবার 'ফর্ম' ও 'কণ্টেণ্ট'-এর পৃথক স্বরূপ অন্বেষণ কেন? ক্রোচে বিষয় ও রূপের অবিচ্ছিন্নতার একজন প্রথম শ্রেণীর সমর্থক। শিল্পের বাহ্যরূপ নিয়ে বিব্রত হতে চান নি একটুও। গীতিকবিতা, ট্রাজেডি, কমেডি, উপন্যাস, মহাকাব্য···ইত্যাদি যত ভাগ আছে তা ক্রোচের মতে, একান্তই বাহ্যরূপের প্রভেদ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু মূল কথা হল মনেই জন্ম নিচ্ছে ভাব তথা শিল্প, অতএব বাইরে কীরূপে তার প্রকাশ ঘটছে তা অবান্তর। সেই কারণে 'টেকনিক' বা কলাকৌশল শিল্পের অপরিহার্য উপাদানের মর্যাদা পায় না তাঁর কাছে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ক্রোচের পার্থক্য এখানে স্মরণ করা যেতে পারে। ক্রোচে যে 'টেকনিক'কে অস্বীকার করলেন, বললেন টেকনিকের সঙ্গে শিল্প-সাহিত্যের কোন অন্তরঙ্গ সম্পর্ক নেই, সেই 'টেকনিক'কে রবীন্দ্রনাথ বললেন, সাহিত্যজগতের মহামূল্যবান জিনিস; বললেন, শুধু প্রকাশ-কৌশলের গুণে সমাদৃত হয়েছে এমন সাহিত্যের নিদর্শন দুর্লভ নয়। শিল্পের ক্ষেত্রে কলাকৌশলের মূল্য স্বীকার ক'রে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ভাবের কথা 'যে মূর্তিকে আশ্রয় করে তাহা হইতে আর বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না'।* অর্থাৎ মূলের আস্বাদ অনুবাদে পাওয়া সম্ভব নয়। অবশ্য ক্রোচে কলাকৌশলকে অস্বীকার করা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ কথাই বলেছেন,—মনের ভিতর স্বজ্ঞা যে-মূর্তি পরিগ্রহ করল যেহেতু তা শিল্পীর একান্ত নিজস্ব সম্পদ সুতরাং সৃষ্টির কোন রূপান্তর সম্ভব নয়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে শিল্পীর 'স্বজ্ঞা'র প্রকাশ (যে 'প্রকাশ' বাহ্য নয়) যে-শিল্প বস্তুজগতের সঙ্গে তার সম্পর্ক কি? যেহেতু ক্রোচের 'শিল্পী'কে বস্তুর বাহ্যরূপ-নির্মাণের কোন দায়িত্ব স্বীকার করতে হয় না, লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে শিল্পের তাৎক্ষণিক কোন সম্পর্কও নেই সুতরাং এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য যে বাস্তব জগতের সঙ্গে শিল্প বা শিল্পীর সম্পর্ক আছে বলে ক্রোচে মনে করতেন না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, ক্রোচে শিল্পীকে মনে করতেন 'যথার্থ বাস্তবে'র চিত্রকর। সাধারণতঃ বাস্তব বলতে আমরা যা বুঝি তার উপর লেগে থাকে নানা আবর্জনার

স্পর্শ যার ফলে 'যথার্থ বাস্তব' আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়। তাঁর অন্যতম সমকালীন দার্শনিক বের্গসঁ-র মত ক্রোচে বললেন 'Physical facts do not possess reality'৭ এবং যেহেতু চোখে-দেখা বস্তুই প্রকৃত বাস্তব নয় অতএব সাহিত্যের কোন কিছু করণীয় নেই এই বাস্তবকে নিয়ে। ক্রোচের মতে জাগতিক তথাকথিত সত্যের উপরে আবিলতার স্পর্শ-মুক্ত যে 'Supremely real'-এর অবস্থান শিল্পে ঘটে তারই অভিব্যক্তি। কিন্তু তথাকথিত বাস্তবের অতীত যে-বাস্তবের প্রকাশ করেন শিল্পী তার ফলে শিল্প কি সম্পূর্ণ একটি জগৎ-বিচ্ছিন্ন ব্যাপারে পরিণত হয়? এর উত্তরে ক্রোচের বক্তব্য হচ্ছে, মানবজীবন-সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন শিল্প-সাহিত্য 'unproductive' এবং সেই কারণে কলাকৈবল্য কথাটিও নিরর্থক। তবে তাই বলে তিনি মনে করতেন না, শিল্পী হবেন একজন বিরাট চিন্তানায়ক বা সমাজ-সমালোচক। কিন্তু তা না হলেও এই জগতের চিন্তা এবং কাজে তাঁর অংশ থাকবে। তাঁর নিজের জীবনের তথাকথিত পবিত্রতা যদি নষ্টও হয়, পাপী হন তিনি, তাহ'লেও সাধারণ পাপ-পুণ্য সম্পর্কে তাঁর একটা বোধ থাকা প্রয়োজন। লেখকদের জীবনের সঙ্গে তাঁদের সাহিত্যকে মেলাতে গিয়ে যে সমস্ত গল্প-কাহিনীর জন্ম হয়েছে সেদিকে লক্ষ্য রেখে ক্রোচে বললেন, এই গল্পকারেরা জানেন না, যিনি মহত্তের ছবি আঁকেন তিনি না-ও মহান হতে পারেন অথবা যে-নাট্যকার ছুরিকাঘাতের বর্ণনা দেন তিনি জীবনে কারুকে ছুরিকাঘাত না-ও করতে পারেন। ক্রোচের মূল বক্তব্যটি ধরা পড়ল রবীন্দ্রনাথের কথায় 'কবিরে পাবে না তাহার জীবন চরিতে'। আসলে ক্রোচে শিল্পের জগতে শিল্পীর চৈতন্যের উদ্ভাসে বিশ্বাস করতেন ও প্রাত্যহিক সংসারের ঊর্ধ্বে পৃথক একটি মানসিক ভিত্তিভূমিতে শিল্পের জন্ম ব'লে মনে করতেন ব'লে তিনি প্রাত্যহিক সংসারের 'বাস্তব' ও লেখকদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে গড়ে ওঠা বিচিত্র গল্প-কাহিনীর প্রতি কোন শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে পারেন নি।

ক্রোচের 'শিল্পী' প্রাত্যহিক সংসারের রূপকার নন, যদিও তিনি মানবজীবনের বিচিত্র সমস্যা সম্পর্কে যে অজ্ঞ তাও নয়। তিনি আবিলতামুক্ত 'Supremely real'-এর রূপদক্ষ, সে রূপ বাহ্য নয়। প্রশ্ন হচ্ছে ত'হলে লেখকের ব্যক্তিক অনুভূতি বা আবেগ কি ক'রে হবে সর্বজনবোধ্য? তাঁর 'Aesthetic' প্রবন্ধে রসিক বোদ্ধা সম্পর্কে ক্রোচে বলেছেন, 'যিনি কবিতা বোঝেন তিনি সরাসরি লেখকের হৃদয়ের প্রবেশ ক'রে নিজের অন্তরে লেখকের হৃদস্পন্দন অনুভব করেন।

যেখানে এই স্পন্দন নেই, সেখানে তিনি কবিতাকেও উপলব্ধি করেন না।' সুতরাং ক্রোচের মতে যথার্থ পাঠক বা রসিক আপন অন্তরে কাব্যপাঠজাত স্পন্দন অনুভব করেন। কিন্তু যিনি মনে করেন শিল্পের জন্ম শিল্পীর চেতনায় বা তার একান্ত ব্যক্তিগত উপলব্ধিতে, বাহ্যরূপের কোন গুরুত্বই নেই, তিনি বিশ্লেষণ করে দেখালেন না কিভাবে পাঠক তাঁর হৃদয়ে কাব্যপাঠহেতু স্পন্দন অনুভব করেন। লেখকের ব্যক্তিক অনুভূতি কিভাবে নৈর্ব্যক্তিক ও সার্বভৌম হবে ক্রোচের রচনায় তার কোন ব্যাখ্যাই পাওয়া গেল না। এখানেই ক্রোচের 'অভিব্যক্তিতত্ত্বে'র (Theory of expression) প্রধান সীমা। এই সীমা অতিক্রম করতে পেরে-ছিলেন ভারতীয় আলংকারিকেরা। ভট্টনায়ক ও অভিনব গুপ্ত রসের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেখানে ক্রোচের সঙ্গে তাঁদের মতের মৌলিক পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অভিনব গুপ্ত-ও ছিলেন ভরতের রসসূত্র ব্যাখ্যায় অভিব্যক্তিবাদী। তিনি রসসৃষ্টির ব্যাপারে বর্জন করেছিলেন 'উৎপত্তি' ও 'অনুমান' তত্ত্ব দুটিকে। ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত তাঁর একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধে[৮] অভিনব গুপ্তের সঙ্গে ক্রোচের তুলনামূলক আলোচনা করে জানিয়েছেন—(ক) 'উভয় মতবাদেই, কাব্যশাস্ত্র ইতিহাসাদি হইতে পৃথক এবং ইহা অন্যফলনিরপেক্ষ'। (খ) 'অভিনব বলিয়াছেন, চৈতন্য যে সকল অবান্তর বস্তুতে আচ্ছন্ন থাকে, কবি প্রতিভা তাহাদিগকে অপসারিত করিয়া চৈতন্যকে স্ব স্ব রূপে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করে। এই জন্যই রসোপলব্ধি ব্রহ্মাস্বাদসহোদর। ক্রোচে বলিয়াছেন, বুদ্ধি—যাহা শাস্ত্রাদি রচনা করে এবং কর্ম-প্রবৃত্তি—যাহা ব্যবহারিক জগতে ক্রিয়াশীল—ইহারা চৈতন্যকে অধিকার করিবার পূর্বে চৈতন্য যে বিশুদ্ধ রূপ সৃষ্টি করে বা দর্শন করে তাহাই অভিব্যক্তি বা আর্ট'। (গ) ভারতীয় ধ্বনিবাদীরা দুটি ধ্বনির ভিতর কোনরকম গুণগত পার্থক্য নির্দেশ করতে পারেন নি এবং ক্রোচেও একটি ইনট্যুশনের সঙ্গে অন্য ইনট্যুশনের গুণগত বৈষম্য নির্ণয় করতে পারেন নি। (ঘ) 'ধ্বনিবাদীদের কাব্যবিচার গণনায় পর্যবসিত হইয়াছে আর ক্রোচে শুধু আয়তন নির্ধারণ ও পরিমাপ করিয়াছেন। উভয়ত্র এই জাতীয় বিশ্লেষণকে পণ্ডিতের পণ্ডশ্রম বলিয়া মনে হয়।' ডঃ সেনগুপ্ত তাঁর প্রবন্ধে ক্রোচের সঙ্গে ধ্বনিবাদীদের তুলনামূলক বিচার প্রসঙ্গে এঁদের ভিতরকার সাদৃশ্য যেমন সন্ধান করেছেন তেমনি এঁদের বৈষম্য এবং কোন কোন প্রসঙ্গে একের চেয়ে অপরের উৎকর্ষের সূত্রের উপরেও আলোকপাত করেছেন। তাঁর মতে (ক) ভারতীয়দের কাছে ব্যঞ্জনার ভিত্তি

অভিধা এবং ক্রোচের কাছে অভিধার ভিত্তি ব্যঞ্জনা। (খ) ভারতীয় আলংকারিকেরা যেখানে রতি প্রভৃতি স্থায়িভাবগুলি অস্পষ্ট অনুভূতি না 'বুদ্ধিবৃত্তি-সঞ্জাত আইডিয়া' তা স্পষ্ট করতে পারেন নি সেখানে ক্রোচে প্রতীতি বা বিচার বুদ্ধির মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য নির্ণয় করে প্রতীতির মধ্যে বিচারবুদ্ধির তর্ক ও সিদ্ধান্ত কেমন করে মিশে যায় তা দেখাতে চেষ্টা করেছেন। (গ) আবার রসের প্রসঙ্গে ভারতীয় আলংকারিকেরা (ভট্টনায়ক এবং অভিনব গুপ্ত) সাধারণীকৃতির যে রহস্য ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়েছেন সেখানে ক্রোচে চূড়ান্ত সীমাশাসিত।

ক্রোচের তত্ত্বকে যাঁরা সমর্থন জানালেন তাঁরা হচ্ছেন দুই অক্সফোর্ড দার্শনিক—ই. এফ. কেরিট এবং আর. জি. কলিংউড। কেরিট তাঁর 'The Theory of Beauty' গ্রন্থে সৌন্দর্য দর্শনের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনার পর সৌন্দর্যের সংজ্ঞা নিজে দিয়েছেন এইভাবে—সৌন্দর্য হচ্ছে আবেগের অভিব্যক্তি। ক্রোচের মত তিনিও সৌন্দর্যকে প্রয়োজন ও মঙ্গল থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিলেন। বলেছিলেন, সৌন্দর্যের উপলব্ধি নিতান্তই মানসিক ও ব্যক্তিক। অবশ্য তাঁর 'An Introduction to Aesthetics' গ্রন্থে কেরিট ক্রোচের প্রভাব অতিক্রম করে অভিজ্ঞতার ('Intuition' নয়, 'Experience') গুরুত্ব মেনে নেন। তিনি বললেন, লেখক কতকগুলি ইন্দ্রিয়বেদ্য প্রতিরূপের দ্বারা যে শিল্পমূর্তি গড়ে তোলেন পাঠকের সহানুভূতি পাঠককে তা উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। ক্রোচে তাঁর নন্দনতত্ত্ব-সম্পর্কিত আলোচনা থেকে 'সহানুভূতি' কথাটি বাদ দিয়েছিলেন। কেরিট ছাড়া ক্রোচের সমর্থক হিসেবে পরিচিত হচ্ছেন কলিংউড। তাঁর 'Outlines of Philosophy of Art' গ্রন্থে কলিংউড শিল্পকে 'কল্পনা', 'বিশুদ্ধ কল্পনা' বলে উল্লেখ করে বলেছেন, এই 'কল্পনা' হচ্ছে এমন একটি ক্রিয়া যা নৈয়ায়িক জ্ঞানের ক্রিয়ার (Logical knowledge) থেকে পৃথক এবং শিল্প শিল্পীর মস্তিষ্ক-সঞ্জাত ও কল্পনার ফসল (Something existing solely in the artist's head, a creature of his imagination)। ক্রোচের অভিব্যক্তি-তত্ত্বের প্রধান সমর্থক ছিলেন যেমন কেরিট ও কলিংউড তেমনি ক্রোচের মতের প্রধান সমালোচক ও বিরোধী ছিলেন জার্মান তাত্ত্বিক ডেসোয়ের এবং বোল্‌কেল্‌ট্। ডেসোয়ের লিখেছেন, ক্রোচের গৌণ রচনাগুলি থেকে তাঁর মনে ক্রোচে সম্পর্কে শ্রদ্ধা জাগলেও তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছেন, তাঁর (ক্রোচের) মধ্যে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সুসংবদ্ধ

চিন্তাশক্তির ছিল একান্তই অভাব।[৯] আর বোল্‌কেল্‌ট্‌ বলেছেন, সূক্ষ্ম সমস্যাগুলি সম্পর্কে ক্রোচের অন্ধতা ছিল উল্লেখযোগ্য। অযথার্থ, দ্ব্যর্থক ও অবিশ্লেষিত ধারণাগুলিই ছিল তাঁর প্রধান সম্বল।[১০] ভেসোয়ের এবং বোল্‌কেল্‌টের কথা বাদ দিলে ক্রোচের অন্যতম সমালোচক হিসেবে এখানে আইরিশ ঔপন্যাসিক জয়েস কেরি-র (১৮৮৮-১৯৫৭) নাম উল্লেখ করা যেতে পারে যিনি তাঁর (মৃত্যুর পরে প্রকাশিত) 'Art and Reality' (১৯৫৮) গ্রন্থে ক্রোচের নন্দনতত্ত্বে স্বজ্ঞা ও প্রকাশের মধ্যে কোনরকম অবকাশের যে বিরোধিতা করা হয়েছে তার সমালোচনা করে বলেছেন, ক্রোচের মত অনুসরণ করলে দেহ ও আত্মার ভেদ অস্বীকার করতে হয়। কিন্তু মানবজীবনে যদি দেহ ও আত্মার কোন ভেদ না থাকত তাহলে প্রবৃত্তিতাড়িত ইতর প্রাণীর সঙ্গে মানুষের কোন পার্থক্যই থাকত না। মানুষের স্বাধীনতাই জীবজগতে তার স্বাতন্ত্র্য প্রমাণ করে। দেহ ও আত্মার এই বিচ্ছেদ ততটুকুই প্রয়োজনীয় যতটুকু বিচ্ছেদ না থাকলে স্বাধীনভাবে বিচরণের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে মানুষ। সেইরকম স্বজ্ঞা ও প্রকাশের মধ্যে কিছু না কিছু অবকাশের অবশ্যই প্রয়োজন। ক্রোচের অভিব্যক্তিতত্ত্বের যে ত্রুটির দিকে কেরি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তার সত্যতা সংশয়াতীত। অন্তরে প্রতীতির আবির্ভাব মানেই শিল্পের জন্ম, ক্রোচের এই মতের পিছনে যুক্তি ও প্রমাণের যথেষ্ট অভাব। 'ইন্‌টুইশন' ও বাহ্যরূপ নির্মাণ ক্রিয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই একথা বললে শিল্পীর শিল্পকর্মে প্রয়োজনীয় কতকগুলি বিশিষ্ট উপাদানকে অস্বীকার করা হয়। ভয় ও ক্রোধের অনিয়ন্ত্রিত ও তাৎক্ষণিক প্রকাশ সুন্দর নয়, শৈল্পিকও নয়। শিল্পীরা যে তাঁদের একই রচনার উপর তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত মার্জনার কাজ চালিয়েছেন তার প্রমাণ আছে প্রচুর। টল্‌স্টয় তাঁর ডায়েরি-তে লিখেছেন, দীর্ঘক্ষণ বসে থেকেও তিনি তাঁর ভাব প্রকাশের সঠিক শব্দ খুঁজে পান নি অনেক সময় এবং আমরা জানি ফ্লোব্যারও তাঁর 'মাদাম বোভারি' লেখার সময় সারারাত ধ'রে ভেবেছেন শব্দ নিয়ে, প্রকাশের উপায় নিয়ে। আর রবীন্দ্রনাথের কবিতার পাণ্ডুলিপি প্রমাণ করে তিনি কতভাবে বদল করেছেন তাঁর শব্দ। বস্তুতঃ মনের সঠিক ভাব অপরের কাছে প্রকাশ করে যদি তাঁর হৃদয়ে স্পন্দন জাগাতে হয় সে কি সম্ভব উপলব্ধি ও প্রকাশের মধ্যে কোন অবকাশ না রেখেই? হয়ত 'কম্যুনিকেশন' নিয়ে ক্রোচে বিব্রত হওয়াকে আর্ট অপেক্ষা 'টেকনিকে'র কাজ বলে মনে করতেন (এবং Technique is not an intrinsic

element of art'........'Technical treatises are not asethetic treatises, not yet parts or chapters of them') বলেই স্রষ্টা ও প্রকাশের মধ্যে কোনরকম অবকাশ তিনি সহ্য করতে পারেন নি। কিন্তু যদি সাহিত্যের ক্ষেত্রে পাঠককে মানতে হয়, স্বীকার করতে হয় কাব্যের অপর প্রান্তে তাঁর অস্তিত্ব তাহ'লে অন্তরের গভীর উপলব্ধিকে যেমন-তেমন করে প্রকাশ করলেই চ'লে না। রূপের বাহারে শিল্পোৎকর্ষের প্রমাণ না মিললেও শিল্পে রূপের কোন প্রয়োজন নেই, কলাকৌশলের কোনই ভূমিকা নেই সাহিত্যের রাজত্বে, সে কথা ঠিক নয়। ক্রোচে সুন্দরের কথা বলতে গিয়ে তাকেই 'সুন্দর' বলেছেন যার প্রকাশ 'Perfect'। কিন্তু প্রশ্ন করা যায় কখন কোন্ প্রকাশ কিভাবে 'Perfect' হয়ে ওঠে? তার উত্তর কিন্তু ক্রোচের কাছ থেকে মেলে না। হয়তো এই কারণেই বোল্‌বেল্ট বলেছিলেন, 'He works invariably with inexact, ambiguous and unanalysed concepts'। মোট কথা নিজে শিল্পী না হওয়ার জন্যই বোধ হয় ক্রোচের কাছে শিল্পের মূল রহস্যগুলি অজ্ঞাত রয়ে গিয়েছিল। 'Beauty', 'Communication' প্রভৃতি শব্দগুলি তাঁর কাছে যথোচিত মর্যাদা পায় নি। মর্যাদা পায় নি জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের অনিবার্য সম্পর্কের সত্যতা এবং বিষয়ের গৌরব ও রূপের সৌকুমার্য। কিন্তু এ কথা তো মিথ্যা নয় যে, যতদিন প্রকৃতির রাজত্বে অসুন্দর ও বিশৃঙ্খলা থাকবে ততদিন বিষয় নির্বাচন ও রূপায়ণ সম্পর্কে শিল্পীকে সচেতন থাকতে হবে। মনের বাইরে বাস্তব জগতের কোন অস্তিত্ব নেই, ক্রোচের এই ধরনের ভাববাদী মন্তব্যে শিল্পের জগতের বহু সমস্যার সমাধান অনায়াসে সম্ভব হয়ে যায় বটে, কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যজগৎকে বর্জন করে এবং রূপ-নির্মাণের দায়িত্ব অস্বীকার করে শিল্পীর পক্ষে কতটুকু অগ্রসর হওয়া সম্ভব? ক্রোচের কিছু পূর্বে ফরাসী নন্দনতাত্ত্বিক ইউজেন ভেরোঁ (১৮২৫-১৮৮৯) শিল্পের সঠিক সংজ্ঞাই দিয়েছিলেন—শিল্প হচ্ছে বাহ্যরূপের মাধ্যমে আবেগের প্রকাশ। এই আবেগ গতিকে করে তোলে নৃত্য, সুরে আনে সঙ্গীতের রূপ এবং শব্দকে পরিণত করে কাব্যোক্তিতে। অর্থাৎ শিল্পীর উপাদানই শুধু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, শিল্পের রূপও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। আবার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ নির্মাণের ক্ষেত্রে এক শিল্পীর সঙ্গে অন্য শিল্পীর যে পার্থক্য ঘটে সেক্ষেত্রে প্রত্যেক শিল্পীর ভাব ও ভাবনাগত স্বাতন্ত্র্য অবশ্যই এক গুরুত্বপূর্ণ সত্য; ভেরোঁ সেকথাও স্বীকার করেছিলেন, যা ক্রোচের নন্দনতত্ত্বে কোনই মর্যাদা

পায় নি। সমস্ত শিল্পকর্মকে বিশুদ্ধ একটি মানসিক ব্যাপারমাত্র বলে গণ্য করে ক্রোচে আরও একটি সমস্যা সৃষ্টি করেছিলেন। তা হচ্ছে 'সমালোচনা' প্রসঙ্গে। যদি শিল্পকর্ম হয় শুধুই একটি মানসিক ব্যাপার তাহলে সমালোচক কি ক'রে এক শিল্পীর সঙ্গে অন্য শিল্পীর পার্থক্য নির্ণয় করবেন? তুলনা করবেন এক শিল্পের সঙ্গে অন্য শিল্পের? ক্রোচে পাঠক বা রসিককে অস্বীকার করেন না অথচ যে-শিল্পের বাহ্যরূপের কোন মর্যাদা নেই, শিল্পীর প্রতীতিই সবকিছু, পাঠক কি করে সেই শিল্পের দ্বারা প্রাণিত হবেন তার কোন নির্দেশ দেন নি তিনি। শিল্পের বাহ্যরূপ নাকি সমালোচকের অনুভূতি উদ্দীপিত করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই উদ্দীপিত সমালোচক তখনই দান্তে বা রবীন্দ্রনাথকে বিচার করতে সক্ষম হবেন যখন তিনি নিজেকে দান্তে বা রবীন্দ্রনাথের স্তরে উন্নীত করতে সক্ষম। নিঃসন্দেহে এক দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু তা-ই ছিল ক্রোচের কাম্য। আসলে একজন absolute idealist হিসেবে ক্রোচে তাঁর অভিব্যক্তি তত্ত্বকে (বিশ শতকের বস্তুবিজ্ঞানের আধিপত্যকালেও) পরিণতি দিয়েছিলেন এক রহস্যময় নন্দনতাত্ত্বিক সমস্যা সঙ্কুলতায়।

৬ ॥ সঞ্চার

শিল্পীর অভিজ্ঞতাই হোক আর 'স্বজ্ঞা'ই হোক যা শিল্পরূপ লাভ করেছে যদিও তার উৎপত্তিস্থল কবিমন তবু এমন শিল্প-সাহিত্যের অস্তিত্ব অকল্পনীয় যার কোন রসিক নেই এবং এমন শিল্পীকেও ভাবা যায় না যিনি সমকালের হোক বা আগামীকালের হোক কোন-না কোন রসজ্ঞের বা আস্বাদকের উপস্থিতি কামনা না করেন। অন্তরের ভাবকে বাইরে প্রকাশ করেই শিল্পী চূড়ান্ত সিদ্ধিলাভের স্বস্তি বোধ করলেন, এমন একটা সুবিধেজনক পরিস্থিতি কল্পনা করা সম্ভব নয়। বস্তুত একের অভিজ্ঞতা, অনুভূতি বা শিক্ষা অপরের নিকট নিবেদিত হয়, অপরের অন্তরে সঞ্চারিত হয় এবং তারই ফলে মানুষ জ্ঞান বা আনন্দ লাভ করে থাকে। সাধারণত এই সঞ্চারকর্মের গুরুত্ব সাহিত্যে বা শিল্পেই সর্বাধিক অনুভূত হয়। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ কবি সম্পর্কে বলেছিলেন 'He is a man speaking to men' এবং ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-প্রভাবিত টমাস ডিকোয়েন্সি সাহিত্য ও সাহিত্যের সৃষ্টি সম্পর্কে বললেন 'All that is literature seeks to

communicate power; all that is not literature to communicate knowledge'। মোটকথা দু'জনেই যে সত্য স্বীকার করলেন তা হচ্ছে, সাহিত্য বা কোন জ্ঞেয় বস্তুই একক ব্যক্তির স্বগতোক্তি নয়। স্রষ্টা এবং সৃষ্টি ছাড়াও আছেন সমঝদার বা জ্ঞাতা। সুতরাং 'পস্টারিটি' সম্পর্কে উদাসীন হলেও অন্যপক্ষ (পাঠক) সম্পর্কে সম্পূর্ণ অমনোযোগী জ্ঞানদাতা বা আনন্দদাতার কথা ভাবা সম্ভব নয়। তবে সাধারণ জ্ঞেয় বস্তু যেমন অপরের নিকট সুষ্ঠু প্রকাশের দ্বারা তুষ্টিলাভ করা সম্ভব, শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রে কিন্তু তা নয়। সাহিত্যকে যেভাবেই ভাগ করি না কেন (যেমন Literature of knowledge বা জ্ঞানের সাহিত্য এবং Literature of power বা ভাবের সাহিত্য) শুধুমাত্র রূপলাভ করাই সাহিত্যের পক্ষে যথেষ্ট নয়, যদিও ক্রোচে তা-ই বিবেচনা করতেন (সে রূপও আবার ইহগ্রাহ্য নয়) এবং সেইকারণেই কলানিপুণ শিল্পীদের 'impotent artists' বলতে দ্বিধা করেন নি। কিন্তু সাহিত্যকে পাঠকের স্বীকৃতি লাভ করতে হয় এবং সজ্ঞান অথবা অসজ্ঞানভাবে সাহিত্যিককে সেই স্বীকৃতি আদায়ের চেষ্টাও করতে হয়। এই স্বীকৃতিলাভের জন্য শিল্পী-সাহিত্যিককে সৃষ্টির মাধ্যমে নিজেদের অভিজ্ঞতা, অনুভূতি পাঠকের অন্তরের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিতে হয়। যদিও ভাব বা অনুভূতি অপরের মধ্যে সঞ্চারিত করা শিল্পীর উদ্দেশ্য, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তিনি 'সঞ্চার ক্রিয়া'র পূর্ণসাফল্যের জন্য সদামনস্ক। বরঞ্চ সঞ্চারিত করার দিকে সর্বদা সজাগ না থেকেই শিল্পী এই প্রধান কাজটি নিষ্পন্ন করে থাকেন। এবং সেইজন্য তাঁকে আয়াস স্বীকার করতেও হয়।

মানুষের বাস দুইলোকে—(ক) কর্মলোকে এবং (খ) কল্পনালোকে। কর্মলোকের অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য প্রাত্যক্ষিক এবং প্রাত্যহিক। এই অভিজ্ঞতার মধ্যে দুঃখ আছে, আনন্দ আছে, ভয় আছে এবং আছে আরও অনেক কিছু। একের দুঃখ, আনন্দ বা ভীতির অভিজ্ঞতা তার কাছে একান্ত বাস্তব এবং সত্য। তা তার কাছে প্রমাণ করে দেখাতে হয় না। কিন্তু দুঃখ-আনন্দ-ভয়-বেদনার অভিজ্ঞতা যার নিজস্ব নয়, শিল্প-সাহিত্যের মাধ্যমে অনুভূত হয়, তার কাছে এই সত্য কর্মলোকের নয়, ভাবলোকের সত্য। ভাবলোক বা কল্পনালোকের সত্য বলেই শিল্পী-সাহিত্যিক তা এমনভাবে প্রকাশ করবেন যাতে তটস্থ ব্যক্তি হয়েও পাঠক, দর্শক বা শ্রোতা অর্থাৎ এককথায় রসিক তা অনুভব করতে পারেন।

ক্রোচে বলেছিলেন 'The reader who understands poetry goes straight to this poetic heart and feels its beat upon his own'. কিন্তু এ তো পাঠক তরফের কথা, আসল রসিকের লক্ষণের কথা। এক্ষেত্রে লেখকের করণীয় কি ? এ-ব্যাপারে লেখকের কোন কর্তব্য আছে বলে ক্রোচের লেখা থেকে মনে হয় না। কিন্তু পাঠককে ভাবিত করার জন্য যে নিজের অনুভূতি পাঠকের অন্তরের ভিতর সঞ্চারিত করে দেওয়া লেখকের কর্তব্য, এবিষয়ে যিনি সবিস্তারে আলোচনা করলেন তিনি প্রখ্যাত রুশ কথা-কোবিদ্ কাউণ্ট লিও টলস্টয়।

ক্রোচে শিল্প বা সাহিত্যের ক্ষেত্রে স্রষ্টার মনোলোককেই লক্ষ্য করেছেন শুধু, পাঠক সাধারণের প্রতি সাহিত্যিকের কর্তব্য স্বীকার করেন নি। যেন পাঠকের অস্তিত্ব না থাকলেও সমান আগ্রহে লেখক লিখে যেতে পারেন। কিন্তু টলস্টয় সমালোচকদের 'নির্বোধ' বলে তিরস্কার করলেও সমঝদার পাঠকের হৃদয়ে আপনার অভিজ্ঞতা ও অন্তরের অনুভূতি সঞ্চারিত করার দিকে সাহিত্যিকদের মনোযোগী হতে বলেছেন। শুধু মনোযোগী হওয়া নয়, পাঠকের অন্তরের ভিতর ভাবসঞ্চার করার মধ্যেই লেখকের সাফল্যের চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে, এমন সংকেত দিলেন টলস্টয়। সাধারণত বিশেষ পরিস্থিতি বা পরিবেশকে একটি মন যখন এমনভাবে প্রকাশ করে যাতে অপরের মনপ্রভাবিত হয় এবং প্রভাবিত মনে এমন এক অভিজ্ঞতার জন্ম হয় যা প্রথম মনের অভিজ্ঞতার অনুরূপ তখনই সঞ্চার ক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে ধরে নেয়া যেতে পারে। ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে জটিল। এবং তার একটা তর-তমও আছে। অভিজ্ঞতা বা পরিচিতির উপর ধারণা বা অনুভূতি সঞ্চারিত হওয়া নির্ভর করে। অতএব শিল্পের জগতে 'সঞ্চার ক্রিয়া' যদি সার্থক হয় তাহ'লে লেখকের অভিজ্ঞতা এবং পাঠকের অভিজ্ঞতার সাদৃশ্য বা নৈকট্য ঘটেছে স্বীকার করে নিতে হবে। অথবা, এইভাবে বলা যায়, লেখকের নির্বাচিত এমন ভাব বা অভিজ্ঞতাই পাঠকের ভিতর সঞ্চারিত হতে পারে যা পাঠকের ভাব বা অভিজ্ঞতার সদৃশ। টলস্টয়, তাঁর 'What is Art ?' বইখানা লেখার আগে লেখা প্রবন্ধ 'On Art'-এ (১৮৯৪-৯৭) শিল্পের জগতে এই সঞ্চার ক্রিয়ার গুরুত্ব স্বীকার করে বললেন—একটি শিল্পসৃষ্টি তখনই সুসম্পন্ন হয় যখন তা এমন পরিচ্ছন্ন রূপ লাভ করে যাতে অপরের নিকট নিবেদিত হয়ে তাদের মধ্যে এমন অনুভূতির জাগরণ ঘটায়

সৃষ্টির মুহূর্তে শিল্পী নিজে যে অনুভূতির অধিকারী ছিলেন ('A work of art is then finished when it has been brought to such clearness that is communicates itself to others and evokes in them the same feeling that the artist experiences while creating it)[১]। মানুষের মনে এমন অনেক অবর্ণনীয় অনুভূতি গভীর গোপনে থাকে যা সে সহজে প্রকাশ করে না বা করতে পারে না। এবং এই কারণে অপরের হৃদয়ের ভিতর সেগুলি সঞ্চারিত করেও দেয়া যায় না। কিন্তু শিল্পী যিনি সাধারণ মানুষের চেয়ে বেশি অনুভূতিপ্রবণ তিনি সেই সমস্ত অনুভূতিগুলিকেই সীমার মধ্যে এনে দিয়ে চেষ্টা করেন অপরের মধ্যে সেই অনুভূতির জাগরণ ঘটাতে। যেহেতু শিল্পীর একক প্রচেষ্টাতেই তাঁর অভিজ্ঞতা বা অনুভূতি পাঠকের অন্তরের গভীরে সঞ্চারিত হওয়া উচিত তাই সমালোচকের ভূমিকাও অপ্রয়োজনীয়—এই ছিল টলস্টয়ের সিদ্ধান্ত। টলস্টয় 'সঞ্চার ক্রিয়া'র উপর গুরুত্ব আরোপ করার জন্যই সমালোচকদের তিরস্কার করলেন 'নির্বোধ' বলে। ভাবসঞ্চারিত করার ক্ষমতাকে শিল্পীর এমন একটি অত্যাবশ্যিক মহৎ গুণ বলে গণ্য করেছিলেন টলস্টয় যে, যে-সমস্ত শিল্পী রসিকের হৃদয়ে সরাসরি সঞ্চারিত হয় না সেগুলি তাঁর মতে 'Counterfeit art' মাত্র। এই মেকি শিল্পই, টলস্টয় লক্ষ্য করেছেন, শিল্পীর রচনা চাতুর্যের গুণে শ্রদ্ধার আসন পেয়ে এসেছে বরাবর। কল্পনা, সৌন্দর্য প্রভৃতি শব্দগুলি নিতান্তই অসৎ শিল্পীর আত্মরক্ষার বর্ম। কল্পনাশক্তি বা সৌন্দর্যসৃষ্টি-ক্ষমতার উপর শিল্পীর মহিমা নির্ভর করে না, করে ভাবকে সঞ্চারিত করার দক্ষতার উপর। শিল্প সম্পর্কে টলস্টয়ের একটি সিদ্ধান্ত হচ্ছে—'The stronger the infection the better is the art'[২], শিল্পের সংজ্ঞা দিচ্ছেন তিনি এইভাবে—'Art is a human activity consisting in this, that one man consciously by means of certain external signs, hands on to others feelings he has lived through, and that others are infected by these feelings and also experience them.'[৩] স্পষ্টই টলস্টয় শিল্পী ও রসিকের সমানুভূতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং এই সমানুভূতি সৃষ্টির ব্যাপারে স্রষ্টার উপরেই সর্বাধিক দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন। সুতরাং 'সঞ্চারবাদী' টলস্টয় শিল্পীর দায়িত্বমুক্ত, নির্ভার ও যথেচ্ছাচারী মূর্তি সহ্য করতে পারেন নি। তিনি কে

'সঞ্চারক্রিয়া'র উপর এত গুরুত্ব আরোপ করেছেন সেই 'সঞ্চার ক্রিয়া'র সাফল্য নির্ভর করে প্রথমতঃ যে অনুভূতি পাঠকের কাছে প্রেরিত হচ্ছে তার বৈশিষ্ট্যের উপর; দ্বিতীয়তঃ অনুভূতি যেভাবে পাঠকের কাছে প্রকাশিত হচ্ছে তার স্বচ্ছতার বা স্পষ্টতার উপর এবং তৃতীয়তঃ শিল্পীর নিজের অকৃত্রিম আন্তরিকতার উপর।

প্রথম সূত্র সম্পর্কে টলস্টয়ের বক্তব্য হচ্ছে—প্রত্যেক মানুষের অনুভবের মধ্যেই নিজত্ব আছে, স্বাতন্ত্র্য আছে এবং সৎশিল্পী যেহেতু নিজের অনুভবের উপরেই নির্ভর করে থাকেন তাই তাঁর শিল্পকর্মে অনুভবের বৈশিষ্ট্য বা স্বাতন্ত্র্য আমরা খুঁজে পাব। এই স্বাতন্ত্র্য যত প্রকট হবে গ্রহীতা অর্থাৎ শ্রোতা, পাঠক বা দর্শকেরা ততই আগ্রহ এবং নিষ্ঠার সঙ্গে শিল্পকর্মের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার চেষ্টা করবেন। কিন্তু মানবজীবনে এমন বহু অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি আছে যেগুলিতে স্বাতন্ত্র্য আছে অথচ চিরকালই সাহিত্যে বা শিল্পে বর্জিত হয়ে এসেছে এবং সেগুলি নিতান্তই অনাকর্ষণীয় অরুচিকর বলে অপরের কাছে প্রকাশ করাও যায় না। শিল্প বা সাহিত্যে সেই সমস্ত অনুভূতি বা অভিজ্ঞতার প্রকাশও কি বাঞ্ছনীয় হবে? টলস্টয় বলেছেন, যে-কোন অনুভূতি তা সে দুর্বল বা মহৎ, মূল্যবান বা মূল্যহীন, কামগন্ধময় বা আত্মত্যাগসমুজ্জ্বল যাই হোক-না কেন, শিল্প-সাহিত্যের বিষয়রূপে গণ্য হতে পারে, যদি লেখকের অনুভূতি শ্রোতা বা পাঠকের হৃদয়ে যথাযথ সঞ্চারিত হয়ে থাকে। তবে সেই সমস্ত অনুভূতি বা উপলব্ধি লেখকের একান্ত নিজস্ব হওয়া চাই, পূর্বানুকৃত বা অনুসৃত হলে চলবে না। যত মহৎই হোক, অনুকৃত ভাবানুভূতির কোন মূল্য বা মর্যাদাই থাকতে পারে না শিল্প-সাহিত্যের জগতে। আবার টলস্টয় যে প্রাতিস্বিক অনুভূতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন তার শিল্পমূর্তির সার্থকতা নির্ভর করে প্রথমতঃ লেখকের অকৃত্রিম আন্তরিকতার উপর এবং দ্বিতীয়তঃ এমন অভিজ্ঞতার বা অনুভূতি জাগরণের ভিতর যার সঙ্গে পাঠকের পূর্ব অভিজ্ঞতার সম্পর্কসূত্র বিদ্যমান। (যে অভিজ্ঞতা অনুভূতির আকারে স্মৃতিলোকে থাকে না তার জাগরণই বা ঘটবে কি করে?) সুতরাং টলস্টয় 'অনুভূতির স্বাতন্ত্র্য' কথাটির যথেষ্ট গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা না দিলেও একদিক থেকে তাঁর বক্তব্যের সমর্থন খুঁজে পাওয়া যায়। পরানুকরণের বিরুদ্ধে বলতে গিয়েই টলস্টয় 'স্বাতন্ত্র্য' শব্দটির উপর জোর দিয়েছিলেন।[৪] যেহেতু গোটের 'ফাউস্ট'-এর বিষয়বস্তু

অন্যকোন উৎস থেকে পাওয়া এবং শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকগুলিও নানাভাবে ভিন্ন কোন উৎস থেকে উপাদান সংগ্রহ করে লেখা তা-ই গ্যেটে বা শেক্‌স্‌পীয়র তাঁদের 'নিজস্ব' থেকে সাহিত্যসৃষ্টি করেন নি এইরকম একটা অভিযোগ ছিল টলস্টয়ের। এবং গ্যেটে বা শেক্‌স্‌পীয়রের উপর টলস্টয়ের বিরক্ত হওয়ার অন্যতম কারণও তাই। এঁদের সাহিত্যের বিষয়বস্তুর জন্মভূমি নাকি এঁদের অভিজ্ঞতার জগৎ বা কল্পনালোক নয়। কিন্তু প্রশ্ন হতে পারে, বিষয়বস্তুতেই কি সাহিত্যের অন্তরঙ্গ স্বরূপের পরিচয় মেলে? 'সাহিত্য' নামক শিল্পের যে একটি বিশিষ্টরূপকে আমরা পাই, 'বিষয়বস্তু' তার কতটুকু অংশ? কিন্তু টলস্টয় 'ফর্ম' ও 'কণ্টেণ্ট'-এর সনাতন দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে 'কণ্টেণ্ট'-এর দিকে ঝুঁকেছিলেন (যদিও মুখে 'ফর্ম' ও 'কণ্টেণ্ট'-এর ঐক্যের কথাই বলেছেন বার বার) বলেই তাঁর এই সিদ্ধান্ত। ইতিহাসের 'ওথেলো' এবং প্রিন্স অব ডেনমার্ক 'হ্যামলেটের' কাহিনী আর শেক্‌স্‌পীয়রের 'ওথেলো' এবং 'হ্যামলেট' নাটক কি একই বস্তু? বাল্মীকির 'রামায়ণে'র সঙ্গে কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ' বা মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' কাব্যের কি কোনই পার্থক্য ছিল না? মনে হয় টলস্টয় 'individuality of feeling' বলতে 'uniqueness of subjects' বুঝিয়েছেন। কিন্তু নন্দনতত্ত্বে 'subject' ও 'feeling' কদাপি সমার্থক নয়। যে-কোন বিষয়কে সাহিত্যে স্বীকার করার ঔদার্য ক্রোচের মত টলস্টয়েরও ছিল, কিন্তু ক্রোচে যেখানে 'feeling'-এর উপর গুরুত্ব দিয়েছেন, টলস্টয়ের গুরুত্ব সেখানে subject'-এর উপর। অভিব্যক্তিবাদী ক্রোচে যেখানে বিষয়কে মনে করতেন শিল্পীর অবলম্বন মাত্র, সঞ্চারবাদী টলস্টয় সেখানে বিষয়কে বসালেন শিল্পের জগতের রাজাসনে। যদি যথার্থ 'feeling'-এর বৈশিষ্ট্য বা স্বাতন্ত্র্যের উপর জোর দিতেন টলস্টয় তাহ'লে অনুক্ত বিষয়বস্তুর ব্যাপারে এতটা শুচিবায়ু থাকত না তাঁর।

'সঞ্চার ক্রিয়া' সম্পর্কে দ্বিতীয় সূত্রে টলস্টয় রচনার স্পষ্টতা বা স্বচ্ছতার গুরুত্বের কথা বলেছেন। শিল্পের জন্মভূমি যেহেতু লেখকের হৃদয় সুতরাং কেবল তখনই একের উপলব্ধি অপরের ভিতর ব্যাপক ও গভীরভাবে সঞ্চারিত হতে পারে যখন প্রকাশ হয় স্বচ্ছ। প্রকাশের স্বচ্ছতার গুণেই শিল্পী-সাহিত্যিকের কাছ থেকে তাঁর বক্তব্য পাঠকের অন্তরে প্রবিষ্ট হয়। প্রকাশের জটিলতা অনেক সময়, যদিও সব সময় নয়, ভাবনার অগভীরতা প্রমাণ করে। কিন্তু ভাব বা

বিষয়বস্তুই যদি অসাধারণ হয় তবে সেক্ষেত্রে প্রকাশও অসাধারণ হতে পারে। বিষয় অনুসারেই রচনা স্বচ্ছ বা জটিল হয়ে থাকে। দুর্বোধ্যতার অভিযোগে অভিযুক্ত মালার্মে, টি. এস. এলিয়ট এবং তরুণ রবীন্দ্রনাথ (দ্রঃ 'কাব্য : স্পষ্ট ও অস্পষ্ট') তাঁদের আত্মপক্ষ সমর্থনে যে সমস্ত যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন তার অন্যতম হচ্ছে, রচনা বিষয়ানুযায়ী হয়ে থাকে স্পষ্ট বা তথাকথিত অস্পষ্ট। তাই বিষয়ানুসারী দুর্বোধ্যতা কাব্যের ত্রুটি নয়। ---সরল প্রকৃতির রূপ বর্ণনা আর জটিল মানবমনস্তত্ত্বের রূপায়ণ কদাপি একই ভাষা বা ভঙ্গিতে সম্ভব নয়। সুতরাং টলস্টয় যে Clearness of expression'-এর মাহাত্ম্য ঘোষণা করেছেন তা সর্বদা গ্রাহ্য না-ও হতে পারে। টলস্টয় তাকিয়েছিলেন তাঁর সমকালীন স্বদেশের লেখক ও পাঠকসাধারণের দিকে। তিনি কৃষক ও দরিদ্র-শ্রেণীর মানুষদের দুঃখ নিজের অন্তর দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করেছিলেন এবং তাঁর স্বগোত্রদের কাছ থেকেও কামনা করেছিলেন এই দরিদ্র মানুষদের সম্পর্কে সচেতনতা। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে টলস্টয় এস. টি. শেমেনভের কৃষিজীবন নিয়ে লেখা গল্প সংকলনের পরিচায়িকা লিখে দিয়েছিলেন এবং সেই পরিচায়িকা অংশে শেমেনভের গল্পের বিষয়বস্তু, ভাষাভঙ্গি ও লেখক হিসেবে তাঁর নিষ্ঠা ও সততার প্রশংসা করেছিলেন। টলস্টয় নিজেও ছিলেন প্রাক-বিপ্লব রাশিয়ার 'Peasant mass movement'-এর প্রতিনিধি স্থানীয় লেখক। রুশ জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতা লেনিন এই মহান শিল্পীর উদ্দেশে তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছিলেন, যদিও শিল্পী টলস্টয় ছিলেন ঈশ্বর বিশ্বাসী। অবশ্য টলস্টয়কে ঈশ্বর বিশ্বাসী বললে তাঁর সম্পর্কে অনেক কিছুই না-বলা থেকে যায়। টলস্টয় ছিলেন একধারে বাস্তববাদী ও ঈশ্বর প্রেমের মহিমা প্রচারক, বিশ্বের অন্যতম সেরা মানবতাবাদী-শিল্পী ও ভূম্যধিকারী, রাজন্যবর্গের মিথ্যাচার ও শ্রমজীবীর দুঃখ কষ্টের সুনিপুণ ভাষ্যকার অথচ বলপ্রয়োগের দ্বারা অন্যায়ের প্রতিরোধের ঘোরতর বিরোধী। সুতরাং টলস্টয়ের মধ্যে ঘটেছিল নানা বিপরীতের সমন্বয়। 'Peasant mass movement'-এর অন্তর্নিহিত দোষ ও গুণ মিলে গিয়েছিল টলস্টয়ের মধ্যে। মনের দিক থেকে তিনি এই আন্দোলনের অংশীদার হওয়ায় শিল্পী-সাহিত্যিকদের কাছ থেকে তিনি কামনা করেছিলেন বৃহত্তর কৃষিজীবন সম্পর্কে সচেতনতা, বিষয়নির্বাচন ও প্রকাশভঙ্গির স্বচ্ছতায় ঘটবে যার প্রকাশ। যেহেতু এই কৃষকশ্রেণীর মানুষেরা সহজবোধ্য সাহিত্য থেকে মনের

খোরাক সহজে পেতে পারবেন সুতরাং সাহিত্যিককে সহজবোধ্য হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। লেখককে যদি পাঠকের অন্তরের ভিতর নিজের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি সঞ্চারিত করার মধ্যে সিদ্ধি সন্ধান করতে হয় তাহলে পাঠক-সাধারণের চাহিদা সম্পর্কেও তাঁকে সজাগ থাকতে হবে। আবার অধিক সংখ্যক মানুষই যেখানে অশিক্ষিত সেখানে অধিকসংখ্যককে প্রাণিত করার জন্য প্রয়োজন যে রচনাপদ্ধতির তার দুরূহতা নিশ্চয়ই ত্রুটি হিসেবে গণ্য হবে। অতএব প্রকাশভঙ্গির স্পষ্টতা সম্পর্কে টলস্টয়ের এই নির্দেশ। কিন্তু এই স্পষ্টতা বা সহজবোধ্যতার উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ একইসঙ্গে টলস্টয়ের নন্দন-তত্ত্বের স্বাতন্ত্র্য ও সীমা ঘোষণা করে। এই 'সহজবোধ্যতা'কে শিল্পবিচারের মাপকাঠিরূপে গ্রহণ করে টলস্টয় শিল্পের দুটি শ্রেণী কল্পনা করে নিয়েছেন—অসংশিল্প (Bad art) ও সংশিল্প (Good art)। সংশিল্পের কাজ, টলস্টয় বলেছেন, মানবৈক্যসাধন।[৫] লোকশিল্প (folk art) যেহেতু এই ঐক্যসাধনে সর্বাপেক্ষা সহায়ক, অতএব লোকশিল্পই 'সংশিল্প'। এই বিচারসূত্র অনুসারেই টলস্টয়, এস্কাইলাস-ইউরিপাইদিস-শেক্‌স্‌পীয়র-গ্যেটে-বিঠোফেন-হ্বাগনারের (এমন কি নিজেরও অধিকাংশ সৃষ্টি) শিল্পকর্মকে ধনীর বিলাসবহুল জীবনের ভোগসুখের উপাদান ব'লে ধিক্কার দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এঁদের শিল্পকর্মে সেই স্পষ্টতা বা স্বচ্ছতা নেই যা অনায়াসে সাধারণ মানুষের হৃদয়ে তরঙ্গ সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু 'clearness'-এর সপক্ষে টলস্টয় যত চাঞ্চল্যকর যুক্তিই ব্যবহার করুন না কেন, এ প্রশ্ন অবান্তর হবে না যে, টলস্টয় যে 'সর্ব-সাধারণ' বা কৃষি ও শ্রমজীবীর মুখ চেয়ে শিল্পসৃষ্টি করতে বলেছেন তাঁরাই কি স্পষ্টতা ও অস্পষ্টতার যথার্থ বিচারক? এ কথা হয়ত স্বীকার্য, পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ শিল্পের খ্যাতি পেয়েছে সেই সমস্তই যা শিক্ষিত, সুবিধাভোগী বা অবকাশভোগী (বিলাসী?) পাঠকদের মন যুগিয়ে এসেছে। কিন্তু তাই বলে অকস্মাৎ 'সরলতা' বা স্পষ্টতার নামে জোর করে শ্রেষ্ঠত্বের রাজসিংহাসন থেকে প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের নীচে নামিয়ে আনাও কিছুটা হঠকারিতা নয় কি? শুধুই 'কাব্যরসিক' নামক বিশেষ এক শ্রেণীর জন্য কাব্যরচনা যে পৃথিবীর বৃহৎ সংখ্যক মানুষকে বঞ্চিত করা মাত্র যে-কোন প্রগতিশীল মনই তা মেনে নেবে, কিন্তু 'লোকশিল্প'ও যে শিক্ষা-সংস্কারহীন মানুষ মাত্রকেই বিহ্বল করে তুলবে তারই বা প্রমাণ কোথায়? তা ছাড়া লেখকের উপলব্ধি বা অনুভূতি কতটা স্পষ্টভাবে

প্রকাশিত হলে তবে তা সর্বসাধারণের উপলব্ধি-গম্য হয় তাই বা কে বলবে? টলস্টয়ও বলেন নি। অধিক সংখ্যক মানুষের বোধগম্য হওয়ার জন্য শিল্প-সাহিত্যে স্পষ্টতার প্রয়োজন, টলস্টয়ের অভিমতের স্বাতন্ত্র্য এখানে। কিন্তু স্পষ্টতার বিচারক হওয়ার প্রকৃত যোগ্যতার অধিকারী কে তা যখন সুনিশ্চিত নয় তখন এই অভিমতও সংশয়াতীত সত্য নয়।

তৃতীয় সূত্রে টলস্টয় শিল্পীর আন্তরিকতার গুরুত্ব আলোচনা করেছেন। এই সূত্রটি, তাঁর মতে, এতই গুরুত্বপূর্ণ যে তিনটি সূত্রকে এই একটিমাত্র সূত্রেই সীমাবদ্ধ করা যেতে পারে। এই তত্ত্বটির বিরুদ্ধে obscurity'র অভিযোগ উত্থাপন করে আই. এ. রিচার্ডস্ বলেছেন, টলস্টয়ের যুক্তি আমাদের এই সত্য বোঝার ব্যাপারে খুব কমই সহায়তা করে।[৬] কিন্তু আমাদের মনে হয়, টলস্টয়ের ব্যাখ্যা একেবারে খুব অস্পষ্ট নয়।[৭] টলস্টয়ের অভিমত হচ্ছে—দর্শক, শ্রোতা বা পাঠক যখন উপলব্ধি করেন লেখক নিজের সত্যানুভূতি থেকে লিখেছেন, লেখকের আগ্রহ এবং আনন্দই তাঁর লেখার কারণ, তখনই পাঠক সেই লেখাকে নিজের ক'রে গ্রহণ করেন। কিন্তু অপরকে স্বমতে দীক্ষিত করা বা পাঠককে তুষ্ট করা যদি লেখকের উদ্দেশ্য হয় তাহ'লে ভাব বা বিষয়বস্তু যতই চিত্তাকর্ষক বা অভিনব হোক এবং কলাকৌশল হোক চাতুর্যপূর্ণ, পাঠকের ভিতর প্রতিরোধ স্পৃহা জেগে উঠবেই। ...টলস্টয়ের এই ধারণা সম্পর্কে নিশ্চয়ই সংশয়ের অবকাশ নেই। আমরা নিশ্চয়ই মানব, একজন যেমন খাদ্যগ্রহণ করে অপরের শারীরিক পুষ্টি ঘটাতে পারে না তেমনি কেউই অপরের স্বার্থে সাহিত্যসৃষ্টি করতে পারে না এবং করলেও তা কৃত্রিমতা-দোষ দুষ্ট হতে বাধ্য। রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছেন 'সাহিত্য জীবনের স্বাভাবিক প্রকাশ, তাহা তো প্রয়োজনের প্রকাশ নহে। চিরদিনই লোকসাহিত্য লোক আপনি সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছে। দয়ালু বাবুদের উপর বরাত দিয়া সে আমাদের কলেজের দোতলার ঘরের দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া বসিয়া নাই।......স্বয়ং বিধাতাও অনুগ্রহের জোরে জগৎ সৃষ্টি করিতে পারেন না, তিনি অহেতুক আনন্দের জোরেই এই যাহা-কিছু রচিয়াছেন। যেখানেই হেতু আসিয়া মুরুব্বি হইয়া আসে সেই-খানেই সৃষ্টি মাটি হয়'।[৮] কিন্তু জনসাধারণের জন্য কিছু করা উচিত, এই প্রেরণা থেকে মানুষ সমাজসংস্কার ও সাহিত্যসৃষ্টি দুই-ই করে থাকে। এর ফলে Sincerity বা অন্তরের সঙ্গে কাজের সম্পর্কের সত্যতা নষ্ট হয়ে যায়।

এই Sincerity'র অভাবই চোখে পড়ে প্রথিতযশা সাহিত্যিকদের সাহিত্যে যখন তাঁরা সস্তা খ্যাতি বা খেতাবের প্রলোভনে অন্তরের তাগিদকে অস্বীকার করে বাহ্য প্রেরণার দ্বারা পরিচালিত হন। ফলে সাধারণ পাঠকের উপর ভরসা ক'রে মিথ্যার ধাঁধায় বিভ্রান্ত হয়ে থাকেন। টলস্টয় এই কারণেই শিল্পীর 'Sincerity'কে শিল্পের জগতে নিরতিশয় প্রয়োজনীয় উপাদান বলে ঘোষণা করেছিলেন। এই 'Sincerity'কে স্মরণে রেখে তাঁর ব্যাখ্যাত 'সঞ্চার ক্রিয়া'কে এইভাবে একটি মাত্র বাক্যে সীমাবদ্ধ করা যায়—লেখকের অনুভূতি বা আবেগ যদি হয় অকৃত্রিম, রচনাপদ্ধতিতে স্বেচ্ছাকৃত দুরূহতা না থাকে তাহ'লে সাহিত্য সম্পর্কে সাহিত্যিকের আন্তরিকতা লোকসমাজে স্বীকৃত হয়, লেখক সাদরে গৃহীত হন এবং সাহিত্যিকের আবেগ বা অনুভূতি পাঠকের হৃদয়ের গভীরে সঞ্চারিত হয়।

'সঞ্চার'বাদী টলস্টয় শিল্পের সাফল্য সন্ধান করেছিলেন শিল্পীর আপন অনুভূতি রসিকের হৃদয়ে সঞ্চারিত করে দিয়ে তাঁর অন্তরে অনুরূপ ভাব উদ্বোধন করার মধ্যে। ভাবের সঞ্চার সফল হতে পারে যে তিনটি প্রধান সূত্রের উপর নির্ভর ক'রে সেই সূত্র তিনটির মধ্যেই টলস্টয়ের নন্দনতত্ত্ব-সংক্রান্ত প্রধান জিজ্ঞাসা সমূহের রহস্য লুকিয়ে আছে। কিন্তু টলস্টয়ের 'infection' তত্ত্বের যাথার্থ্য দিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বিভিন্ন জনের মনে। কবি-সমালোচক টি. এস. এলিয়ট বলেছেন—কাব্যকবিতা থেকে পাঠকের মনে কবির ভাব, চিন্তা, অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গক্রমে সঞ্চারিত হলেও কোন কবিতা সমগ্রভাবেই পাঠকের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়, তাঁর অনুভূতিকে এক সঙ্গে আলিঙ্গন করে। শুধুমাত্র ভাবাবেগ বা feeling পৃথকভাবে সঞ্চারিত হয় না। ...টলস্টয় যেখানে শুধুমাত্র 'feeling'-এর 'infection' এর কথা বলেছেন, এলিয়ট সেক্ষেত্রে সমগ্রকাব্যের infection-কথা বলছেন। তা ছাড়া, আমাদের মনে হয়, যে ভাব বা আবেগ লেখকের ভিতরে সত্য ছিল তিনি তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির মাধ্যমে অনুরূপ ভাবের উদ্বোধন ঘটাবেন শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে, এই মতের যাথার্থ্যের সীমা আছে। যে-দুঃখ, আনন্দ বা বেদনার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লেখকের ভিতর সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে, অপরের কাছে যখন সেই সমস্ত অনুভূতিগুলি শিল্পরূপে সমর্পিত হয় তখন লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বা অনুভূতি এমন এক অখণ্ড সুসমঞ্জস শিল্পমূর্তি গ্রহণ করে যার সঙ্গে লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বা অনুভূতির

সাদৃশ্য কমই। জীবনে অভিজ্ঞতা আসে পৃথক পৃথক ভাবে, অনুভূতি থাকে খণ্ড খণ্ড ভাবে। কিন্তু বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতা ও খণ্ড অনুভূতিগুলি শিল্পের মধ্যে অখণ্ড একের মূর্তি গ্রহণ করে। অতএব শিল্পের অখণ্ডত্বে বিশ্বাস করলে পৃথক-ভাবে 'feeling' 'transmitted' হয়, এমত গ্রহণযোগ্য হয় না। তাছাড়া, লেখকজীবনের যে দুঃখজনক অভিজ্ঞতা থেকে বেদনার কাব্য জন্মলাভ করে পাঠকের কাছে তা সমর্পিত হওয়ার পর পাঠকের ভিতর আর নতুন করে দুঃখের বোধ জন্মে না, পাঠক আনন্দ ভোগ করেন। টলস্টয় অবশ্য 'আনন্দ' 'সৌন্দর্য' প্রভৃতি শব্দগুলিই বর্জন করেছেন এবং একধরণের উপযোগিতার কথা বলেছেন ('art unites people')। কাব্যপাঠে পাঠকের আনন্দ লাভ হয়, একথা বললে টলস্টয়কে মানতেই হত যে পাঠকের ভিতর লেখকের নিজের অন্তরের ভাব সঞ্চারিত করাই শিল্প-সাহিত্যের শেষ কথা নয়। আবার তিনি 'আনন্দ' শব্দটি বর্জন করে মানুষে মানুষে যোগ স্থাপন করাকে শিল্পের উদ্দেশ্য বললেও একথা তো সত্য, কাব্য যত সহজবোধ্যই হোক সব মানুষের হৃদয়ের মধ্যে বিশেষ কাব্যপাঠ থেকে একই ধরণের আবেগ বা অনুভূতির জন্ম হয় না। লেখকের অনুভূতির সঙ্গে পাঠকের অনুভূতির অথবা এক পাঠকের সঙ্গে অন্য পাঠকের আবেগের কোন প্রভেদ নেই, এই জাতীয় সাম্যবাদের ভিত্তি কিন্তু সুদৃঢ় নয়। লেখকের সঙ্গে পাঠকের অনুভূতির পার্থক্য তো আছেই, এমন কি সাধারণ লোকজীবনের গাথা হলেও একজন রসিক অপর রসিকের চেয়ে একই বিষয় থেকে ভিন্ন আবেগ অনুভব করতে পারেন। এই সত্যের দিকে লক্ষ্য রেখেই হার্বার্ট রীড মন্তব্য করেছেন—পাঠকের মধ্যে ভাব সঞ্চারিত করা শিল্পের কাজ, এ ধারণা সঠিক নয়: 'I would say that the function of the art is not to transmit feeling....The real function of art is to express 'feeling' and transmit understanding'* ভাব বা আবেগকে প্রকাশ করা এবং 'বোধ'কে সঞ্চারিত করা, এই হচ্ছে শিল্প এবং শিল্পীর ভূমিকা। মনে হয় 'feeling' শব্দটির দার্শনিক অর্থ সম্পর্কে টলস্টয়ের সচেতনতা স্পষ্ট হলে তিনি এতটা সহজবোধ্য হতেন না। সর্বোপরি যে 'degree of infection' কথাটি বলেছেন টলস্টয়, তার ভিতর কিন্তু যথেষ্ট অস্পষ্টতা আছে। কি বোঝাতে চেয়েছেন তিনি? হয় অধিকসংখ্যক পাঠক বা রসিকের কথা বলেছেন, নতুবা লেখকের অভিজ্ঞতা কতখানি নিখুঁত হয়েছে তার কথা

বলেছেন। দ্বিতীয়টি সত্য নয়, কারণ টলস্টয়ের আলোচনার ধারা থেকে তার সমর্থন মেলে না। প্রকাশের পূর্ণতালাভ বা নিখুঁত হওয়া ব্যাপারটা পাঠকের চেতন-অচেতন সমগ্র মন জুড়ে থাকে। অর্থাৎ কোনো ভাব পাঠকের ভিতর সম্পূর্ণরূপে সঞ্চারিত হয়েছে বললে বুঝতে হবে পাঠকের সমগ্রমন ভাবসিক্ত হয়েছে লেখকের রচনা পাঠ করে। কিন্তু পাঠকমনের গোপন রহস্য নিয়ে কদাপি বিব্রত হন নি টলস্টয়। তা হ'লে কি তিনি জোর দিয়েছেন পাঠকের সংখ্যাধিক্যের উপর? হ্যাঁ, টলস্টয়ের ঝোঁকই ছিল সাহিত্য-পাঠকের সংখ্যা-বিক্যের উপরে। তিনি মনে করতেন, যে-সাহিত্যপাঠে অধিকসংখ্যক পাঠক প্রাণিত হবেন সেই সাহিত্যই সৎসাহিত্য। মোটকথা, টলস্টয়ের অনেক মন্তব্যই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগায়, সংশয় সৃষ্টি করে, এমন কি তাঁর নিজের শিল্পকর্মের সঙ্গে শিল্প-সম্পর্কিত অভিমতের বৈসাদৃশ্য খুঁজে পাওয়াও অসম্ভব নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও টলস্টয়ে বিশ্লেষণের রূপ-সর্বস্বতাবাদের বিরুদ্ধে যে স্পষ্ট প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে, কলাকৈবল্যের প্রতি অবহেলা প্রদর্শিত হয়েছে, সেই-কারণেও তাঁর অভিমতের অভিনবত্বকে মানতে হবে। শিল্প-সাহিত্যের জগতে রসিকের সংখ্যা-গৌরবের দিকে ঝোঁক, নন্দনতত্ত্বের জগতে নানা কারণেই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার। গোর্কি প্রমুখ Socialist Realist-দের আবির্ভাবের ভূমিকা প্রস্তুত হ'ল টলস্টয়ের এই মতের দ্বারাই। তবে অধিক-সংখ্যক পাঠকের মধ্যে লেখকের অনুভূতি সঞ্চারিত করার ব্যাপারে টলস্টয়ের ব্যাখ্যা যে সীমাশাসনে ভুগেছে, মনে হয়, একটু ভিন্নভাবে দেখতে পারলেই টলস্ট তাথেকে মুক্ত হতে পারতেন অনেকাংশে। যেমন রবীন্দ্রনাথ 'সঞ্চার' শব্দটি ব্যবহার করলেও আমরা দেখেছি টলস্টয়ের ত্রুটি তাঁকে স্পর্শ করে নি। ১৩০১-এর ভাদ্রে প্রকাশিত 'মেয়েলি ছড়া' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—(১) 'প্রকৃতি সম্বন্ধে মনুষ্য সম্বন্ধে, ঘটনা সম্বন্ধে কবি····নিজের আনন্দ বিষাদ বিস্ময় প্রকাশ করেন এবং তাঁহার নিজের মনোভাব কেবলমাত্র আবেগের দ্বারা ও রচনাকৌশলে অন্যের মনে সঞ্চারিত করিয়া দিবার চেষ্টা করেন'। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন লেখকের 'মনোভাব' সঞ্চারিত হয় আবেগ ও রচনাকৌশলের দ্বারা। এই মনোভাবই রীড-কথিত 'undersranding'; টলস্টয়-কথিত 'feeling' নয়। সুতরাং 'feeling' 'transmit' করা হয় শিল্পের দ্বারা, টলস্টয়ের এই সীমাশাসিত অভিমত রবীন্দ্রনাথের দ্বারা সমর্থিত নয়। 'মেয়েলি ছড়া' প্রবন্ধ রচনার দুয়

বছর পরে (১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে) রবীন্দ্রনাথ টলস্টয়ের 'What is art? (1898) গ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত হ'ন। প্রিয়নাথ সেনকে লেখা (৯ই অক্টোবর) একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ টলস্টয়ের সঙ্গে তাঁর মতানৈক্যের কথা জানিয়ে টলস্টয়ের উক্ত গ্রন্থের বিস্তৃত সমালোচনা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। টলস্টয়ের সঙ্গে তাঁর মতানৈক্য কোথায় ঘটেছিল তা তাঁর কোন আলোচনাতেই স্পষ্ট হয় নি। এরপর ১৩১০-এর একটি প্রবন্ধে ('সাহিত্যের সামগ্রী') কবি লেখেন—'ভাবের কথাকে সঞ্চার করিয়া দিতে হয়।' টলস্টয়ের মত 'সঞ্চার' শব্দটি গুরুত্বের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সবিস্তারে আলোচনা করেন নি কোথাও। কিন্তু 'মনোভাব', 'ভাবের কথা' প্রভৃতি শব্দের দ্বারা টলস্টয়ের সীমাশাসিত তত্ত্বচিন্তার ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছিলেন।

চ ॥ বিষয় ও রূপ

অভিব্যক্তিবাদী ক্রোচের সঙ্গে সঞ্চারবাদী টলস্টয়ের মত-পার্থক্যের অন্যতম মূল কেন্দ্র ছিল বিষয় ও রূপের আপেক্ষিক গুরুত্ব নিয়ে নন্দনতত্ত্বের জগতের সনাতন দ্বন্দ্ব। ক্রোচে, শিল্পের বহিরঙ্গ রূপের চমককে অস্বীকার করতে চাইলেও তাঁর কাছে শিল্প 'form' এবং 'nothing but form'। অপর পক্ষে রূপ ও বিষয়ের অভিন্নত্ব কামনা করলেও টলস্টয়ের ঝোঁক ছিল বিষয়ের দিকে। আবার ক্রোচে এবং টলস্টয় উভয়েই বলেছেন, যে-কোন বিষয়ই শিল্প-পদবী লাভ করতে পারে। এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য হচ্ছে :

> 'সাহিত্যে যখন কোনো জ্যোতিষ্ক দেখা দেন তখন তিনি নিজের রচনার একটি বিশেষ রূপ নিয়ে আসেন। তিনি যে ভাবকে অবলম্বন করে লেখেন তারও বিশেষত্ব থাকতে পারে, কিন্তু সেও গৌণ; সেই ভাবটি যে বিশেষ রূপ অবলম্বন করে প্রকাশ পায় সেটিতেই তার কৌলীন্য। বিষয়ে কোনো অপূর্বতা না থাকতে পারে, সাহিত্যে হাজার বার যার পুনরাবৃত্তি হয়েছে এমন বিষয় হলেও কোনো দোষ নেই। কিন্তু সেই বিষয়টি যে একটি বিশেষ রূপ গ্রহণ করে তাতেই তার অপূর্বতা। ....রস সাহিত্যে বিষয়টা উপাদান, তার রূপটাই চরম।...বিষয়ের গৌরব বিজ্ঞানে দর্শনে কিন্তু রূপের গৌরব রস সাহিত্যে।'[১]

রূপ ও বিষয়ের দ্বন্দ্ব সাহিত্যের জগতে সুপ্রাচীন কাল থেকে চলছে।

কি লিখতে হবে শুধু জানলেই চলে না, কেমন করে লিখতে হবে তা-ও জানতে হয়, একথা অ্যারিষ্টটলের সময় থেকেই স্বীকৃত হয়ে আসছে। প্রথমটিকে যদি বলি 'বিষয়', দ্বিতীয়টি তা হলে 'ভঙ্গী'। বিষয় ও ভঙ্গীর পারম্পরিক সহযোগিতায় জন্ম নেয় সাহিত্যরূপ বা শিল্পরূপ। সুতরাং সাহিত্যরূপ বলতে অখণ্ড সাহিত্য-কর্মকে বুঝতে হবে, পৃথকভাবে বিষয়কে বা রূপকে নয়। অথচ দ্বন্দ্ব চলছেই। একটিকে বলা হচ্ছে বহিরঙ্গ উপাদান (রূপকে) এবং অপরটিকে (ভাব বা বিষয়কে) অন্তরঙ্গ। একটিকে বলা হচ্ছে আধার, অপরটিকে আধেয়। বিচিত্র উপমার আশ্রয়ে বিষয় ও রূপের অভিন্নতা এবং তাদের পারম্পরিক সহযোগীত্ব বোঝাতে গিয়ে কার্যতঃ কিন্তু তাদের বিচ্ছিন্নতাকেই মেনে নেওয়া হচ্ছে। এর ফলে কখনও সাহিত্যিকদের মধ্যে তীব্র রূপসচেতনতা তথা রূপকৈবল্য জন্ম নিচ্ছে, কখনও আবার বিষয়মুখ্যতা গ্রাস করছে শিল্পীর সমগ্রচেতনাকে। কখনও হোরেসের মুখে শুনেছি, বিষয়বস্তুর নির্বাচন যদি শিল্পীর যোগ্যতানুযায়ী হয় তাহলে তাঁকে আর ভাবতে হয় না রূপ নিয়ে। সুবিন্যস্ত মূর্তিতে পরিচিত শব্দও অপরিচয়ের ঔজ্জ্বল্য লাভ ক'রে সাহিত্যকে নতুন অর্থদ্যোতনায় সমৃদ্ধ করে তুলতে পারে। অর্থাৎ প্রথম ও প্রধান সমস্যা বিষয় নিয়ে। আবার কখনও বা লঞ্জাইনাস বলছেন, সুন্দর শব্দ-সম্ভার হচ্ছে মনের এক ধরণের বিশেষ ও যথার্থ আলোকিত রূপ। হোরেস যেখানে মনে করেন সুকৌশলী সাহিত্যিকের ব্যবহারের নৈপুণ্যে পুরাতন শব্দেও নতুন তাৎপর্য সৃষ্টি হয়ে থাকে সেখানে লঞ্জাইনাস অতি পরিচিত শব্দের ক্ষমতাকে স্বীকার করলেও 'সাব্লাইম'-এর পাঁচটি উপাদানের মধ্যে সালংকৃত ভাষা বা শব্দ সৃষ্টির দক্ষতার উপরেই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন।[২]

যদিও শব্দই সাহিত্যের সব নয়, তবু কাব্য-সাহিত্যে সাহিত্যিকের আত্ম-প্রকাশের প্রধান এবং একমাত্র মাধ্যম যেহেতু ভাষা বা শব্দ অতএব সাহিত্যের রূপ বলতে (যদি 'রূপ' কথাটাকে অন্তর্গত 'ভাব' বা 'বিষয়' বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া হয়) প্রথমতঃ শব্দ বা ভাষার কথাই মনে পড়ে। ভাষাই কাব্যকে দৃষ্টিগ্রাহ্য করে তোলে। যে-সাহিত্য ভাষার মধ্যস্থতায় বাস্তব মূর্তি লাভ করে-নি তাকে কি কেউ সাহিত্য বলেন? যদিও ক্রোচে সাহিত্যিকের অন্তরে প্রতীত মূর্তিকেই 'সাহিত্য' বলে গণ্য করতে প্রস্তুত ছিলেন তার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ না-থাকলেও এবং সেই কারণে শিল্পীর কৌশল বলে কোন কিছু মানতেন না, তবু

কে কবে অনুক্ত কবিতাকে কবিতার মর্যাদা দিয়েছেন? নির্বাক মিলটনের বাসভূমি আছে কোন্ সমালোচকের অন্তর্লোকে? বস্তুতঃ যেমনই হোক, 'রূপ' একটা চাই-ই, সাহিত্যে তার মাধ্যম 'শব্দ', সংগীতে 'কথা' ও 'সুর' এবং চিত্রে 'রেখা' ও 'রঙ'...ইত্যাদি। কিন্তু শব্দটাই কি সাহিত্য? তা হলে কেন কালিদাস বলবেন 'বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ'? বাক্ এবং অর্থের সম্পর্ক মহাকবির ভাষায় 'পার্বতী পরমেশ্বরৌ'। এককে ছাড়া অন্যকে ভাবা যায় না। সুতরাং শুধু 'শব্দ' বললেই যথেষ্ট নয়, বলতে হবে অর্থানুকূল শব্দের ব্যবহারেই কবির কৈবল্য। এখন এই অর্থযুক্ত শব্দের দ্বারা যে সাহিত্যরূপ গড়ে উঠল 'অপৃথগ্‌যত্ন-নির্বর্ত্য' ছন্দ-অলংকার তার মহিমা নিশ্চয় বাড়িয়ে দেবে সন্দেহ নেই, কারণ 'স্বভাবোক্তি' নয়, 'বক্রোক্তি'ই কাব্যের প্রাণস্বরূপ। তবু শুধুই শ্রবণেন্দ্রিয়গোচর কবিতাকে কে কবে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়েছেন? রবীন্দ্রনাথের চেয়ে নিশ্চয়ই সত্যেন্দ্রনাথ মহত্তর কবি ছিলেন না, অথবা মধুসূদনের চেয়ে হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র। উক্তির বক্রতা বা 'বক্রোক্তি' হচ্ছে (কুন্তকের ভাষায়) 'বৈদগ্ধ্যভঙ্গীভণিতি', সুতরাং যে-কোন রকম তির্যক মন্তব্যই কবিতা নয়। কবিতা মাত্রই অল্পবিস্তর পরিমাণে তির্যক, টিলিয়ার্ডের এই মন্তব্যের সারবত্তা যাই থাক তির্যক উক্তি মাত্রকেই তিনি কবিতা বলেন নি। সাহিত্যিকের লক্ষ্য যেহেতু পাঠক হৃদয় সুতরাং সাহিত্যের শব্দের চরম সিদ্ধি সেখানেই যেখানে শব্দ পাঠকের হৃদয়ে তরঙ্গ জাগিয়ে তুলতে পারে, বক্তব্যকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করে তুলতে পারে। নিছক সংবাদ জ্ঞাপন যেহেতু সাহিত্যের লক্ষ্য নয় অতএব সেই শব্দই সাহিত্যে কাম্য যা শুধু শ্রুতিলোকে নয়, অন্তর্লোকেও আন্দোলন জাগাবে। 'তাহার জন্য নানা প্রকার আভাস ইঙ্গিত, নানাপ্রকার ছলাকলার দরকার হয়, তাহাকে কেবল বুঝাইয়া বলিলেই হয় না, তাহাকে সৃষ্টি করিয়া তুলিতে হয়'।* সেই কারণেই প্রয়োজন হয় ব্যঞ্জনাগর্ভ তির্যক শব্দের, সঙ্গীত ও চিত্রপ্রধান ভাষার এবং অতিশয়োক্তির। বর্তমান শতকের ফরাসী কাব্যের 'সুররিয়ালিজ্‌ম্' আন্দোলনের অন্যতম পুরোহিত পল ভালেরি উপমার সাহায্যে ব্যাপারটি বুঝিয়েছেন এইভাবে—জীবদেহের ক্ষুদ্র এক অংশে সামান্যতম আঘাত যেমন সুগভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিতে সক্ষম হয় অথবা কোন 'ট্রান্সফর্মার'-এর ছোট একটি বোতামে চাপ দিয়ে যে-শক্তি উৎপাদন করা যায় তা ব্যয়িত শ্রমের চেয়ে অনেকগুণ বেশী সেইরকম কবি একটিমাত্র সাধারণ শব্দের ব্যবহারের দ্বারা পাঠকের অন্তরে

অনেক গভীর ও ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। আবার শব্দের সামান্য একটু পরিবর্তনও পাঠকের অন্তরে কোন কবিতার পৃথক দ্যোতনা সৃষ্টি করতে পারে।* ভালেরি তাঁর নিজের 'Lan Fontaine'-এর একটি পঙক্তির দুটি শব্দ পরিবর্তন করে তাঁর উক্তির সত্যতা প্রমাণ করেছেন। ভালেরি-র আগেই অবশ্য এ. সি. ব্রাডলে বায়রনের দুটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধার করে এই সত্য প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছিলেন যে, কবির অনুভূতি যে-শব্দের আশ্রয়ে রূপলাভ করেছে অন্য কোন প্রতিশব্দ দিয়ে তার সেই রূপকে অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব নয়। সুতরাং কবিতার রূপ বলে কোন কথা বলা উচিত নয়, কারণ রূপটাই কবিতা। অতএব একবার ভাব যে-রূপে প্রকাশিত হ'ল তারও আর পরিবর্তন সম্ভব নয়। সুতরাং কোন একটি ভাব অন্য কোন ভাষা ও রূপের আশ্রয়ে অধিকতর স্বচ্ছ হয়ে প্রকাশিত হতে পারত, এ কথা অকল্পনীয়।

ক্রোচে বলেছিলেন, কোন বিষয়বস্তু অন্যকোন বিষয়বস্তু অপেক্ষা অধিকতর সাহিত্যোপযোগী, একথা ঠিক নয়; যে-কোন বিষয়ই সাহিত্যপদবী লাভের যোগ্যতা রাখে। মনে হয় এই সঙ্গে এই কথাও যুক্ত হওয়া উচিত যে, অর্থযুক্ত শব্দমাত্রই সাহিত্যে গ্রাহ্য হতে পারে যদি অবশ্য সেই শব্দ নিজের সীমাশাসন ত্যাগ করে ব্যঞ্জনাবহ হয়ে উঠতে সক্ষম হয়। ব্রাডলে বলেছেন (ভারতীয় 'ধ্বনিবাদী'দের মতই): শ্রেষ্ঠ কবিতা, এবং শুধু শ্রেষ্ঠ নয়, যে-কোন কবিতার চতুর্দিকেই অপরিসীম ব্যঞ্জনার লীলা চলে। ....ভাষার এই ব্যঞ্জনাবৃত্তি যে অলংকৃত ভাষার উপর নির্ভর করে না ধ্বনিকার আনন্দবর্দ্ধন তাঁর 'ধ্বন্যালোক' গ্রন্থের প্রথম উদ্দ্যোতে দৃষ্টান্ত সহ বিশ্লেষণ করেছেন। মোটকথা বিষয় নির্বাচনে লেখককে যেমন গ্রহণ-বর্জনের পন্থা অবলম্বন করতে হয় তেমনি সাহিত্যের ভাষারূপ নির্মাণের ক্ষেত্রেও লেখককে সচেতন থাকতে হয়। এই জন্য অনুশীলনেরও প্রয়োজন। 'স্বভাবকবিত্ব' যত প্রশংসনীয় হোক, কাব্যের স্বতঃস্ফূর্ততা যত কাম্যই হোক, ভাবের কাব্যমূর্তিলাভে স্রষ্টার বুদ্ধির ও সজ্ঞান মনের সক্রিয়তার মূল্য অপরিসীম। কাব্যরূপ বা 'ফর্ম' যা গড়ে ওঠে বিষয়, ভাব, রীতি সব মিলে তার জন্য স্রষ্টার আবেগ বা 'ইমোশন'ই সব নয়, বুদ্ধি বা 'ইন্‌টেলেক্ট' ও অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। অর্থাৎ সাহিত্য যে আবেগের উচ্ছ্বসিত মূর্তি মাত্র নয়, এক ধরণের 'সচেতন সৃষ্টি' (conscious calculation). তার প্রমাণ আছে রূপে। বিষয় সর্বসাধারণের সম্পদ। আবেগ, অনুভূতি বা ইম্প্রেশন লেখকের ব্যক্তিগত

ব্যাপার। কোনো বিষয়কে কেন্দ্র করে লেখকের যে 'ইম্প্রেশন' সৃষ্টি হয় তাও ততক্ষণ রচয়িতার ব্যাপার থাকে যতক্ষণ না লেখক তাকে বাহ্য এবং বহুজনগ্রাহ্য রূপ দিতে পারছেন। সুতরাং সাহিত্য রূপ না পাওয়া পর্যন্ত পাঠকের কাছে তার অস্তিত্বই থাকে না। রূপদানের মধ্যে সাহিত্যিক তাঁর অন্তর্লোকে এক ধরণের মুক্তির আনন্দ উপভোগ করেন। এ হচ্ছে লেখক তরফের কথা। পাঠকেরও প্রবেশ ঘটে রূপের সিংহ-দরজা দিয়ে। সাহিত্যের রূপই লেখকের প্রধান সহায় এবং শেষ সম্বলও। আবার বিষয়বস্তুতে পাঠকের অনুপ্রবেশ ঘটে এই রূপের মাধ্যমেই। পৃথক পৃথকভাবে বিষয় ও রূপের বোধ জাগে না পাঠকের মধ্যে। এমন কি যে 'রসানুভূতি' পাঠকের একান্ত কাম্য বস্তু তা সম্ভব হয় রূপের সহায়তাতেই। শিল্পমাত্রই এমন একধরণের সৃষ্টি যা অপরের মধ্যে সঞ্চারিত হওয়া প্রয়োজন। শুধু প্রকাশিই হওয়াই যথেষ্ট নয়। সুতরাং লেখকের অভিজ্ঞতা বা অনুভূতির এমন রূপ লাভ করা উচিত যা অনায়াসে লেখকের অনুভূতি পাঠকের ভিতর সঞ্চারিত করে দিতে পারে। এই কারণে টলস্টয় শিল্পে শুধু বিষয়মাহাত্ম্য নয়, সুগঠিত রূপ নির্মাণে শিল্পীর ঔৎসুক্য ও প্রকাশের Sincerity কামনা করেছেন, যে-রূপ কোনো বিশেষ ভাবপ্রকাশের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য।

শিল্পীর যে 'Sincerity' কথা টলস্টয় এত সাড়ম্বরে ঘোষণা করেছেন সেই Sincerity ভাব ও রূপের অবিভাজ্য ঐক্য মূর্তিতে প্রমাণিত হয়ে থাকে। টলস্টয় তথাকথিত সুন্দর রূপের স্রষ্টা সাহিত্যিকদের উপর অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন রূপসৃষ্টির দিকে তাঁদের অতিমনোযোগের জন্য। টলস্টয়ের ঝোঁক ছিল বিষয়-বস্তুর দিকে, যে-কারণে তিনি মনে করতেন যত অধিক সংখ্যক মানুষকে শিল্প প্রাণিত করতে পারবে ততই তার সার্থকতা। রূপসর্বস্ব-সাহিত্য স্বল্পসংখ্যক মানুষকেই আকৃষ্ট করতে পারে অতএব ধনীদের বিলাসের উপকরণ এই সমস্ত সাহিত্য যতটা মন ভোলায় ততটা জীবনের সত্যমূর্তিকে রূপায়িত করে না। টলস্টয়ের বিপরীত মত পোষণ করতেন ক্রোচে যাঁর কাছে শিল্প ছিল 'কর্ম' মাত্র যদিও সেই কর্মের বাহ্যমূর্তিটা নিতান্তই গৌণ। তাই তিনি যে-কোন বিষয়কেই সাহিত্যরাজ্যে গণ্য করতে প্রস্তুত ছিলেন। ক্রোচের সঙ্গে টলস্টয়ের এই মত-পার্থক্যের পিছনে আছে 'রূপবাদী'দের সঙ্গে 'বিষয়বাদী'দের অতি পুরাতন মতভেদ। যদিও রূপ ও বিষয়ের আপেক্ষিক গুরুত্ব নিয়ে বিবাদ চলেছে অনেক-দিন তবু কান্টীয় নন্দনতত্ত্বেই রূপের আধিপত্য স্বীকৃত হ'ল সর্বাধিক পরিমাণে।

তাঁর 'ক্রিটিক অব্ জাজমেণ্ট'-এ কাণ্ট তাকেই সুন্দর বলেছেন যা 'Please immediately' এবং 'Please apart from any interest'। অর্থাৎ কাণ্ট শিল্প সাহিত্যে যে-আনন্দ সন্ধান করেছিলেন তা নেই বিষয়-মাহাত্ম্যে, তা বিষয়-নিরপেক্ষ এবং নিষ্কাম। উদ্দেশ্য-নিরপেক্ষতা বজায় রাখাই শিল্প-সাহিত্যের প্রধান উদ্দেশ্য। বিষয়কে গৌণ করে রূপের উপর কাণ্টের এই গুরুত্ব দান বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল কলাকৈবল্যবাদীদের। এঁদেরই অন্যতম অস্কার ওয়াইল্ড তাঁর "The critic as artist' প্রবন্ধে লিখছেন, 'রূপের উপাসনা থেকে শুরু করুন তাহ'লে শিল্পের কিছুই আপনার কাছে অপ্রকাশিত থাকবে না' কারণ শিল্পের প্রাণ রয়েছে রূপে, শিল্পে রূপই সর্বস্ব।* এখানে 'রূপ' বলতে অস্কার ওয়াইল্ড কী বোঝাচ্ছেন, সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে তা নিয়ে। এই একই প্রবন্ধে অন্যত্র তিনি কাব্যে ছন্দের মহিমা ব্যাখ্যা করলেন এই বলে যে, গুণী শিল্পীর হাতে ছন্দ শুধু কাব্যের বাহ্-শোভাকর নয়, তার অন্তরঙ্গ-সৌন্দর্যবর্দ্ধকও। সুতরাং 'কাব্যরূপ' বলতে তিনি এমন কিছু বোঝেন-নি যা বিভাজ্য ও বহিরঙ্গ। 'কলাকৈবল্যবাদী'দের অন্যতম পুরোহিত ও পরিপোষক গোতিয়ের, ওয়াল্টার পেটার প্রায় একই কথা বললেন,—কাব্যের ক্ষেত্রে প্রতিটি শব্দ ও শব্দ-বন্ধের গুরুত্ব ওজন করে দেখতে হবে পাঠককে এবং সেই বুঝেই ব্যবহার করতে হবে লেখককেও। রূপ যে সাহিত্যের অপরিহার্য অন্তরঙ্গ উপাদান সে বিষয়ে গত শতকের শেষ দিকে ঔপন্যাসিক হেন্‌রি জেম্‌স্‌ও তাঁর একটি প্রবন্ধে ('The art of Fiction' : 1884) বললেন—কোন একটি বিষয় তখনই উপন্যাস বলে গণ্য হয় যখন ঔপন্যাসিক বিষয়টিকে উপন্যাসের নিজস্ব রূপে পরিণতি দিতে পারেন। ....অর্থাৎ বিষয়টাই উপন্যাস নয়, বিষয় এবং আরও অনেক কিছু নিয়ে গঠিত রূপটাই উপন্যাস। অবশ্য বিষয়কে বাদ দিয়েও উপন্যাস নয়। ভাব ও রূপের, কাহিনী ও উপন্যাসের অভিন্নত্ব বোঝাতে গিয়ে অন্য অনেকের মত জেম্‌স্‌ও উপমার আশ্রয় নিয়ে বললেন—কাহিনী এবং উপন্যাস, ভাব এবং রূপ হচ্ছে যথাক্রমে সুচ ও সুতো, এবং কোন ওস্তাগর-কে আমি চিনি না যিনি সুচ ছাড়া সুতো বা সুতো ছাড়া সুচ দিয়ে কাজ চালাতে সুপারিশ করতে পারেন।

এই শতকের গোড়ার দিকে ক্রোচের শিষ্য স্পিনগার্ন তাঁর গুরুকে স্মরণে রেখে বললেন, 'প্রত্যেক কবি তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিতে জগৎকে প্রকাশ করেন এবং

প্রত্যেকটি কবিতাই নতুন এবং স্বতন্ত্র প্রকাশ।' ১৯১৭-এর 'Creative criticisn' গ্রন্থের 'Prose and verse' প্রবন্ধে তিনি স্পষ্ট করে জানালেন, নান্দনিক দিক থেকে ছন্দ এবং রীতি অভিন্ন, রীতি ও শিল্পরূপ অভিন্ন আর শিল্পের রূপ এবং শিল্পীর আত্মা অভিন্ন। এই শতকের গোড়ার দিকের রূপ-সর্বস্বতাবাদীদের অন্য দুই প্রধান নেতা হচ্ছেন ক্লাইভ বেল এবং রোজার ফ্রাই।* ক্লাইভ বেল শিল্পের মূল্য সন্ধান করতে গেলেন না বিষয়বস্তুর মধ্যে। রঙ, রেখা ও আয়তনে সুগঠিত 'significant from'ই তাঁর মতে শিল্পের চরমোৎকর্ষ প্রমাণ করে। কিন্তু তাই বলে পিথাগোরীয় নন্দনতত্ত্ব অর্থাৎ জ্যামিতিক পুঙ্খানুপুঙ্খতার দিকে ঝোঁক ছিল না তাঁর। তিনি মানবজীবনের বিভিন্ন অনুভূতি ও আবেগ থেকে শৈল্পিক অনুভূতিকে পৃথক করে নিয়ে তার প্রকাশেই significant form-এর সার্থকতা সন্ধান করেছিলেন। বেল-এর সমকালে তাঁর প্রধান সমর্থক রোজার ফ্রাই কিছুটা কান্টীয় ভঙ্গীতে শিল্পের জগতে 'disinterested contemplation' এর মর্যাদা ঘোষণা করে বৈচিত্র্য (variety) এবং সুশৃঙ্খল ঐক্যে (order) শিল্পের উৎকর্ষ খুঁজে পেলেন। বিশুদ্ধ শিল্প যা রূপ নিয়েছে বৈচিত্র্য ও ঐক্যের দ্বারা, ফ্রাই-এর মতে, তা যত বিশুদ্ধ হবে ততই তার রসিকের সংখ্যা যাবে কমে। যেহেতু বিশুদ্ধ শিল্পের আবেদন শুধু রসিকের কাছে এবং খুব কম সংখ্যক মানুষই রসিক সুজন তা-ই রসিকের সংখ্যার লাঘবতা শিল্পের গৌরব ঘোষণা করে। সাহিত্য জীবনের পক্ষে ক্ষতিকর কি নয় এই প্রশ্ন অবান্তর, বলেছেন বেল। এবং রোজার ফ্রাইও ঘোষণা করেছেন ভাল-মন্দ হচ্ছে আমাদের কর্মজগতের ব্যাপার এবং শিল্পের জগৎ যেহেতু ভাবের জগৎ অতএব 'we must therefore give up the attempt to judge the work of art by reactions on life, and consider it as an expression of emotions regarded as ends in themselves'.

রূপকৈবল্যের দিকে যে আকর্ষণ ফ্রাই ও বেল-এর মন্তব্যে ফুটে উঠল, তারই চরম রূপ চোখে পড়ল এজ্‌রা পাউণ্ড, য়েট্‌স্ ও এলিয়টের ঘোষণায় এবং কাব্যচর্চায়। ফ্রাই বলেছিলেন, সমঝদারের সংখ্যা-লঘুতা শিল্পের গৌরবসূচক। সেই বক্তব্যই আরও তীব্র হয়ে প্রকাশ পেল এজ্‌রা পাউণ্ড, য়েট্‌স্ ও এলিয়টের মন্তব্যে :

(ক) ['I quarrel with] that infamous remark of Whitman's about poets needing an audience.'[৮] (Pound)

(খ) 'It is wrong of Mr. Kipling to address a large audience';[৯] (Eliot)

(গ) আর ইয়েট্স্ এমন পাঠকের জন্য কবিতা লিখতে চাইলেন 'A man who does not exist, / A man who is but a dream.'

পাঠককে বিস্মৃত হয়ে সাহিত্যরচনার দিকে এঁদের আগ্রহের পিছনে আছে কলাকৈবল্যে আসক্তি, জীবনের অন্য সমস্ত কিছু বর্জন করে শুধুমাত্র 'aesthetic emotion' জাগরণের দিকে ঝোঁক। শিল্পীর কাজ কারুর ভাল করাও নয়, মন্দ করাও নয়। ভাল-মন্দর প্রশ্ন নিতান্তই অবান্তর। সেই কথাই পাউণ্ড বললেন এইভাবে—শিল্প কারুকে কোনদিন বিশেষ কিছু করতে বলে নি, ভাবতে বলে নি বা হতে বলে নি। শিল্প যেন বৃক্ষ, আপনি ইচ্ছে করলে তার রূপের প্রশংসা করতে পারেন, তার ছায়ায় বসতে পারেন, তার থেকে কলা পেড়ে খেতে পারেন, তার থেকে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতে পারেন, প্রাণ যা চায় তা ই করতে পারেন।[১০] অর্থাৎ পাঠক তাঁর অভিরুচি অনুযায়ী শিল্প থেকে বিভিন্ন উপাদান সন্ধান করতে পারেন, কিন্তু শিল্প বা শিল্পীর এ ব্যাপারে কিছুই করার নেই। শিল্প ও শিল্পী সম্পূর্ণতঃ দায়িত্বমুক্ত। এলিয়ট এতটা উগ্র না হলেও তাঁর বক্তব্যও মোটামুটি একই (যদিও শেষের দিকে সব রকম গোঁড়ামিই বর্জন করতে চেয়েছিলেন তিনি): অস্বীকার করি না, শিল্প শিল্পহিসেবে সার্থকতা অর্জন ছাড়াও আরও বিভিন্ন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে; যদিও সেই সমস্ত উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অচেতন। ....মোট কথা, রূপবাদীরা নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখলেন শিল্পকর্মের চতুঃসীমার মধ্যে, বিস্মৃত হলেন যুগ ও সমাজের দাবী। অবশ্য যে রীতি বা পদ্ধতিতে তাঁরা শিল্পকে রূপদান করেছেন তার মধ্যে শুধু তাঁদের ব্যক্তিগত বোধ বা রুচিই নেই, সমাজ এবং সমকালও জড়িয়ে আছে নানাভাবে। তবু সমকালের জীবনের দাবী যেন ভুলে থাকতে চাইলেন তাঁরা। ব্যতিক্রম শুধু একালের 'অ্যাবসার্ডিস্ট'রা যাঁরা নাটকের প্রচলিত ছকই ভেঙে দিলেন শুধুমাত্র নাট্যরূপকে চলতিকালের জীবনচাঞ্চল্যের সঙ্গে একতানবদ্ধ করার জন্য। জীবনের 'অ্যাবসার্ডিটি' ধরা পড়ল নাট্যরূপের 'অ্যাবসার্ডিটি'র মধ্যে। তা ভিন্ন রূপবাদীরা সাধারণভাবে জীবন-বিচ্ছিন্ন বিশুদ্ধ শিল্পকর্মের কথাই

বলেছিলেন সকলে। এর বিপরীত ঝোঁক দেখা গিয়েছিল টলস্টয়ের রচনায় এবং তাঁর পরবর্তীকালের মার্ক্সবাদী সমালোচকদের বক্তব্যে।

প্রতিষ্ঠিত শিল্পী-সাহিত্যিকদের বিরুদ্ধে টলস্টয়ের বিক্ষুব্ধ হওয়ার নানাকারণের প্রধান কারণ ছিল তাঁদের বিষয়বস্তুতে নবীনত্বের অভাব এবং অতিরিক্ত রূপানুরাগ। তাঁর স্পষ্ট ঘোষণা : 'I understand excellence in art in relation to its subject matter'.[১১] বিষয়বস্তুর মাহাত্ম্যেই শিল্পের শ্রেষ্ঠত্ব, টলস্টয়ের এই ধারণা যে রূপবাদী পাউণ্ড-য়েট্‌স্‌-বেল-ক্রাই-এর কতটা বিপরীত তা অতি স্পষ্ট। রূপবাদীরা যেখানে মনে করেন যে উত্তম শিল্পীর হাতে আলপিনের মাথাও সেরা কাব্যের বিষয়বস্তু হতে পারে অথচ মানুষের পতনের মত মহৎ বিষয় সাধারণ শিল্পীর হাতে পড়ে তুচ্ছ শিল্পে পরিণত হওয়া সম্ভব অর্থাৎ বিষয়ে কিছু আসে যায় না[১২] (perfect art is possible in any subject matter or style[১৩]) এবং সুদক্ষ শিল্পী একই সঙ্গে বিপরীত রীতি অবলম্বনে গদ্যের সঙ্গে পদ্য (শেক্‌স্‌পীয়রের নাটক) এবং মহাকাব্যের সঙ্গে গীতিকাব্যের (মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' ও 'ব্রজাঙ্গনা')-রূপ সৃষ্টি করতে পারেন অর্থাৎ শিল্পীর কৌশলই শিল্পের প্রাণস্বরূপ ; সেখানে টলস্টয় এবং উত্তরকালের মার্ক্সবাদী সমালোচকেরা রূপ বা রীতিকে সর্বস্ব জ্ঞান না করে বিষয়কে প্রথম স্থান দিয়ে রূপকে হতে বলেছেন তার সহগ এবং বিষয় ও রূপের সহযোগীত্ব সৃষ্টির উপযোগী রীতিকে অবলম্বন করতে বলেছেন। সাধারণ পাঠক বা শ্রোতাদের প্রতি বিমুখতা দেখিয়ে পাউণ্ড-এলিয়ট্‌-য়েট্‌স্‌ যখন হুইট্‌ম্যান ও কিপলিঙ এর সমালোচনা করেছেন, কামনা করেছেন এমন পাঠক 'who does not exist' অথবা বলেছেন 'I believe in technique as the test of a man's sincerity' (Pound)[১৪] তখন মার্ক্সবাদী সমালোচক বলেন, সত্যিকারের শিল্প বিষয়বস্তুর দিক থেকে সম্পূর্ণ নতুন হওয়া উচিত। যদি বিষয় (content) নতুন না হয় তাহ'লে সেই সৃষ্টির মূল্য নিতান্তই নগণ্য। পূর্বে যা প্রকাশিত হয়নি, শিল্পীর উচিত তাকেই প্রকাশ করা। একই জিনিসের পুনর্নবীকরণে কারুর কৌশল বা দক্ষতা প্রমাণিত হতে পারে, কিন্তু যত সুন্দরই হোক তা সত্ত্বেও তা শিল্প নয়। এই দিক থেকে নতুন বিষয়বস্তু (content) রূপায়ণে প্রয়োজন হয় নতুন রূপের।[১৫] সুতরাং মার্ক্সবাদী নতুন রূপের মূল্য বোঝেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নতুন বিষয়বস্তুর গুরুত্বও প্রতিষ্ঠিত করতে চান।

রূপের মোহে বিষয়কে অস্বীকার করতে হবে এই ধরণের রূপসর্বস্বতায় বিশ্বাসী ছিলেন না তাঁরা। রূপবাদীরা যেখানে পাঠকের সংখ্যালাঘবতায় উল্লাসী হন, বলেন বিশুদ্ধ শিল্পের সমঝদার স্বল্পসংখ্যক হওয়াই বাঞ্ছনীয়, সেখানে টলস্টয়কে আমরা দেখেছি অধিক সংখ্যক মানুষকে অনুপ্রাণিত করাই শিল্পের লক্ষ্য বলে 'টমকাকার কুটীর' 'খ্রীষ্টমাস ক্যারোল' ও শেমেনভের কৃষকজীবন-ভিত্তিক গল্পকে অনেক উচ্চে বসিয়ে শেক্‌স্‌পীয়র-গ্যেটে-বিঠোফেন-ভাগনারের মত শিল্পীদের তিরস্কার করেছে। মার্ক্সবাদী সমালোচকও বলেছেন সেই লেখকই মহৎ যিনি জটিল ও মূল্যবান সমাজ সমস্যাকে শৈল্পিক সারল্যে অগণিত মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করে দিতে পারেন। কিন্তু তার পরই বলেছেন—সেই শিল্পীও মহৎ যিনি অজস্র মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারেন অপেক্ষাকৃত সহজ বিষয়বস্তুর দ্বারা।[১৬] অর্থাৎ অধিক সংখ্যক মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করাই আসল ব্যাপার। বিষয়বস্তুর মূল্য আছে ঠিকই কিন্তু জটিল বা দুরূহ বিষয়ই মহৎ সাহিত্যে উপজীব্য এ বিশ্বাস তাঁদের নেই। লক্ষ্য করতে হবে তাঁরা বিষয়ের জটিলতা বা সারল্যে বিচলিত হন না, অথচ বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন এবং রূপকে বিষয়ের পর স্থান দিলেও কুরূপ অসাহিত্যকে শ্রেষ্ঠাসন দেন না। মার্ক্সীয় দর্শনের মূল তত্ত্ব-ভিত্তি থেকেই তাঁরা শিল্পের সমগ্র মূর্তি বলতে ভাব, বিষয়, রূপ সব কিছুকেই বুঝিয়েছেন। স্বয়ং মার্ক্স শেক্সপীয়র ও হাইনের কাব্য সাগ্রহে পাঠ করতেন। লেনিন ভালবাসতেন লেরমানতভ, পুশকিন এবং উগোর রচনা আর মাও-ৎসে তুঙ রচনা করেছেন অনেক সুখপাঠ্য কবিতা। মাও-ৎসে তুঙ ইয়েনান ফোরামের বক্তৃতায় পার্টি, বিষয়বস্তু ও জনগণ সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করলেও বলেছেন—সেই শিল্পের কোন ক্ষমতাই নেই যা রাজনীতির দিক থেকে প্রগতিশীল অথচ যার ভিতর শিল্পগুণের একান্ত অভাব।[১৭] লেনিনের আলোচনায় ও চিঠিপত্রে, Futurists সম্পর্কে প্রতিক্রিয়ায় এই একই বক্তব্য ছড়িয়ে আছে নানাভাবে। বস্তুতঃ মার্ক্সবাদী দার্শনিকেরা রূপবাদীদের থেকে পৃথকরূপে চিহ্নিত হয়ে আছেন মূলতঃ তাঁদের এই একটি বিশ্বাসের জন্য যে, জীবনের সত্য রূপায়িত হবে জনসাধারণের চাহিদা ও রুচি অনুযায়ী, শিল্পীর নিজস্ব চাহিদানুযায়ী নয়। নান্দনিক অনুভূতিকে মানবজীবনের অন্যান্য অনুভূতি থেকে পৃথক করে নিয়ে এবং সাধারণ পাঠক ও শ্রোতাদের সমর্থনের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে

রূপবাদী সাহিত্যিক ও তাত্ত্বিকেরা শিল্পের জগতকে এমন এক বিশিষ্ট জগতে পরিণত করেছিলেন যেখানে শিল্পীর নিভৃত শিল্পচর্চা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত রুচি বা ষ্টাইল-নির্ভর রূপ-নির্মাণ দক্ষতায় পরিণত হয়েছিল। কিন্তু এই রূপ-প্রাধান্য এক ধরণের স্বৈরাচার সৃষ্টি করে থাকে।

অন্তরের অনুভূতিকে বাইরে রূপদানের অজুহাতে সাহিত্যিক যদি এমন সাহিত্য নির্মাণ করেন যেখানে তিনি এবং মুষ্টিমেয় কিছু সমমতাবলম্বী ছাড়া আর কেউই প্রবেশাধিকার পান না তাহ'লে এই মুষ্টিমেয়ের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে রূপসর্বস্ব-সাহিত্যকর্মও কি শেষ হয়ে যাবে না? জাতির জীবনের একটি বিশেষ সামাজিক পরিবেশ, পরিপার্শ্ব এবং আরও নানাকিছু সাহিত্যে রূপলাভ করে থাকে। কিন্তু যেহেতু লেখকের 'Personal idiosyncrasy'কেই বিশেষ গুরুত্ব দিতে চান রূপবাদীর দল তা-ই শেষপর্যন্ত এঁদের রচনারীতি এবং সাহিত্যের রূপ এঁদের অনেক সময় জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এই বিচ্ছিন্নতাই রূপকৈবল্যবাদীদের প্রধান ত্রুটি। সুতরাং অধিক সংখ্যক মানুষকে তুষ্ট করাই শিল্পীর লক্ষ্য, মার্ক্সবাদীদের এই ইচ্ছার বিরুদ্ধে রূপবাদীদের বক্তব্য যা-ই থাক, মার্ক্সবাদীরা বিষয়ানুযায়ী রীতি ও রূপের সপক্ষে যে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন তার যাথার্থ্যে সংশয় নেই। কিন্তু রূপবাদী এবং মার্ক্সবাদীরা বিষয় ও রূপের দ্বন্দ্ব মেনে নিয়েই তাঁদের আলোচনা শুরু করেছেন। প্রবন্ধের প্রথমে উদ্ধৃত রবীন্দ্রনাথের উক্তিটিও রূপ ও বিষয়ের প্রভেদকে সমর্থন করছে।

'রূপের গৌরব' স্বীকার করতেন বলে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের রূপান্তরে বিশ্বাসী ছিলেন না। 'যাহা জ্ঞানের জিনিষ তাহা এক ভাষা হইতে আর এক ভাষায় স্থানান্তর করা চলে।·······কিন্তু ভাবের বিষয় সম্বন্ধে একথা খাটে না। তাহা যে মূর্তিকে আশ্রয় করে তাহা হইতে আর বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না।'[১৮] ভাব ও ভাষার সমবায় সম্পর্কে গড়ে ওঠা সাহিত্যরূপ যেহেতু একটি অখণ্ড-মূর্তি অতএব ভাষার পরিবর্তন মানেই সেই মূর্তিকে বিপর্যস্ত করা। ভাষান্তরিত সাহিত্যে মূলের অখণ্ডত্ব ও সৌন্দর্য অক্ষুন্ন থাকে না। শেলী ঠিকই বলেছিলেন: 'The plant must spring again from its seed, or it will bear no flower.' ভাষান্তরিত সাহিত্যে যদি মূল রচনার আস্বাদ এবং আনন্দ পাওয়া যেত তাহ'লে গদ্যে যে বক্তব্য একবার প্রকাশিত হয়েছে তাকে নিয়মিত ছন্দোবদ্ধ পঙক্তিতে বিন্যস্ত ক'রে সালংকৃত মূর্তিতে উপস্থাপিত করলেই

কবিতা বলে গণ্য করা সম্ভব হত। কিন্তু প্রাচীরলিপি ও বিজ্ঞাপন ছাড়া সর্বত্র যিনি শুধুমাত্র কবিতাই চোখে দেখেছেন সেই উদারমতাবলম্বী মালার্মে-ও বোধ হয় এমন কথা বলতেন না। গদ্যকবিতার সপক্ষে ওকালতি করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন (গদ্যকবিতা: ১৩৪৩ পৌষ) 'কাব্যের লক্ষ্য হৃদয় জয় করা, পদ্যের ঘোড়ায় চড়েই হোক আর গদ্যে পা চালিয়েই হোক'। এই মতের যাথার্থ্য যাই হোক, রবীন্দ্রনাথ, যিনি ভাষান্তরিত সাহিত্যের মাহাত্ম্যে বিশ্বাসী ছিলেন না, তিনি এই কথা নিশ্চয়ই জানতেন, একবার যে ভাবটি গদ্যে রূপায়িত হয়েছে তাকে কবিতার মূর্তিতে পরিবর্তিত করলেই তা কবিতা বলে গ্রাহ্য হবে না। কারণ কাব্য-সাহিত্যের রূপ তো ভাবের পোষাক-মাত্র নয় যে তাকে যথেচ্ছ গ্রহণ ও বর্জন করা সম্ভব। আসল কথা হচ্ছে, ভাব ইন্দ্রিয়গোচর হয় রূপের মাধ্যমে এবং রূপই হাত ধ'রে পাঠককে রসের জগতে পৌঁছিয়ে দেয়। অর্থাৎ ভাব ও বিষয়বস্তুর মতই রূপও সাহিত্যের অবিচ্ছেদ্য অন্তরঙ্গ উপাদান।

ঘ ।। রীতি ও 'স্টাইল'

ভাব ইন্দ্রিয়-গোচরতা লাভ করে রূপের মধ্যস্থতায়। রূপ বিশিষ্টতা লাভ করে সাহিত্যিকের রচনা-কৌশলে। সাহিত্যে এই কৌশলের নামই 'রীতি' বা 'স্টাইল'। যদিও বলা হল 'রীতি' বা 'স্টাইল' তবু 'স্টাইল' এবং ভারতীয় আলংকারিক-কথিত 'রীতি' সমার্থক নয়, কারণ লেখক ও তাঁর 'স্টাইলকে অভিন্ন রূপে গণ্য করার ব্যঞ্জনা রীতিতত্ত্বের মধ্যে ধরা পড়ে না। যেখানে বলা হয় বিশেষ ধরণের পদ রচনার কৌশলই রীতি এবং স্থান-নাম অনুসারে বৈদর্ভী, গৌড়ী ও পাঞ্চালী এই তিন নামে রীতিকে ভাগ করা হয় সেখানে লেখকের নিজত্বের ভূমিকা স্বীকৃত হয় কোথায়? লেখকের নিজত্ব বা তাঁর মনের প্রগতিকে স্বীকার করতেন না বলেই বামনাচার্য এ-মতের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন যে সর্বগুণাধার বৈদর্ভী রীতিতে কাব্যরচনায় উৎকর্ষ লাভের পূর্বে গৌড়ী বা পাঞ্চালী রীতিতে কোন কবি কাব্য রচনা শুরু করতে পারেন। যদিও তাঁর পূর্বসূরীদের থেকে বামনাচার্য পৃথক হয়ে এসেছিলেন অন্ততঃ একটি বিষয়ে যে, যেখানে পূর্বে শব্দার্থ শরীর-বিশিষ্ট কাব্যকে অলংকৃত মূর্তিতে উপস্থিত হ'তে

দেখলেই আলংকারিক তুষ্ট হত্তেন সেখানে বামনাচার্য বাহ্যরূপের অন্তরালে সন্ধান করেছিলেন 'কাব্যাত্মা'র এবং 'রীতি'কেই বলেছিলেন কাব্যের সেই আত্মা। এই বিশেষ ধরণের পদরচনার কৌশলের পিছনে তিনি যে রসসৃষ্টির অভিলাষকেও স্বীকার করেছিলেন তার প্রমাণ শব্দগুণ ও অর্থগুণের ভিতর 'কান্তি'কে স্বীকৃতি দানের মধ্যে। কিন্তু দেশধর্মে রীতিকে সীমাবদ্ধ করাই বামনাচার্যের প্রধান সীমা।

'রীতিবাদী' বামন 'দেশধর্মে'র সংকীর্ণ পরিসরে কাব্যরচনা কৌশলকে সীমাবদ্ধ করে ফেললেও বক্রোক্তিবাদী কুন্তকাচার্য তার ঘোরতর বিরোধিতা করে যেমন রীতির উত্তম, মধ্যম ও অধম ভাগকে অস্বীকার করলেন তেমনি অন্যদিকে 'কবি-প্রস্থান ভেদে' কবি-স্বভাবকে এবং একের সঙ্গে অপরের রীতিগত পার্থক্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে 'শক্তি', 'ব্যুৎপত্তি' ও 'অভ্যাসে'র গুরুত্বকে স্বীকার করে 'রীতি'কে বহিরঙ্গ ব্যাপারের ঊর্ধ্বে স্থাপন করলেন। রীতির ব্যাখ্যায় কুন্তকাচার্য পৌঁছেছিলেন পাশ্চাত্ত্য আলংকারিক-ব্যাখ্যাত স্টাইলের কাছাকাছি। তাঁর 'বক্রোক্তি' কোন বিশেষ অলংকার নয়, এ হচ্ছে 'ভণিতি-প্রকার' বা এক ধরণের প্রকাশ-কৌশল। কুন্তকাচার্য বিচ্ছিন্ন কোন শব্দ বা অলংকারে মনোনিবেশ না ক'রে সমগ্র উক্তিকে অখণ্ড তাৎপর্যদানের দ্বারা কবিভাষাকে এমন স্তরে উন্নীত করেছিলেন যেখানে দণ্ডী বা অন্য কোন অলংকার-বাদীর প্রবেশ ছিল না। মনে হয় ধ্বনিকার আনন্দবর্ধনের পরবর্তী অলংকারিক বলেই পৃথক কোন শব্দ অপেক্ষা সমগ্র একটি উক্তির উপরেই জোর দিতে চেয়েছিলেন কুন্তকাচার্য। কারণ যাই হোক, এ কথা তো সত্য যে 'বক্রোক্তি'কে 'বৈদগ্ধ্যভঙ্গীভণিতি' বলেছিলেন যে কুন্তক, কবি স্বভাবকে গণ্য করেছিলেন কবি-প্রস্থানভেদের কারণরূপে, তিনি কাব্যে কবিব্যক্তিত্বের অস্তিত্বকে সূক্ষ্মভাবে হলেও স্বীকার করে নিয়েছিলেন। ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রে অন্যত্র এর হদিস মেলে না। কাব্যে কবির অস্তিত্বকে প্রচ্ছন্নভাবে (কুন্তকাচার্যের) এই স্বীকৃতিদানে ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রের যুগান্তর ঘটেছিল। অবশ্য পাশ্চাত্ত্য অলংকার-শাস্ত্রের অন্যতম দুই গুরু অ্যারিষ্টটল ও লঞ্জাইনাস 'রচনাশৈলী' প্রসঙ্গে আলোচনায় লেখকের রচনারীতির শ্রেষ্ঠত্বের উপরেই নির্ভর করেছিলেন বহুকাল আগেই। অ্যারিষ্টটল বলেছেন, লেখকের রচনারীতির শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ মিলবে স্পষ্টতায়, স্বচ্ছতায়; তবে গতানুগতিকতার মধ্যে নয়। লেখকের রচনার গৌরব

গতানুগতিক প্রকাশভঙ্গিমায় নেই, এই কথা বললেও অ্যারিষ্টটল কিন্তু ব'লে দেন নি কোন্ রীতি বা মার্গ হবে অনুসরণীয়; কারণ, তাঁর বিশ্বাস ছিল 'A poetic coinage is a word which has not been in use among a people, but has been invented by the poet himself.'[৫] 'This is the one thing that cannot be learnt from any one else'[৬] অর্থাৎ কাব্যের ভাষা কবি-কর্তৃক আবিষ্কৃত এবং তা অপরের কাছ থেকে শেখাও যায় না। যে-ভাষা জনজীবন থেকে সংগৃহীত নয়, কবি-কল্পনা থেকে যার জন্ম সেখানে কবি এবং তাঁর ব্যক্তিত্বই প্রধান, স্থান বা কালের প্রভাব মুখ্য নয়। সুতরাং স্থান-নাম অনুসারে বিশেষ স্টাইলের নামও সম্ভব নয়। অ্যারিষ্টটলের পর লঞ্জাইনাস লেখকের চিন্তার সঙ্গে তাঁর আত্মপ্রকাশের ভাষাকেও অবিচ্ছিন্ন বলে গণ্য করে বললেন 'in discourse thought and diction are for the most part mutually interdependent'. এবং 'words finely used are in truth the very light of thought'[৭]। অ্যারিষ্টটল ও লঞ্জাইনাস রচনা-শৈলীকে কবির ব্যক্তিমানুষের অন্তর্গত ভাব ও চিন্তার সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সংযুক্ত করেছিলেন যে, মানতেই হবে পাশ্চাত্ত্য অলংকার শাস্ত্রের গুরুরা সাহিত্যকর্মকে কোন বিশেষ রীতি বা পদ্ধতির দৃষ্টান্তরূপে গণ্য করেন নি বা কোন বিশেষ মার্গকে অনুসরণীয় মনে করেন নি। সাহিত্যের সঙ্গে সাহিত্যিকের নিবিড়তম সম্পর্কই মানতেন তাঁরা।

অ্যারিষ্টটলের পরবর্তীকালে 'ডাইওনিসিয়াস অব্ হেলিকারনাস' (১ম খ্রীষ্টাব্দ) 'জাকজমকপূর্ণ', 'নিরলঙ্কার' ও 'সর্বজনবোধ্য' এই তিন শ্রেণীতে 'স্টাইল'কে ভাগ করেছিলেন। পরবর্তী শতকে ডেমেট্রিয়াসও ডাইওনিসিয়াস-এর দ্বারা স্বীকৃত বিভাগ তিনটি ছাড়াও চতুর্থ একটি শ্রেণীর 'স্টাইল' কল্পনা করলেন। নাম দিলেন আকর্ষণ-শক্তি সম্পন্ন 'স্টাইল'। কিন্তু এঁরা সে-ব্যাপারেও ভারতীয় রীতিবাদীদের পন্থা অনুসরণ করেন নি। এমন কি এঁদের 'গ্রীকস্টাইল' ও 'রোমানস্টাইল' নামগুলিও 'বৈদর্ভী', 'গৌড়ী' রীতির নামের সদৃশ নয়। আমরা দেখি ভারতীয় আলঙ্কারিকগণ যেখানে দেশ বা অঞ্চলের নামানুসারে রীতির নামকরণ করেন, সেখানে সাহিত্য বিচারে পাশ্চাত্ত্য আলংকারিক বলেন, হোমরীয় স্টাইল, ভেজিলীয় স্টাইল, শেক্স্পীয়রীয় স্টাইল বা মিল্টনীয় স্টাইল। অর্থাৎ 'স্টাইল'-এর নামকরণ করেন ব্যক্তিমানুষ হোমর, ভেজিল, শেক্স্পীয়র

বা মিল্টনের নামানুসারে। আবার ভারতীয় রীতিবাদী যেখানে বৈদর্ভী রীতিকেই বলেন সর্বশ্রেষ্ঠ, যাবতীয় গুণের (ওজঃ, প্রসাদ, শ্লেষ প্রভৃতি দশটি শব্দগুণ ও এই নামেরই দশটি অর্থগুণ) চরমোৎকর্ষ খুঁজে পান এই একটি মাত্র রীতিতেই এবং লাটীয় সমেত চারটি ভিন্ন রীতির অস্তিত্ব স্বীকার করেন না সেখানে পাশ্চাত্ত্য আলংকারিকেরা বিশ্বাস করেন সেরা লেখক মাত্রই বিশেষ স্টাইলের অধিকারী এবং কেউই অপরের স্টাইলের অনুকারী নন। তা-ই ভারতীয় সমালোচকেরা ('টীকাকার' বা 'ভাষ্যকার' বলাই ভাল) পৃথকভাবে কালিদাসের রীতি, ভবভূতির রীতি, শূদ্রকের বা বাণভট্টের রীতি নিয়ে আলোচনা করেন নি (যদিও কখনও আলোকপাত করতে চেয়েছেন মাধুর্য, প্রসাদ প্রভৃতি গুণের বিচারে এঁদের মৌলিক পার্থক্যের দিকে) ; কিন্তু পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য সমালোচনার জগতে ব্যক্তি-নামানুসারে যেমন হয়েছে স্টাইলের নামকরণ, তেমনি স্টাইলের দিক থেকেই চেষ্টা করা হয়েছে সাহিত্যিকদের ভিতর পার্থক্য নির্ণয়ের।

ব্যক্তির সঙ্গে স্টাইলের অবিচ্ছিন্ন ও নিত্য সম্পর্ক নিয়ে পাশ্চাত্ত্য আলংকারিকদের দীর্ঘকালীন ভাবনা ও সিদ্ধান্ত অবশেষে অষ্টাদশ শতকে ব্যুফঁ-র মুখে ভাষা পেল এইভাবে—স্টাইলই হচ্ছে স্বয়ং মানুষটি। লেখক-মানুষ ও তাঁর স্টাইল পরস্পরের পরিচায়ক, ব্যুফঁ-র বক্তব্য যেন ছিল তা-ই। কিন্তু 'মানুষ' বলতে যদি রুচি সমেত সমগ্র মানুষটিকে বুঝি তাহ'লে বিষয়নির্বাচনে এবং ভাষাগঠনেও লেখকের 'স্টাইল' ধরা পড়ে। অর্থাৎ শুধু একধরণের প্রকাশ-কৌশলই 'স্টাইল' নয়, একধরণের ভাবনাও স্টাইল। সন্দেহ নেই ভাষাকে যদি ভাবের প্রকাশক বলি, তাহ'লে লেখক তো শুধু ভাষাতেই ধরা পড়েন না, বিষয়বস্তু নির্বাচনে বা ভাবেও তাঁকে পাওয়া সম্ভব। সেখানেও তিনি ধরা দিয়ে থাকেন। হোমর এবং ভের্জিলের ভাব ও বিষয়বস্তু এক ছিল না বলেই তাঁদের প্রকাশের ঢঙ আলাদা। ঠিক সেই কারণেই শেক্স্পীয়রের নাটকের সঙ্গে শ'-এর নাটকের, মিল্টনের কাব্যের সঙ্গে ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের কাব্যের পার্থক্য। কিন্তু 'স্টাইল'কে এইভাবে বিশ্লেষণ করলে 'স্টাইল' শব্দের অর্থব্যাপ্তি ঘটে। এই অর্থব্যাপ্তির দৃষ্টান্ত স্ট্রাবোর এই মন্তব্য—যদি ভালো মানুষ না হ'ন তাহ'লে কারুর পক্ষে ভালো কবি হওয়াও সম্ভব নয়।[৫] স্ট্রাবো-র এই মন্তব্যের বীজ ছিল প্লেটো-র 'রিপাব্লিক'-এ যেখানে শৈল্পিক চমৎকারিত্বকে শিল্পীর ব্যক্তিচরিত্রের উৎকর্ষের

সঙ্গে তিনি কার্য-কারণ সম্পর্কে যুক্ত করেছিলেন। প্লেটো বা স্ট্রাবো-র এই ধারণা পাশ্চাত্ত্যে প্রভাব বিস্তার করেছিল দীর্ঘকাল।

এলিজাবেথীয় যুগের সমালোচক পুটেনহাম যদিও 'স্টাইল'কে কবিতার অলংকার বা বাহ্যশোভাকর পোষাকের তুল্য মনে করেছিলেন, তথাপি ব্যক্তি-চরিত্রের সঙ্গে স্টাইলের সম্পর্কের অতিনিবিড়তা বোঝাতে গিয়ে বলেছিলেন, ব্যক্তিমানুষ যদি রাশভারী হ'ন তাহলে তাঁর রচনাও হবে গম্ভীর ঢঙের এবং যদি তিনি নম্র হন তাহ'লে তাঁর ভাষা এবং 'স্টাইল'ও হবে বিনীত বা নম্র" (পুটেনহাম আরও কিছুটা অগ্রসর হয়ে শুধু ভাষা নয়, বিষয় নির্বাচনেও লেখকের মনের সক্রিয়তা লক্ষ্য করেছিলেন)। ব্যক্তিমানুষের সঙ্গে তাঁর সৃষ্টির, রচয়িতার সঙ্গে রচনার এই অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আবিষ্কারের চেষ্টা অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত পাশ্চাত্ত্য সমালোচনা-সাহিত্যে চলেছিল ব্যাপকভাবে। ড্রাইডেন তাঁর প্রবন্ধে হোমরের সঙ্গে ভের্জিলের, ওভিদের সঙ্গে চসারের চরিত্রগত পার্থক্য থেকেই তাঁদের উভয়ের সাহিত্যকর্মের পার্থক্য নির্ণয় করতে চেয়েছিলেন। রচনা-কৌশলের মধ্যে লেখকের ব্যক্তিচরিত্রের প্রতিবিম্ব অবশ্যই চোখে পড়বে এই ধারণাকে স্বতঃসিদ্ধরূপে গ্রহণ ক'রে সপ্তদশ শতকের শেষার্ধে (১৬৬৮) টমাস প্রাট 'আব্রাহাম কাউলে'র জীবনী ও রচনা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর বিভিন্ন বিষয়বস্তু বিভিন্ন ঢঙে লেখার জন্য কিছুটা বিস্ময়ের সঙ্গে বলেছিলেন, খুব কম লেখকই বিচিত্র বিষয় এমন বিচিত্র স্টাইলে রচনা করতে পেরেছেন। কিন্তু তার পরই বলেছেন, রীতিগত বৈচিত্র্য সত্ত্বেও মানতে হবে একই মনের অস্তিত্ব আছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। অর্থাৎ রীতিগত বৈচিত্র্য মনের সঙ্গে অনৈক্য-প্রসূত নয়। এই ভাবে রচনার মধ্যে সর্বত্র রচয়িতার চরিত্রকে সন্ধান করা অথবা রচয়িতার ব্যক্তি-চরিত্র পর্যালোচনা করে তাঁর রচনায় সেই ব্যক্তিজীবনের হুবহু প্রতিবিম্ব সন্ধান করা ইংরেজী সাহিত্যের রোমান্টিক যুগেও বেশ কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছিল। ভাবের স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশই কাব্য, বলেছিলেন ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ। কাব্য যদি তাই হয় তাহ'লে প্রথমতঃ কবির ব্যক্তিমানসই তাঁর সাহিত্যবিচারের সময় প্রধান সহায় হয়, এবং দ্বিতীয়তঃ রচনাকৌশলকেও স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞান করে তার চর্চার দিকটা অস্বীকার করা হয়। এখানে একবার অ্যারিষ্টটলের মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে যিনি স্পষ্টতা ও সহজবোধ্যতার পক্ষে সুপারিশ করলেও লোকমুখের ভাষাকেই কাব্য-পদবীতে উন্নীত করতে

চান নি। অথচ ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ লোকমুখের ভাষাকেই কাব্যে সাদরে বরণ করতে চেয়েছিলেন। এই ধারণার বিরুদ্ধে কোল্‌রিজ আপত্তি না তুলে পারেন নি এবং তার প্রতিক্রিয়ায় ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ কোল্‌রিজের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন যথেষ্ট। মনে হয় ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রমুখ কাব্য রচনাকৌশলে লেখককে নানাভাবে সন্ধান করলেও সাহিত্যিকের যে একটা চর্চার দিক আছে সেই সত্য সম্পর্কে সচেতন বা সতর্ক ছিলেন না। অ্যারিষ্টটল 'মেটাফোর' প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন,—লেখকের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটে 'মেটাফোর' রচনার কৌশলের মধ্যে এবং তা সৃষ্টির জন্য অপরের কৃপাপ্রার্থী হওয়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ 'মেটাফোর' কবিহৃদয়ের গভীর থেকে জন্ম নিচ্ছে, যেখানে শিক্ষা সামাজিক পরিবেশ কোনরকম স্পর্শ রাখতে পারে না। কিন্তু একথা কি সত্য যে অপরের সাহায্যপুষ্ট না হয়েও ক্রমান্বয় চর্চার দ্বারা কোন লেখক তাঁর রচনারীতিকে পরিশীলিত করতে পারেন বা করা সম্ভব? বিশেষ করে এসত্য তো প্রমাণিত যে, দীর্ঘজীবী কোন লেখকের প্রথম জীবনের স্টাইলের সঙ্গে তাঁর জীবনের শেষ-পর্যায়ের সাহিত্যকর্মের স্টাইলের দিক থেকে পার্থক্য ঘটে থাকে প্রচুর। পূর্বে যে-কালে একটি মানুষ সমগ্র জীবনের সাধনায় একখানি বৃহৎ মহাকাব্য রচনা করতেন সেকালে লেখকের ভাব ও ভাবনার পরিবর্তনের স্তর অনুসরণ করার কোন উপায় ছিল না। সুতরাং একখানি রচনাই একজন স্রষ্টার মহিমা প্রচার করত। কিন্তু যখন যুগটা এল নাটকের, উপন্যাসের ও গীতিকবিতার তখন যেহেতু যে-কোন লেখনীই সামর্থ্য থাকলে বহু প্রসবিনী হতে পারে অতএব রীতির দিক থেকে একই মানুষের রচনায় বৈচিত্র্য আশা করা যায় না কি? অতএব আব্রাহাম কাউলী সম্পর্কে টমাস প্রাট-এর বিস্ময় ও শ্রদ্ধা একালে তেমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় না। তাছাড়া কাউলী সম্পর্কে যখন প্রাট এই বিস্ময়ে প্রকাশ করছেন তার অনেক আগেই শেক্‌স্‌পীয়র তাঁর নাটকে পদ্য ও গদ্যের মিশ্রণ ঘটিয়ে বিপরীতের একত্র সমন্বয় সাধন যে গুণী শিল্পীর হাতে অনায়াসে সম্ভব তা দেখিয়ে দিয়েছিলেন। একালে আমরা দেখেছি একই সৃষ্টিতে যেমন বিভিন্ন রীতির মিলন ঘটতে পারে, তেমনি একই লেখক বিভিন্ন রীতি অনুসরণ করতে পারেন তাঁর জীবনের একই পর্বে। নাটক, গীতিকবিতা, ছবি একই সময় উপজীব্য হচ্ছে একজন শিল্পীর, এ দৃষ্টান্ত দুর্লভ নয়। এখন আমরা বিশ্বাস করি—কোন শিল্পীকে তাঁর বিশেষ এক ধরণের সৃষ্টিতে সমগ্রভাবে পাওয়া

যায় না। শিল্পী পিকাশো 'কিউবিজম' ও 'ন্যাচারালিজম'-এর প্রভাবে দু'-জাতের ছবিই সৃষ্টি করছেন অপূর্ব পারদর্শিতায়, তা এই যুগের শিল্পরসিকেরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন। সুতরাং বিশের কোন একটিমাত্র রীতির ক্ষেত্রেই একজন শিল্পীর চূড়ান্ত পরিচয় কামনা করবেন না একালের দর্শক বা পাঠকেরা। অতএব এক্ষেত্রে একটি বিশেষ রীতিতে রচিত সাহিত্যে সাহিত্যিকের ব্যক্তিত্বের সন্ধান 'স্টাইল' শব্দের অব্যাপ্তি দোষ ঘোষণা করে।

একালে কোন লেখকের 'স্টাইল' সম্পর্কে আলোচনা কালে বিচ্ছিন্নভাবে একক ব্যক্তির স্টাইলের পরিবতে লেখকের যুগজীবন ও জাতি-পরিচয় গ্রহণের চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। লেখককে ধরা হয় সমাজের আর সকলেরই অন্যতম একজন হিসেবে। যেকালে পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশ সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক লেনদেনে ধীরে ধীরে কাছাকাছি আসছে, প্রাচীন পদ্ধতির গোষ্ঠী ভাবনা বিধ্বস্ত হয়ে পড়ছে, সেকালে স্রষ্টা কোন-না কোন ভাবে তাঁর পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এমন 'স্টাইল'-এ সাহিত্যচর্চা করতে পারেন যেখানে তাঁর ব্যক্তিত্বের মুদ্রণই প্রধান হয়ে থাকে না। অর্থাৎ কারুর নিজস্ব স্টাইলের উপর বাইরের প্রভাব থাকা অস্বাভাবিক নয়। আবার একই পরিবেশে পুরুষের সাহিত্য রচনা পদ্ধতির সঙ্গে নারীর রচনা পদ্ধতির, ধর্মবিশ্বাসীর সঙ্গে মানববাদীর রচনা পদ্ধতির বিভিন্নতা চোখে পড়ে। সুতরাং এক গোষ্ঠীর সঙ্গে অপর গোষ্ঠীর এবং এক গোষ্ঠীরই কিছু ব্যক্তির অন্য অনেক জনের রচনারীতির পার্থক্য ঘটে থাকে বা ঘটতে পারে বলে বিশ্বাস করেন একালের সাহিত্য-সমালোচকেরা। প্রকৃতপক্ষে এক ধরণের 'স্টাইল' একজন সাহিত্যিকের বিশেষ এক সময়ের বিশেষ এক ধরণের সাহিত্যকর্মকেই শুধু চিহ্নিত করতে পারে মাত্র। লেখকের সারস্বত সাধনার শাশ্বত পরিচয়-জ্ঞাপক স্টাইল বলে কিছু নেই। সুতরাং কোন ব্যক্তি বা রচনা সম্পর্কে বিচারের পূর্বে 'স্টাইল' বিষয়ে পূর্বে গৃহীত সিদ্ধান্তই চিরস্থির করে রাখা যায় না। স্টাইলের মধ্যে যদি লেখকের মনের ভূমিকার সক্রিয়তা স্বীকার করা হয় তাহ'লে মন যেখানে বিবর্তনশীল সেখানে লেখকের কোন বিশেষ স্টাইল অপরিবর্তনীয় ও ধ্রুবরূপে চিহ্নিত হবে কি করে? অতএব কোন ব্যক্তিনামে 'স্টাইলের নাম চিহ্নিত করার প্রবণতা যথেষ্ট যুক্তিগ্রাহ্য নয়। তাছাড়া স্টাইলের ভিতর যারা ব্যক্তিকে সন্ধান করেন তাঁরা অনেক সময় ভুলে যান যে প্রয়োজনানুযায়ী স্টাইলের পরিবর্তন ঘটতে পারে

এবং এই পরিবর্তন লেখকের সজীবতাই প্রমাণ করে।

'স্টাইল' সম্পর্কিত আলোচনায় অনেকসময় সমস্যা সৃষ্টি করে সমালোচকের অজ্ঞতা ও সহিষ্ণুতার অভাব। সমালোচকের সচেতনতা ও ধৈর্যের অভাবে ডাউটির 'Travels in Arabia Deserta' সুদীর্ঘ বত্রিশ বছর পর দ্বিতীয় সংস্করণের মুখ দেখেছে। তা-ও সম্ভব হত না যদি এড্ওয়ার্ড গার্নেট এবং অক্স্ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু আগ্রহী ছাত্রের উৎসাহ না থাকত। ডাউটির রচনারীতির কৃত্রিমতা, কর্কশতা ও অপ্রচলিত শব্দের ব্যবহারই নাকি তাঁর সম্পর্কে সমালোচকদের বিরাগের কারণ। কিন্তু মনে রাখা উচিত সব রীতিই যেহেতু অল্পবিস্তর কৃত্রিম' অতএব যদি লেখকের অকৃত্রিম অনুভূতির সঙ্গে প্রকাশের ঢঙ বা 'idiosyncrasy of expression' সুসমন্বিত হয়, তা হলে অপরিচিত বলে কোন রচনারীতিকে বর্জন করা অনুচিত।

ওয়াল্টার পেটার সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, সাহিত্যের 'স্টাইল' যদিও সাহিত্যিকের স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর বহন করে তবু তা যেন 'mannerism'-এ পরিণত না হয়। পাশ্চাত্ত্য তাত্ত্বিকদের কাছে 'স্টাইল' যে নিতান্তই ব্যক্তিক নয় তার প্রমাণ আছে 'ফর্ম' এবং 'সাবজেক্ট ম্যাটার'-এর (বা এক কথায় expresion) তথা উপাদান সমূহের বৈচিত্র্যময় মিশ্রণের ফলে উদ্ভূত এক একটি রীতির নামকরণে। যেমন তাঁরা বলেন 'ক্লাসিকাল আর্ট', 'রোমান্টিক আর্ট', 'অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট' অথবা 'ট্রাজিক স্টাইল', 'ক্লাসিক স্টাইল' ইত্যাদি। যদিও এই সমস্ত পদ্ধতিগুলি অচল-অচল শ্রেণীতে বিভক্ত নয় তবু মাঝে মাঝে বিশেষ বিশেষ রচনার উপর এই সমস্ত নামের তকমা এঁটে দিয়ে সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের ভিতর পার্থক্য নির্ণয়ের চেষ্টা করা হচ্ছে বেশ কিছুকাল ধরে। 'ক্লাসিকাল স্টাইল' বা 'রোমান্টিক স্টাইল' বলতে আমরা যেমন ব্যক্তিবিশেষের স্টাইল বুঝি না তেমনি অনেক সময় বিশেষ কালের 'স্টাইল'ও বুঝি না (যদিও 'রোমান্টিক যুগ' ও 'ক্লাসিক্যাল যুগ' বলতে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য সমন্বিত এক একটি যুগকে বুঝি)। সেক্ষেত্রে 'স্টাইল' বলতে বিশেষ ধরণের ভাব, ভাষা ও রচনা পদ্ধতি একত্রে বুঝে থাকি।

সম্প্রতি 'স্টাইল' সম্পর্কিত আলোচনায় পাশ্চাত্ত্য সমালোচকেরা বিশেষভাবে উন্মুখতা দেখাচ্ছেন ভাষার দিকে। যুগ ও সমাজের পরিবর্তন, এঁদের মতে, সাহিত্যের ভাব অপেক্ষা ভাষার উপর প্রভাব বিস্তার করে বেশি। সুতরাং কাব্যের ইতিহাসের গবেষক যিনি, এঁদের তত্ত্ব অনুযায়ী, তাঁর আগ্রহী হওয়া উচিত

প্রধানতঃ ভাষাতাত্ত্বিক পরিবর্তনের ধারাবাহিকতার দিকে।[৮] দেখা যাচ্ছে, সাহিত্যে এই জাতীয় গবেষণা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে প্রথমতঃ কাব্যের জগতে এবং দ্বিতীয়তঃ ইতিহাসের সেই পর্বে যখন কোন দেশে নানাকারণে বিভিন্ন ধরণের ভাষারীতির উদ্ভব ঘটেছে। কিন্তু এই পদ্ধতির দিকে অতিরিক্ত মনোযোগের ফলে অনেক সময় সাহিত্যের যে ভাষাতাত্ত্বিক সমস্যা ছাড়াও অন্য কিছু থাকতে পারে সে ব্যাপারে অমনোযোগ সৃষ্ট হয়। সমালোচকদের মতে এই ধরণের Stylistic বিশ্লেষণ সাহিত্যবিচারে লাভজনক ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে তখনই, যখন 'it can establish some unifying principle, some general aesthetic aim of a whole work.'[৯] কিন্তু এই পদ্ধতিতে ক্রোচের মত যাঁরা শিল্পের স্বজ্ঞা ও প্রকাশ, রূপ ও বিষয়ের কোন ভেদ স্বীকার করেন না তাঁরা তুষ্ট হবেন না এবং যাঁরা বিশেষ ধরণের রচনারীতির সঙ্গে স্রষ্টার মানসিকতার অবিচ্ছিন্ন নিত্যসম্পর্ক সন্ধান করেন তাঁরাও ব্যর্থ হতে বাধ্য। দেখা যায়, লেখকের রচনারীতির সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যকে যাঁরা ঐক্যবদ্ধসূত্রে বিচার করতে উৎসাহী হন তাঁরাও যেমন একধরণের যান্ত্রিক পদ্ধতির কৃত্রিমতার ব্যাধিতে ভোগেন, তেমনি যাঁরা আধুনিক Stylistic পদ্ধতিতে সাহিত্যবিচার করেন তাঁরাও মাত্রা অতিক্রম করলে গাণিতিক পদ্ধতি ব্যাবহারজনিত অতিসরলী-করণের ত্রুটিতে ক্ষতিগ্রস্ত হ'ন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এক কুন্তকাচার্য ছাড়া অধিকাংশ ভারতীয় রীতিবাদিগণ যেখানে সাহিত্যিকের ব্যক্তিত্ব বিস্মৃত হয়ে বিশেষ গুণ ও রীতির প্রচলিত কাঠামোর মধ্যে ফেলে সাহিত্যবিচারে অগ্রসর হয়েছিলেন সেখানে সাহিত্যে সাহিত্যিকের ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন সন্ধান ক'রে অথবা সাহিত্যের ভাষায় যুগ ও সমাজের প্রভাব নির্ণয় ক'রে সৃষ্ট এবং স্রষ্টা উভয়ের মর্যাদাই স্বীকার করেছেন পাশ্চাত্ত্য শিল্পতাত্ত্বিকেরা। অতএব 'স্টাইল'-তত্ত্ব আলোচনার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্ত্য শিল্পশাস্ত্রীদের শ্রেষ্ঠত্ব সংশয়াতীত।

৩ । বি শ্বা স ও আ ন ন্দ

ক ॥ ভাববাদ

প্রতিভা দেবদত্ত সামগ্রী ; কবিরা দৈবানুপ্রেরিত জাগতিক দায়দায়িত্বহীন মুক্তপক্ষ বিহঙ্গসদৃশ—এই বিশ্বাস থেকে কবিকে দিব্যোন্মাদ ও কবিতাকে ইহ-লৌকিক সম্পর্কশূন্য বলে ঘোষণা করেছিলেন যে-প্লেটো পাশ্চাত্ত্য শিল্প-সাহিত্যের জগতে তিনি ভাববাদের জনকসদৃশ। অথচ এই প্লেটোই কবিকে মানবজীবনে 'প্যাশন'-এর জাগরণ ও বিবৃদ্ধি ঘটানোর অভিযোগে তাঁর আদর্শরাষ্ট্র থেকে বিতাড়িত করার পক্ষপাতী ছিলেন। তা ছাড়া যেহেতু কাব্যের সত্য মূল সত্য থেকে তিনধাপ দূরবর্তী এবং 'আইডিয়া'র জগৎই একমাত্র সত্য, অতএব মানবজীবনের সত্যের অপলাপকারী ও মিথ্যাচারী কবির কোন সদর্থক ভূমিকা খুঁজে পান নি প্লেটো। তবে তাঁর 'রিপাব্লিক' গ্রন্থের তৃতীয়খণ্ডে তিনি যে দু'জাতের কবির কথা বলেছেন—পুরাঘটিতের বর্ণনাকারী এবং পুরাঘটিতের অনুকারী—তার মধ্যে দ্বিতীয়শ্রেণীর কবি বা ট্রাজেডি রচয়িতাদের বিরুদ্ধেই তাঁর ক্ষোভ ছিল সর্বাধিক। কিন্তু যিনি কবিকে একবার দৈবানুপ্রেরিত বলেছেন, তিনিই আবার মানবজীবনে কবির ভূমিকায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন! কেন এই বৈপরীত্য? মনে হয়, এর কারণ হচ্ছে কবির সঙ্গে দার্শনিকের বা কবির সঙ্গে নীতিবিদের সনাতন দ্বন্দ্ব। ভালো-মন্দ, আনন্দদায়ক-দুঃখজনক সবরকম ভাব নিয়েই যেখানে কবির কারবার সেখানে শুধু সৎ বা মঙ্গলজনক রূপ নির্মিতিতেই কবির সিদ্ধিলাভ, এ সিদ্ধান্ত নীতিজ্ঞের হতে পারে, সাহিত্যিকের নয়। কিন্তু কবি-প্রাণ প্লেটো তাঁর সমকালীন গ্রীকজীবনে ট্রাজেডি-রচয়িতাদের প্রভাব লক্ষ্য করেই বোধ হয় সৎ-নাগরিকত্ব লাভের পরিপন্থী কাব্য-সাহিত্যের জন্য তাঁর কল্পিত আদর্শ রাষ্ট্রে কোন স্থান রাখেন নি।

প্লেটো তাঁর 'রিপাব্লিক'-'সোফিষ্ট'-'আয়ন'-'মেনো'-'ফিড্রাস'-এ সাহিত্য এবং সৌন্দর্য নিয়ে যে সমস্ত মন্তব্য করেছেন তা থেকে এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয় যে, প্লেটো সাহিত্যকে প্রকৃত সত্য নয়, সত্যের প্রতিরূপের নির্মাণ বলে গণ্য

করেছিলেন। সত্য হচ্ছে সেই 'আইডিয়া' যে-আইডিয়ার প্রতিবিম্ব এই জগৎ এবং জাগতিক বস্তু। কবিরা এই জগৎ থেকে যে-সমস্ত উপাদান নিয়ে কাব্য রচনা করেন সেই উপাদানগুলিও যেহেতু মূল সত্যের ছায়ামাত্র, অতএব কবিরা 'সত্য' থেকে সরে যান বেশ কয়েক ধাপ দূরে। সুতরাং মূলের সঙ্গে ছায়ার ছায়ার যে পার্থক্য 'আইডিয়া' বা প্রকৃত সত্যের সঙ্গে সাহিত্যের সত্যের পার্থক্য ততটুকু। এই রূপরসময় জগতের জন্ম-কারণ রূপে অনৈসর্গিক কোন অপ্রাকৃত সত্তার অস্তিত্ব সম্পর্কে প্লেটো-র এই সিদ্ধান্তই সৌন্দর্য সম্পর্কে তাঁকে এই মত প্রকাশে উৎসাহিত করেছিল—'the deformed is always inharmonious with the divine, and the beautiful harmonious'[১] স্বর্গীয় সত্যের সঙ্গে সুসমঞ্জস যা, তা-ই যদি হয় সুন্দর, তাহ'লে প্লেটো-র 'সৌন্দর্য' এমন একটি নিরুপাধিকগুণ যা কোন বস্তু-বিশেষের নিজস্ব ধর্ম নয়। 'সৌন্দর্য'কে প্লেটো-র দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে সৌন্দর্যের জগতে কোন একটি বস্তুর সঙ্গে অন্যবস্তুর পার্থক্য লুপ্ত হয়ে যায়। প্লেটো এই পার্থক্য অস্বীকার করেই সুন্দরের উৎসরূপে এক স্বর্গলোক কল্পনা করেছেন, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুপৃথিবীতে যার দিব্য-বিভা মাঝে মাঝেই প্রতিবিম্বিত হয়। সুতরাং জাগতিক 'সুন্দর' ও 'সাহিত্য' প্লেটোর কাছে প্রকৃত সুন্দর নয়, সত্যও নয়, সুন্দর ও সত্যের ছায়ামাত্র। প্রাত্যহিক জগতের উর্ধ্বে সবকিছুর উৎসরূপে ভিন্ন এক অখণ্ড আদর্শলোকের এই কল্পনাই প্লেটোর ভাববাদের ভিত্তি। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে নিও-প্লেটোনিক দার্শনিক প্লোটিনিউ (Plotinus : 204-70 A. D.) প্লেটোর 'আইডিয়া'র অনুরূপ সর্বকর্মের উৎসরূপে 'One' বা পরম একের অস্তিত্ব কল্পনা করলেন। তবে পার্থক্য এইখানে যে, প্লেটো সমস্ত পার্থিব বস্তুর পিছনে সনাতন একেকটি আদর্শের কল্পনা করায় তাঁর 'আইডিয়া' একবচনে সীমাবদ্ধ না থেকে বহুবচন 'আইডিয়াজ'-এ পরিণত হয়েছিল আর প্লোটিনিউ যে 'পরম একে'র কথা বলেছেন সেই এক-বচনাত্মক 'One'ই সব কিছুর উৎস। এই 'এক' থেকে সৃষ্টি হচ্ছে বিশ্বাত্মা ('world soul' বা 'mind') এবং সেই 'বিশ্বাত্মা' থেকে জন্ম নিচ্ছে 'আত্মা' (soul) আর 'আত্মা'ই পার্থিবজগৎ (বা দেহ)-কে নির্মাণ ক'রে তাতেই নিবিষ্ট হয়ে আছে। মানবজীবনের লক্ষ্য সেই 'এক', যাকে লাভ করতে হবে দৈহিক কামনা জয় করে আধ্যাত্মিক শক্তির উন্নতির দ্বারা। সুতরাং 'পরম এক'-এর অন্বেষণে ধাবিত মানুষ যে-সুন্দরের জন্মদাতা সেই সুন্দরও

'পরম সুন্দর' এবং 'পরম মঙ্গল'-এর সঙ্গে সম্পর্কিত। কিন্তু যাকে বলা হচ্ছে মূল বা পরম সৌন্দর্য (original beauty) তা-ই পার্থিব সুন্দরে পরিণত হয় না। বস্তুর উপরিতলের বাধা ভেদ করে পরমসুন্দরের আলোকরেখা জাগতিক বস্তুকে 'সুন্দর' করে থাকে। প্রকৃত 'সুন্দর' রয়েছে 'সৌন্দর্য'কে আবৃত করে এবং অতিক্রম করে। সুন্দর এবং তদ্রূপ কুৎসিতের পিছনেও তার উৎসরূপে এক প্রাথমিক স্তরের 'সুন্দর' এবং 'অসুন্দরে'র অস্তিত্বের কল্পনাই নিও-প্লেটোনিক 'প্লোটিনিউ'-র ভাববাদের মূল কথা। এই দৃষ্টিকোণ থেকে 'প্লোটিনিউ' শিল্পকে ব্যাখ্যা করেছেন 'Higher reality'-র প্রতিবিম্ব এবং 'Lower reality'-র পরিশোধিত মূর্তি রূপে। শিল্প ও সৌন্দর্যের ব্যাখ্যায় উৎসরূপে 'পরম এক'-এর অস্তিত্ব অনুমান করে তাকে 'Higher reality' রূপে অভিহিত করে জাগতিক সত্য বা 'Lower reality' তে তার প্রতিচ্ছবি সন্ধান প্লেটো-র ভাববাদী দর্শনেরই প্লোটিনিউ-কৃত নতুন ব্যাখ্যা বলে মনে হয়। এই জাতীয় ভাববাদকে চিহ্নিত করা হয়েছে 'Objective Idealism' নামে। প্রাচ্যের বেদান্ত ও কনফুশীয় দর্শনই এই 'Objective Idealism'-এর প্রবক্তা এবং পাশ্চাত্যে এই শ্রেণীর ভাববাদের গুরু হচ্ছেন প্লেটো। ভারতীয় বেদান্তদর্শনের দুটি রূপান্তর ঘটে শঙ্করের অদ্বৈতবাদে (৮ম শতক) এবং রামানুজাচার্যের (১১-১২শ শতক) বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে। ব্রহ্ম ছাড়া সমস্ত জগৎকে মায়ারূপে কল্পনা শঙ্করের অদ্বৈতবাদের মূল কথা। কিন্তু রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে জগৎ, আত্মা এবং ঈশ্বর তিনের অস্তিত্ব স্বীকার করে বলা হয়েছে জাগতিক কামনা-বাসনা থেকে ব্যক্তির মুক্তির জন্য প্রয়োজন জ্ঞান, ঈশ্বর-কৃপা এবং আত্মা-র সহায়তা। ঈশ্বর ছাড়া বস্তু ও আত্মার অস্তিত্ব নেই এবং তিনিই বস্তু বা দেহ এবং আত্মার পরিচালক। প্লেটোনিক ভাববাদকে অনেক সময় অদ্বৈতবাদসদৃশ বলেই মনে হয়। যদিও প্লেটো-র 'আইডিয়া' এবং শঙ্করের 'ব্রহ্ম'ই একমাত্র সত্য তবু শঙ্কর যেখানে ইহলৌকিক বস্তুনিচয়কে বলেছেন 'মায়া', প্লেটো সেখানে এই জগতে মূল যে সত্য সেই 'আইডিয়া'-র প্রতিবিম্ব লক্ষ্য করেছেন ; অতএব জগৎ তাঁর কাছে 'ইল্যুশন' নয় 'অ্যাপিয়ারেন্স'। 'ইল্যুশন' হচ্ছে যাদুকরের কৌশলের মত ; দর্শকের ভ্রান্তিলোকেই তার প্রকৃত সত্যতা। অতএব প্লেটো শিল্প-সাহিত্যের রহস্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অনেকটা ভারতীয় অদ্বৈতবাদীদের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। বিশেষতঃ যখন তিনি Symposium-এ লেখেন, 'For God

mingles not with men; but through Love all the intercourse and converse of God with man, whether awake or asleep is carried on,'[৫] তখন বৈষ্ণবের প্রেমভক্তির মহিমাকীর্তনই শুনি যেন। এই কথাই রবীন্দ্রনাথের কাছে শুনেছিলাম: 'জগতের সৌন্দর্য অসীম সৌন্দর্যকে ডাকিতেছে। তিনি পাশে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। জগতের সৌন্দর্যে তিনি যেন জগতের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া বাঁধা পড়িয়াছেন।.........অসীম ও সসীম এই সৌন্দর্যের মালা লইয়া মালা-বদল করিয়াছেন। তিনি তাঁহার নিজের সৌন্দর্য ইহার গলায় পরাইয়াছেন, এ আবার সেই সৌন্দর্য লইয়া তাঁহার গলায় তুলিয়া দিতেছে। সৌন্দর্য স্বর্গ ও মর্ত্যের বিবাহ বন্ধন'।[৬]

'প্রেম'কে মানুষ ও ঈশ্বরের সংযোগসেতু বলে যে তত্ত্ব-সূত্র প্লেটো ধরিয়ে দিয়েছিলেন, ইতালীয় রেনেশাঁস যুগের নিও-প্লেটোনিক দার্শনিক 'Symposium'-এর ভাষ্যকার মার্সিলিও ফিসিনো তাকে বিস্তারিত করেন। তিনি বলেছেন, শিল্প-সাহিত্যের জগতে প্রেমই শিল্পকর্মের পরিচালক ও শাসক। শিল্পী তাঁর শিল্পকর্মকে সপ্রেমে রূপায়িত করেন। আবার এই প্রেম-দৃষ্টি নিয়েই শিল্প এবং শিল্পরসিক উভয়কেই লক্ষ্য করেন শিল্পী।—'There is, then, this fact, that artists in each of the arts seek after and care for nothing but love,'[৭] সুতরাং প্রেম থেকে শিল্পসৃষ্টি এবং প্রেমই শিল্পের জগতে শিল্পী ও রসিকের পরম প্রাপ্তি। শিল্প-সাহিত্যের জগতের নিয়ামক শক্তি এই যে প্রেম সেই আদিকালেই বিশৃঙ্খলা থেকে পৃথিবীকে সুশৃঙ্খল মূর্তি দান করেছিল সে। কিন্তু সে বিদেহী। রূপের পরিমাণ বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিন্যাসের উপর প্রেম নির্ভর করে না। প্রেম সন্ধান করে সৌন্দর্যকে। সৌন্দর্য প্রেমের মতই রঙ ও রূপ, আকৃতি ও বর্ণের যথাযথ বিন্যাসের উপর নির্ভর করে না। দেহ-সম্পর্কহীনতাই সৌন্দর্যের স্বরূপ। আবার যেহেতু সৌন্দর্য দেহ-সম্পর্কহীন অতএব বস্তুর কলঙ্ক স্পর্শ করে না তাকে এবং সুন্দর বস্তু অসীমের তাৎপর্যবহ। ফিসিনো শিল্পের জগতে প্রেম ও সুন্দরকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন যার ফলে প্লেটো-র ভাববাদকে স্পষ্টই তিনি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে পরিণত করেন। বস্তুত: প্রেমকে স্বীকার করা মানেই দুটি পক্ষকে স্বীকার করা এবং সেক্ষেত্রে কেউই 'মায়িক' বা 'কাল্পনিক' নয়। আবার দুটি পক্ষকে স্বীকার করা হলেও তাদের অদ্বৈতসত্তাকেই কার্যতঃ স্বীকৃতি দিতে হয় কারণ 'প্রেম'-এর

জগতে কোন ভেদবুদ্ধিই সমর্থিত নয়। এই অদ্বৈতসত্তারই পরিচয় আছে হেগেল-এর 'Idea'-তে, যার অবস্থান দ্বন্দ্ব-বিক্ষুব্ধ জগতের ঊর্ধ্বে এবং প্রকাশ শিল্পের মধ্যে। প্লেটো যেহেতু শিল্প-সাহিত্যে প্রকৃতির অনুকরণ লক্ষ্য করেছিলেন, প্রকৃতিতে দেখেছিলেন 'আইডিয়া'র প্রতিবিম্ব, তাই তাঁর কাছে মূল সত্য বা 'আইডিয়া' থেকে সাহিত্যের দূরত্ব ছিল অনেকখানি। কিন্তু হেগেল (১৭৭০-১৮৩১) শিল্পের স্থান নির্দেশ করলেন প্রকৃতির অনেক ঊর্ধ্বে। শুধু তাই নয়, তিনি মনে করতেন 'আইডিয়া'-র সন্ধান মেলে সাহিত্যের মধ্যে, যে-সাহিত্য প্রকৃতির সৃষ্টি নয়। শিল্পীমনের মাধ্যমেই শিল্পের বহিঃপ্রকাশ। মনের মধ্যস্থতায় শিল্পীর প্রতিভাশক্তির বলে রূপায়িত হয় যে শিল্প-সাহিত্য তা কখনও প্রকৃতির তুল্য নয়। আর যে-শিল্পী শিল্পের জনক সদৃশ, সৃষ্টির মুহূর্তে, হেগেলের কাছে, তিনি ঈশ্বর-স্বরূপ। সুতরাং প্লেটোর 'আইডিয়া' 'প্লোটিনিউ'-র 'পরম এক' (One) হেগেলের 'আইডিয়া' এক না হলেও এমন এক সর্বোচ্চশক্তি যেখান থেকে আসে যাবতীয় সৃষ্টির প্রেরণা। কিন্তু 'আইডিয়া' থেকে দূরবর্তী বলে প্লেটো-র কাছে সাহিত্য বর্জনীয়, One বা Higher reality প্রতিবিম্বিত হয় বলে প্লোটিনিউ-র কাছে সাহিত্য বর্জনীয় নয়, আর শিল্প-সাহিত্যই 'আইডিয়া'র একমাত্র প্রকাশক্ষেত্র বলে হেগেলের কাছে শিল্প-সাহিত্য বরণীয়। সুতরাং প্লেটো ও হেগেল সর্বোচ্চ একটি আয়ত্তাতীত সত্তায় বিশ্বাসী হলেও শিল্প-সাহিত্য প্রসঙ্গে তাঁদের সিদ্ধান্ত এক ছিল না। তবে ভাববাদী দার্শনিক হিসেবে তাঁরা একই গোত্রভুক্ত, যেহেতু উভয়ের কাছেই জাগতিক বস্তুসমূহের উৎসস্থল ব্যক্তিচিত্ত বা মানবমন নয়, ভিন্ন এক অপ্রাকৃত রাজ্য। ইহজগতের অতীত অন্য এক জগতের অস্তিত্বে বিশ্বাস থেকেই আবার একদা জন্ম নিয়েছিল সমস্ত কিছুর পশ্চাতে, এমন কি সাহিত্যকর্মেরও, একজন সর্বক্ষমতাসম্পন্ন ঈশ্বরের অস্তিত্ব ভাবনা। সন্ত অগাষ্টিন (৩৫৪-৪৩০) ও সন্ত টমাস একুইনাসের রচনায় (১২২৫-৭৪), উনবিংশ শতকের আমেরিকান দার্শনিক ইমার্সন ও তাঁর বৃত্তান্তর্গত ডেভিড থোরো আর মার্গারেট ফুলারের রচনায় এবং শ্রীঅরবিন্দের সাহিত্য সম্পর্কে লেখা চিঠিপত্রে এর প্রমাণ আছে। এঁরা 'Over Soul', 'Overmind' বা ঈশ্বরকেই শিল্প-সাহিত্যের প্রেরণা বা উৎসরূপে গণ্য করতেন। অগাষ্টিন শিল্পের মধ্যে সংগীতকে মনে করতেন সর্বশ্রেষ্ঠ, কারণ একমাত্র সংগীতের মধ্যেই দর্শনেন্দ্রিয়ের স্পর্শ-কলুষ দোষ ঘটে না। স্বর্গীয় শৃঙ্খলার উৎকৃষ্ট প্রতীক, তাঁর মতে, সংগীত। শিল্প

এবং প্রকৃতি যদিও সবই ঈশ্বরের দিকে উদ্দিষ্ট তবু সংগীত ছাড়া অন্যান্য শিল্পে বাস্তবের বন্ধন অতি নিবিড়, অতএব চিরন্তন ও ধ্রুবের স্থান নেই সেই সমস্ত ক্ষেত্রে। অতীন্দ্রিয়বাদী ইমার্সন[৫] কল্পনা করেছিলেন এক 'Over Soul'-এর অস্তিত্ব। তিনি বলেছেন, বিচিত্র বিশৃঙ্খল বস্তুকে কবি যখন একটি 'ক্রিস্টাল'-এর মত গড়ে তোলেন অখণ্ড অবিভাজ্য মূর্তিতে, তখনই তিনি 'Over Soul'-এর সহায়তায় সাফল্য অর্জন করেন। যে 'Over Soul'-এর সাহায্যে শিল্পের অখণ্ডতা লাভ ঘটে তা কোন অর্থে মানবিক নয়, একান্তই অজাগতিক এবং ঐশ্বরিক। দৈব-প্রেরিত কবির কোন বিশেষ ক্ষেত্র নেই, এই বিশ্বাস থেকে ইমার্সন আবেগ-পূর্ণ ভাষায় কবিকে সম্বোধন করে বললেন, 'Thou shalt leave the world, and know the muse only.'[৬] এইটুকু প্লেটোর সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য থাকলেও তারপরই যখন বলেছেন, কবির সার্বভৌমত্ব কোন অঞ্চলে সীমাবদ্ধ নয়, কবি একই সংগে 'land lord'! Sea lord! air lord' তখনই প্লেটোর কবিদের সম্পর্কে বৈরাগ্যের পাশে ইমার্সনের কবিদের বিষয়ে অনুরাগ বিপরীত সম্পর্কে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ইমার্সনের কাছে, প্রকৃতির স্রষ্টা ও সাহিত্যের স্রষ্টার মধ্যে কোন ধর্মগত পার্থক্য সত্য ছিল না। থোরো যদিও কাব্যে কবির কলাকৌশলগত সংস্কার-সাধন প্রক্রিয়াকে মানতেন বলে ইমার্সনের মত সহজবোধ্যতা বা সারল্যকে শিল্পের শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণের উপায় মনে করেন নি, তবু বুদ্ধি বা ব্যক্তিগত রুচিকে নয়, শিল্প-সৃষ্টির ক্ষেত্রে 'প্রত্যাদেশ'কে স্বীকার করায় অতীন্দ্রিয়-ভাববাদী ইমার্সন-বৃত্তেরই মানুষ তিনি। মার্গারেট ফুলারও ইমার্সন-থোরোর মতই সাহিত্যিককে ঈশ্বরের সগোত্র বলে মনে করতেন। ঈশ্বর নাকি এক মহান কাব্যস্রষ্টা। প্রকৃতি হচ্ছে ঈশ্বরের কবিতা। আর এই জগতের কবি-সাহিত্যিকেরাও হচ্ছেন সঠিক অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী এবং ঈশ্বরসদৃশ। বস্তুতঃ জগদতীত 'Over Soul'-এর প্রকৃতিব্যাপী সুবিস্তৃত প্রভাবের কথা সাড়ম্বরে ঘোষণা করে ইমার্সন এবং তাঁর অতীন্দ্রিয়বাদী অনুগামীরা আমেরিকান-দের নবগঠিত জাতীয় জীবনের নৈতিক মান সুউন্নত করার প্রয়াস পেয়েছিলেন।[৭] তাঁদের কাব্য-সাহিত্য চিন্তার জগতেও প্রকৃতি, ঈশ্বর, কবি সকলকেই শুধু স্বীকৃতি দান নয়, সকলের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক-অনুসন্ধানও একই প্রয়াসের অন্তর্গত মনে হয়। ইমার্সন-প্রমুখ যাকে 'Over Soul' বলেছেন শ্রীঅরবিন্দ তাকেই বলেছেন 'Overmind'। এই 'Overmind'-এর কাছ থেকে আগত

প্রেরণা যদি হয় নির্বাধ, শ্রীঅরবিন্দ বলছেন, তাহ'লে কবি ঈশ্বরের মুখপাত্রের ভূমিকা গ্রহণ করেন। যাবতীয় সৃষ্টির মত কবিতার অস্তিত্বও অনাদি অসীমে। সেখানে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান আছে একাকার হয়ে। শ্রীঅরবিন্দ যদিও দিব্যপ্রেরণার বাস্তবসম্মত রূপায়ণে মানবিক ক্রিয়াকাণ্ডের (external instruments) মূল্য গুরুত্বের সঙ্গেই গ্রহণ করেছেন তবু 'Poetry, or at any rate a truly poetic poetry, comes always from some subtle plane'[৮] এই তত্ত্ব থেকেই তিনি সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা শুরু করেছেন। আবার যেহেতু কাব্য-কবিতার প্রেরণার উৎস ইন্দ্রিয়ের অগোচর সেইজন্য মহৎ সৃষ্টির পরিমাণ, তাঁর মতে, অত্যন্ত অল্প।

অতঃপর ভাববাদী দার্শনিক হিসেবে নাম করতে হয় ইমানুয়েল কাণ্ট-এর (১৭২৪-১৮০৪) যদিও তিনি হেগেলের পূর্বসূরী। কাণ্ট-এর 'ইমাজিনেশন' তত্ত্ব যে ইংরেজ রোমাণ্টিক কবি কোল্‌রিজকে কতটা প্রভাবিত করেছিল আমরা তা পূর্বেই ('কল্পনা' প্রসঙ্গে) লক্ষ্য করেছি। কাণ্ট কবির এই কল্পনাশক্তিকে মনে করতেন দ্বিতীয় একটি বিশ্ব রচনার ক্ষমতা যার সাহায্যে প্রকৃতিদত্ত বস্তু অবলম্বনে শিল্পী নতুন এক প্রকৃতিকে রচনা করেন। কবির নিগূঢ় কল্পনাশক্তির এত প্রচণ্ড ক্ষমতা স্বীকার করে কাণ্ট কবির শক্তির মহিমাই প্রতিষ্ঠিত করলেন। অলৌকিক 'আইডিয়া' বা 'Over Soul'-এর অস্তিত্ব স্বীকার না করেও কাণ্ট শিল্পীর কল্পনাশক্তির মহিমা প্রচার করে এবং সৌন্দর্যকে নিষ্কাম, জাগতিক লাভালাভ-সম্পর্কশূন্য বিশুদ্ধ আনন্দরূপে গ্রহণ করে সাধারণ জাগতিক ব্যাপারের ঊর্ধ্বে কবি ও কাব্যের আসন দিলেন নির্দিষ্ট করে। তবে ভাববাদী হিসেবে প্লেটো-প্লোটিনিউ-হেগেল-ইমার্সন প্রমুখ সব কিছুর ঊর্ধ্বে স্বতন্ত্র একটি চালকসত্তার অস্তিত্ব অনুভব করে শিল্পের সঙ্গে জগতের সম্পর্ক যেভাবে স্থাপন করেছিলেন, কাণ্ট সেখানে 'কল্পনা'কে প্রাধান্য দিয়ে শিল্পকে ভিন্ন এক দিগন্তে উপস্থিত করলেন। ব্যক্তিমানুষের কল্পনার গুরুত্ব স্বীকার করার ফলে আসলে ব্যক্তির মনের সমর্থনের উপরেই বহির্জগৎ ও অন্যান্য মানুষের অস্তিত্বের সার্থকতা নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। কাণ্টের কাছে 'প্রতিভা' একটা অন্তর্গত মানসিক শক্তি, সাহিত্য সাহিত্যিকের কল্পনার সৃষ্টি এবং সৌন্দর্য নৈতিক সদসতের সঙ্গে সম্পর্কহীন 'বিশুদ্ধ আনন্দ'। 'অবজেকটিভ আইডিয়ালিস্ট' গণ দৈবানুপ্রেরিত শিল্পীর অসামান্য ক্ষমতা সম্পর্কে যেখানে শ্রদ্ধাশীল; সেখানে কাণ্ট, দৈব নয়, কল্পনাশক্তির অধিকারী শিল্পীর মহিমায়

বিশ্বাসী। আবার প্লেটো শিল্প-সাহিত্যের মাধ্যমে সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষা উচিত বিবেচনা করতেন বলে ট্রাজেডি-রচয়িতাদের উপর ছিলেন অসন্তুষ্ট, প্লোটিনিউ সন্তুষ্ট কাব্যের সৌন্দর্যের মধ্যে পরম সৌন্দর্যের প্রতিবিম্বের সন্ধান পেয়ে। হেগেল শিল্পে খুঁজে পেয়েছিলেন 'Purification of the passions'-এর সম্ভাবনা আর কাণ্ট সন্ধান করলেন 'নিষ্কাম সন্তোষ'। যে প্রাপ্তি ও তৃপ্তি একান্তই ব্যক্তি-কেন্দ্রিক তার সঙ্গে শিল্পের কোন সম্পর্ক নেই, এই ছিল কাণ্টের অভিমত। এই তৃপ্তি বা আনন্দ সৃষ্ট হতে পারে সৌন্দর্যের দ্বারা। সৌন্দর্যের জন্ম নিষ্কাম আনন্দ থেকে, আনন্দ থেকেই আবার সৌন্দর্যবোধের জন্ম। এইভাবে সৌন্দর্য ও আনন্দের আত্মিক সম্পর্ক সন্ধান ক'রে এবং উভয়কেই জাগতিক লাভক্ষতির ঊর্ধ্বে স্থাপন করে, কাণ্ট সৌন্দর্য এবং আনন্দকে অনুভূতিলোকের আস্বাদ্য বস্তু বলে অন্তর্গ্রাহ্য করে তুলেছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই আনন্দ যে শুধুই ব্যক্তিগত নয়, সার্বভৌম, সে কথাও স্পষ্ট করে জানিয়ে সৌন্দর্য ও আনন্দকে 'Subjective Universality' বলে ঘোষণা করেছেন। শিল্প-সাহিত্যের জগতে এই জাতীয় 'বিশ্বজনীনতা'ই কাণ্টের পর শিলিঙ-এর রচনায় গুরুত্বের সঙ্গে স্বীকৃত হল। তিনি লক্ষ্য করলেন, বন্ধনের সঙ্গে মুক্তির, চেতনের সঙ্গে অচেতনের দ্বন্দ্বোত্তীর্ণ ঐক্যমূর্তিই হচ্ছে শিল্প। আর শিল্পের জন্মভূমি হচ্ছে শিল্পীর অনন্তভাব-ভাবনা-সমৃদ্ধ অন্তর্লোক। শিল্পী শিল্পের রূপ নির্মাণের ক্ষেত্রে বাহ্য নিয়মের বশ্যতা স্বীকার করে তাঁর সচেতন মনের নিয়ন্ত্রণকে মেনে নিলেও তাঁর হৃদয়ের গভীরে যে 'unconscious infinity' সেখানেই শিল্পের প্রকৃত জন্মভূমি, এই হচ্ছে শিলিঙ-এর অভিমত। তিনি মনে করতেন, এই 'unconscious infinity'-র জন্যই শিল্প-সাহিত্যের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে রয়েছে অনন্ত সম্ভাবনা। যেহেতু শিল্পীর অচেতনলোকের অসীমতাই রূপ পায় শিল্পে, তাই শিল্পী সচেতনভাবে তাঁর শিল্প-রূপে যে সত্যকে স্বীকার করেন নি, সমালোচকের হৃদয়দর্পণে তা প্রতিবিম্বিত হতে পারে অনায়াসে। আবার শিল্পী জগৎস্রষ্টার মতই অসীম হৃদয়ানুভূতির অধিকারী বলে বস্তুজগৎ থেকে তিনি তাঁর শিল্পের জন্য যে উপাদান সংগ্রহ করেন তার ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অপূর্ণতাকে তিনি পূর্ণ ও সুন্দরমূর্তিতে উপস্থাপিত করেন। শিল্পের জগৎ এই সুন্দরের জগৎ, পার্থিব উপযোগিতা তথা 'সত্য' ও 'মঙ্গল'-এর সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত।

মোট কথা, কাণ্ট এবং শিলিঙ এই দুই দার্শনিক শিল্প-সাহিত্যকে জাগতিক

বন্ধন-মুক্ত বিশুদ্ধ আনন্দের জগৎ ব'লে চিহ্নিত ক'রে, শিল্পকর্মে শিল্পীর চেতন ও অচেতন মনের গুরুত্ব স্বীকার ক'রে এবং শিল্পকে একই সঙ্গে 'ব্যক্তিক' ও 'সার্বভৌম' বলে ঘোষণা ক'রে দিব্যপ্রেরণা নামক অলৌকিক ব্যাপার থেকে মুক্ত করেন শিল্পকে এবং শিল্পীকে মুক্তি দেন কল্যাণ-সাধন করার মত নৈতিক গুরুদায়িত্ব পালনের সীমাশাসন থেকে। মঙ্গল-কর্মের আনন্দ নয়, চিত্তশোধনের আনন্দ নয়, বিশুদ্ধ নান্দনিক অনুভূতি বলতে যা বোঝায় কাণ্ট ও শিলিঙ বললেন তারই কথা। উদ্দেশ্যহীনতা বজায় রাখাই শিল্পের প্রধান উদ্দেশ্য, নিষ্কাম-পরিতৃপ্তি সাধনই শৈল্পিক সৌন্দর্যের লক্ষ্য, অলৌকিক দিব্যপ্রতিভা নয় ব্যক্তি-মনের কল্পনা শক্তিই শিল্প-সাহিত্যের জননী, অন্ততঃ এই তিনটি মত কাণ্ট-কে শুধু জার্মাণ ভাববাদীদের মধ্যে নয়, সমস্ত পাশ্চাত্ত্য রোমাণ্টিক কবিদের কাছে এবং শোপেনহাওয়ার (১৭৮৮-১৮৬০), শিলার (জে. এফ. শিলার ১৭৫৯-১৮০৫) ও হার্বার্ট স্পেন্সর (১৮২০-১৯০৩) প্রমুখের কাছে অনুকরণীয় করে তুলেছিল। শোপেনহাওয়ার, কাণ্টের মতই, শিল্পীর কল্পনাশক্তির মহিমা স্বীকার করেছেন; এবং বলেছেন, ব্যক্তিগত কামনা-বাসনা থেকে, আকাঙ্ক্ষা ও ভীতি থেকে মুক্তি দিয়ে শিল্প-সাহিত্য আমাদের বিশুদ্ধ 'নান্দনিক অনুভূতিলোকে' উত্তীর্ণ করে। তাঁর মতে, অপ্রয়োজনই চারুশিল্পের জননী—'The mother of the useful arts is necessity ; that of the fine arts superfluity'। তবে কাণ্ট, বোধ হয়, সর্বাধিক প্রভাবিত করেছিলেন ইংরেজ রোমাণ্টিক কবি কোল্‌রিজ, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, কীট্‌স্‌ এবং শেলীকে। কোল্‌রিজ কল্পনাকে যে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছিলেন (Fancy, Primary imagination, Secondary imagination) তার আদর্শ তিনি স্পষ্টই পেয়েছিলেন কাণ্টের কাছ থেকে (এ বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে) এবং কোল্‌রিজ কাণ্ট-কথিত 'Productive Imagination'-কে সর্বোচ্চে স্থাপন করেছিলেন। কীট্‌স্‌ও কল্পনার সত্যকেই একমাত্র সত্য ও সুন্দর বলে গণ্য করেছিলেন। আর এঁরা সকলেই 'আনন্দদান'কে মেনেছিলেন শিল্প-সাহিত্যের প্রধান উদ্দেশ্য বলে :— (১) কবি কাব্যরচনা করেন আনন্দ দানের উদ্দেশ্য থেকে (ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ), (২) আনন্দ কবিতার নিত্যসহচর, সেইহেতু কবি আপাতঅসংগতে সুন্দরের স্পর্শ যুক্ত করেন, যুক্ত করেন উল্লাসের সঙ্গে ভীতিকে, বেদনার সঙ্গে আনন্দকে, পরিবর্তনশীলের সঙ্গে অনন্ত অপরিবর্তনীয়কে (শেলী), (৩) কবিতার সঙ্গে বিজ্ঞানের প্রধান

পার্থক্য এইখানে যে, বিজ্ঞান যেখানে সত্যান্বেষী, কবিতার লক্ষ্য সেখানে আনন্দদান (কোল্‌রিজ)....ইত্যাদি। এই রোমান্টিকেরা যে-'আনন্দদান'কে শিল্পের লক্ষ্য বলে উল্লেখ করেছেন তা কাণ্ট-কথিত নিষ্কাম স্বার্থসম্পর্কহীন আনন্দই, অন্য কিছু নয়। শিল্প-সাহিত্যে উদ্দেশ্য-নিরপেক্ষ নিষ্কাম আনন্দের ভূমিকা যা কাণ্ট সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেছেন তা থেকে একদা পাশ্চাত্যে আন্দোলন হিসেবে দানা বেঁধে উঠেছিল 'শিল্পের সার্থকতা শিল্পই' এই মতাদর্শ। আবার কল্পনাবাদী ও কলাকৈবল্যবাদীদের পূর্বসূরী হিসেবে যেমন কাণ্টের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য, তেমনি শিলার এবং হার্বার্ট স্পেন্সরের 'Theory of Play' বা ক্রীড়াবাদের উপরেও কাণ্টের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট।

খ ॥ খেলা ও লীলা

শিল্পীর কল্পনাশক্তির অসামান্যতা ও শিল্পের জগতে অপ্রয়োজনের আনন্দ কাণ্টের নন্দনতত্ত্বে যে-মহিমায় স্বীকৃতি লাভ করেছিল তার উপর ভিত্তি করেই ফ্রিড্রিশ শিলার শিল্পের জন্মের পিছনে স্রষ্টার 'প্লে ইম্‌পাল্‌স্' সন্ধান করলেন। কিন্তু তিনি 'প্লে' শব্দটি প্রচলিত অর্থে ব্যবহারের অভিলাষী ছিলেন না। তাঁর মতে, যে 'প্লে' বা 'খেলা'র কথা বলেছেন তিনি, সে খেলা সৌন্দর্যকে নিয়ে এবং কেবলমাত্র সৌন্দর্যের সঙ্গে। সেই কারণে এ 'খেলা' শিশুর নয়, পরিণত মানুষই পারে এই খেলা খেলতে। 'পরিণত মানুষ' কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ। কোন মানুষ 'পরিণত'? যিনি বয়ঃপ্রাপ্ত তিনি? না, যিনি প্রাত্যহিক জাগতিক স্তরের ঊর্ধ্বে নিজেকে উন্নীত করতে পেরেছেন তিনি? দ্বিতীয় ধরণের মানুষই, নিঃসন্দেহে, তাঁর মতে, পরিণত মানুষ। শিলার যিনি বলেছিলেন, মানবসত্তার যথার্থ প্রকাশ সৌন্দর্যে এবং সভ্যতার প্রারম্ভকাল থেকেই সৌন্দর্যের ধারা নিত্যবহমান, তাঁর কাছে 'সৌন্দর্য' শব্দটি পরিণত হয়েছিল জীবন-ধারণের জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত সভ্যতাবিকাশের সহায়ক এক অনুভূতিরূপে। অর্থাৎ শিলারের মতে জীবনযাপনের নিত্যগ্লানির হাত থেকে মুক্তির জন্য মানুষ রচনা করেছিল শিল্প ও সৌন্দর্যের জগৎ। কাজের দাসত্ব থেকে মুক্ত এই জগৎ অনেকটা 'খেলা'র জগতের সদৃশ, তবে সে খেলা দেহের বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় যে সমস্ত খেলা তা থেকে অনেক ঊর্ধ্বস্তরের। যে-খেলায় পরিণত মনের কল্পনার স্পর্শ লাগে,

শিলার সেই খেলার সঙ্গেই শিল্পসৃষ্টির প্রেরণার সাদৃশ্য সন্ধান করেছেন ('Man only plays when he is, in the fullest sense of the word Man ; and he only is completely Man when he plays')। শিলার-এর পর এই মতবাদের সুবিস্তৃত আলোচনা করেন ইংরেজ দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সর (১৮২০-১৯০৩) এবং টুবিনগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্পতত্ত্বের ঐতিহাসিক কনরাড ল্যাঙ্গে (Konrad Lange 1855-1921)।

তাঁর 'Principles of Psychology' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে নান্দনিক অনুভূতি প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে স্পেন্সরের প্রথমেই মনে পড়েছিল শিলার-এর প্লে-তত্ত্বের কথা, যদিও তিনি জনৈক জার্মাণ দার্শনিক বলে শিলার-এর নাম উহ্য রেখে গিয়েছেন। কিন্তু শিলার-এর বক্তব্যের আক্ষরিক সত্যে বিশ্বাসী না হলেও স্পেন্সর শিলার-এর প্লে-তত্ত্বের যে একজন বড় সমর্থক ছিলেন তা তাঁর আলোচনা থেকেই ধরা পড়ে। স্পেন্সর বলছেন, খেলা এবং নান্দনিক ক্রিয়াদি (শিল্প-সাহিত্য) যেহেতু সরাসরি জীবনের কোন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে না, তাই উভয়ের মধ্যে একটা সাদৃশ্যসূত্র লক্ষ্য করা যেতে পারে। কুকুর এবং বিড়ালের খেলায় আছে শিকারের অনুকরণ, অল্পবয়সী মেয়েদের পুতুল খেলায় আছে বয়স্কদের অনুকরণ। আর সমস্ত খেলাই আসলে 'mimicry of life'। এবং সমস্ত শিল্পও জীবনবৃত্তের অনুকরণ। অতএব 'mimicry of life'-এর দিক থেকে খেলার সঙ্গে শিল্পরচনার সাদৃশ্য আছে। দ্বিতীয়তঃ, দৈহিক শক্তির প্রয়োজনাতিরিক্ত যে-প্রাচুর্য তার প্রকাশ যেমন খেলায়, তেমনি জীবনযাপনের জন্য নিত্য যা প্রয়োজন তার অতিরেকের রূপায়ণই সাহিত্য। তৃতীয়তঃ, খেলার ভিতর যেমন কোন বাধ্য-বাধকতার বন্ধন নেই, তেমনি শিল্পকর্মও উদ্দেশ্য-নিরপেক্ষ এবং স্বতঃস্ফূর্ত। ...কিন্তু মনে রাখতে হবে, শিলার সাহিত্যের জগৎকে এই কারণে খেলার জগৎ বলেছিলেন যে, সাহিত্যের অবলম্বন যে-সৌন্দর্য সেই সৌন্দর্য পরিণত ভাবনার মানুষের খেলার উপকরণ। সুতরাং শিশুর খেলার সঙ্গে সাহিত্যকে একাকার করার দিকে স্পেন্সরীয় প্রয়াস শিলার এর ছিল না। তা ছাড়া স্পেন্সর খেলার অনুকরণাত্মক দিকটির উপর ঝোঁক দিয়েছিলেন, আর শিলার গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন কল্পনাবৃত্তির উপর। স্পেন্সর 'aesthetic feeling'কে 'life serving function' থেকে পৃথক বলে ঘোষণা করেছিলেন এবং 'খেলা'র ভিতর স্বাধীনতা এবং দেহের উদ্বৃত্তশক্তির (surplus energy)

প্রকাশ লক্ষ্য করেই শিল্পকর্মকে তুলনা করেছিলেন খেলার সঙ্গে। কিন্তু যদি শিশুর খেলার সঙ্গে পরিণত মানুষের শিল্পসৃষ্টির প্রেরণাকে তুলনা করা যায় তাহ'লে 'কল্পনাশক্তিহীন' এবং 'অনুকরণ'-প্রিয় শিশুর খেলা কি ক'রে সৌন্দর্য-স্রষ্টা কল্পনাশক্তিসম্পন্ন সাহিত্যিকের সাহিত্যকর্মের তুল্য হবে? আসলে শিশুর খেলা 'mimicry' কিন্তু শিল্প-সাহিত্য তো 'mimicry' নয়। অতএব কাণ্ট-ব্যাখ্যাত সৌন্দর্যতত্ত্বে বিশ্বাসী শিলার-এর সঙ্গে স্পেন্সর-এর মতের কিছু পার্থক্য ছিল। শিলার-এর 'প্লে'-তত্ত্বে যিনি খেলোয়াড় তিনি কিন্তু কোন অর্থেই শিশু ছিলেন না, শিলার তাঁকে বলেছেন 'পূর্ণ মানুষ' (complete man)। কিন্তু স্পেন্সার বলেছেন শিশুর খেলার কথা, পরিণত মানুষের কথা নয়। তবে 'প্লে'-তত্ত্ব সম্পর্কে কে. গ্রূস-এর ব্যাখ্যা এখানে স্মরণ করলে শিশুর খেলা ও শিল্পসৃষ্টির সাদৃশ্য সন্ধানের এক ব্যাখ্যা মিলে যায়। গ্রূস বলেছেন, শিশুর খেলায় যেমন তার মনের মুক্তি ও আনন্দলাভ ঘটে, তেমনি শিল্পেও পরিণত মানুষ আনন্দ উপভোগ করেন। এই দিক থেকে আরও একটু বিস্তারিত ব্যাখ্যা ক'রে কন্‌রাড ল্যাঙ্গে বলেছেন, খেলায় দেহের উদ্‌বৃত্তশক্তির প্রকাশ-জনিত আনন্দ হয় না, এই আনন্দের জন্ম-কারণ মানসিক শক্তির উদ্‌বৃত্ততা ('Surplus of Psychic energy) এবং সচেতন আত্মপ্রতারণা ('conscious self-deception'), যার ফলে দৈনন্দিন জীবনের বিধিনির্দেশের হাত থেকে ঘটে মুক্তি লাভ। ল্যাঙ্গে-এর মতে, শিশুর খেলায় একজাতের 'ইল্যুশন' সৃষ্টির প্রয়াস থাকে। তারা কখনও পশুপাখীর অনুকরণে চিৎকার করে, লাফায় এবং কখনও একজন শিকারীর ও অন্য সকলে পশুর ভূমিকা গ্রহণ ক'রে অবশেষে একসময় শিকারী ও নিহত পশুরা সকলেই একসঙ্গে আনন্দ উপভোগ করে। এই যুদ্ধ যুদ্ধ 'খেলা'কে ল্যাঙ্গে বলোছন' ইল্যুশন গেম'। তিনি এই খেলার দর্শকের আনন্দের সঙ্গে ট্রাজেডি-দর্শকের আনন্দকে সমতুল্য জ্ঞান করেছেন। সত্য যুদ্ধ নয়, কিন্তু তাকে সত্যরূপে উপস্থাপিত করার যথাসাধ্য চেষ্টা আছে অর্থাৎ 'খেলা' হিসেবে 'সত্য' কিন্তু জীবনের সত্য নয়। খেলার এই বৈশিষ্ট্যই শিল্পের স্বভাব চিহ্নিত করে। প্রাচীন রোমের গ্ল্যাডিয়েটরদের যুদ্ধ এবং স্পেনের 'ষাঁড়ের লড়াই' যে-কারণে 'খেলা' নয়, সেই কারণেই শিশুর খেলা 'খেলা'। (ল্যাঙ্গে আরও কিছুটা অগ্রসর হয়ে প্রেমের খেলাকেও খেলা বলেছেন। প্রেমমূলক গীতিকবিতায় দেখেছেন তিনি প্রেমেরই সূক্ষ্ম খেলা।) আবার শিশুদের 'খেলা'র ভিতর যেমন

সব উপকরণই থাকে অথচ সবটাই 'মিছিমিছি', সেইরকম শিল্পেও অনেক কিছু থাকে যা জীবনে থাকে না এবং জীবনে অনেক কিছু থাকে যা শিল্পে বর্জন করা হয়। অর্থাৎ শিল্প ও জীবন এক নয়, জীবন-সত্যের একটি সম্ভাব্য রূপমাত্র থাকে শিল্পে। অতএব বস্তুজগতের তুলনায় শিল্পও একটা 'মিছিমিছি'র জগৎ। পরিশেষে, শিশু তার 'মিছিমিছি'র জগতে যেমন একটা নিস্পৃহ আনন্দ উপভোগ করে, শিল্পীও শিল্পের মাধ্যমে তেমনি এক নিষ্কাম আনন্দের জগৎ সৃষ্টি করেন।

শিলার থেকে আরম্ভ করে স্পেন্সর, গ্রুস, ল্যাঙ্গে পর্যন্ত শিল্পতাত্ত্বিকেরা শিল্পে 'প্লে' শব্দটি যেভাবে ব্যাখ্যা করে 'শিল্পসৃষ্টি' ও 'খেলা'কে সমতুল্য বলেছেন তা সূত্রাকারে সাজালে এইরকম দাঁড়াবে :—

(ক) 'শিল্প' পরিণত মানুষের খেলা এবং সে খেলা 'সৌন্দর্য' দিয়ে 'সৌন্দর্যের' সঙ্গে খেলা। আর্থাৎ সৌন্দর্যের জগৎই শিল্পের জগৎ (শিলার)।

(খ) শিশু তার খেলায় জীবনের অনুকরণ করে, শিল্পও জীবনের অনুকরণ। অতএব শিল্পও একধরণের খেলা (স্পেন্সর)।

(গ) শিল্প এবং খেলা উভয়ক্ষেত্রেই শক্তির প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রাচুর্যের প্রকাশ (ঐ)।

(ঘ) খেলার মত শিল্পও বাধ্যবাধকতাহীন এবং উদ্দেশ্য-নিরপেক্ষ (ঐ)।

(ঙ) শিশু যেমন তার খেলায়, পরিণত মানুষও তেমনি শিল্পকর্মে তার মনের মুক্তি ও আনন্দলাভ করে (গ্রুস)।

(চ) শিশুর খেলার জগতের মত শিল্পের জগৎও যথার্থ বাস্তবের জগৎ নয়, এবং 'খেলা' ও 'শিল্পকর্ম' থেকে খেলোয়াড় ও স্রষ্টা নিস্পৃহ আনন্দ ভোগ করেন (কে. ল্যাঙ্গে)।

এই সূত্রগুলির মধ্যে স্পেন্সর-এর সূত্রে শিল্পকে যে 'mimicry of life' বলা হয়েছে, পূর্বেই বলেছি, তা যথার্থ নয়, কারণ শিল্পকে জীবনের mimicry বলার মানে শিল্পীর কল্পনাকে অস্বীকার করা। কিন্তু শিল্পী জীবন থেকে উপাদান সংগ্রহ করলেও যে জগৎ গড়ে তোলেন তিনি, তা কোন জগতেরই mimicry নয়। এ এক নতুন জগৎ যে-জগতে শিল্পী বিশ্বস্রষ্টার সদৃশ। দ্বিতীয়তঃ প্রয়োজনাতিরিক্ত শক্তির প্রকাশ শিল্পে ও খেলায়, এই কথা স্বীকার করার আগে মনে রাখা উচিত যে, সাধারণতঃ খেলায় মানুষের দৈহিক শক্তির প্রয়োজন ও প্রকাশ হয়, কিন্তু শিল্প-সাহিত্যের জগৎ মনের জগৎ। অতএব

স্পেন্সর নয়, ল্যাঙ্গে-র মন্তব্যই যথার্থ যে শিল্প হচ্ছে 'Surplus of Psychic energy'র প্রকাশ। তবে শিল্পে ও খেলায় নিস্পৃহ আনন্দ এবং উদ্দেশ্য-নিরপেক্ষতা লক্ষ্য করে উভয়ের মধ্যে যে সাদৃশ্য সন্ধান করা হয়েছে তা অবশ্য একটি স্তর পর্যন্ত সমর্থনযোগ্য। মনে রাখতে হবে, শিল্পে যেখানে কল্পনার মুক্তি-লাভ হয়, খেলায় সেখানে খেলোয়াড়ের কল্পনার কোন স্থানই নেই। দ্বিতীয়তঃ খেলোয়াড়ের আনন্দ ও শৈল্পিক আনন্দ কদাপি সদৃশ নয়। শিল্প যেখানে ইন্দ্রিয়ের দুয়ারে আবেদন জানিয়ে অবশেষে কল্পনার জগতের গভীরে আন্দোলন তোলে, মনকে করে সমব্যথী ও রসসিক্ত, সেখানে 'খেলা' থাকে বাহেন্দ্রিয়ের জগতে সীমাবদ্ধ। দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালনার আনন্দ আর মানসিক তৃপ্তি সদৃশ নয়, সমস্তরেরও নয়। তৃতীয়তঃ খেলোয়াড় খেলার সময় ছাড়া রূঢ় বাস্তব সম্পর্কে নিরপেক্ষ থাকতে পারেন, কিন্তু শিল্পী এই জগৎকে দেখেন প্রেমিকের দৃষ্টি দিয়ে অর্থাৎ তাঁর নিরপেক্ষ থাকলে চলে না। চতুর্থতঃ শিল্পের মাধ্যমে যেখানে আনন্দদায়ক কোন কিছুর স্থায়ী মূর্তি দানের চেষ্টা করা হয়, সেখানে খেলোয়াড়ের স্থায়ী কিছুই করণীয় থাকেনা। আসলে 'কাজের' (work) বিপরীত শব্দ হিসেবে 'খেলা' (Play)' শব্দটি ব্যবহার ক'রে শিল্পকে শিল্পীর 'খেলা' হিসেবে গ্রহণ করার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু 'খেলা' ও শিল্পকর্মের সাদৃশ্য একটি-স্তর পর্যন্ত সত্য মাত্র। 'খেলা' ও 'শিল্পকর্ম' এক নয়। কিন্তু 'প্লে' তত্ত্বের জনক শিলার 'শিল্প'কে পরবর্তত মানুষের সুন্দরকে নিয়ে সুন্দরের সঙ্গে 'খেলা' বলে যে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন তা কান্টের 'Purposiveness without purpose', 'disinterested satisfaction', 'free play of imagination' প্রভৃতি প্রবচনের সূত্রানুসারী বলে স্পেন্সর-এর ব্যাখ্যা অপেক্ষা শিলার-এর ব্যাখ্যা অনেকাংশে গ্রহণীয় মনে হয়। শিলার-এর ব্যাখ্যা স্মরণে রেখেই বোধ হয় 'সাহিত্যে খেলা' (১৩২২ শ্রাবণ) প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী বলেছিলেন, 'কবির সৃষ্টিও এই বিশ্বসৃষ্টির অনুরূপ, সে সৃজনের মূলে কোনো অভাব দূর করবার অভিপ্রায় নেই—সে সৃষ্টির মূল অন্তরাত্মার স্ফূর্তি এবং তার ফুল আনন্দ। এককথায় সাহিত্যসৃষ্টি জীবাত্মার লীলামাত্র, এবং সে লীলা বিশ্বলীলার অন্তর্ভূত'। এখানে 'লীলা' শব্দটি প্রমথনাথ 'খেলা' শব্দের সঙ্গে অভিন্নার্থে গ্রহণ করেছেন। কারণ পূর্বের অনুচ্ছেদেই লিখেছেন 'সাহিত্য-জগতে যাঁদের খেলা করবার প্রবৃত্তি আছে, সাহস আছে ও ক্ষমতা আছে,

মানুষের নয়ন-মন আকর্ষণ করবার সুযোগ বিশেষ করে তাঁদের কপালেই ঘটে।' আবার প্রবন্ধের শেষাংশে লিখেছেন 'সাহিত্যে মানবাত্মা খেলা করে এবং সেই খেলার আনন্দ উপভোগ করে।' স্পষ্টতঃই প্রমথনাথ 'খেলা' ও 'লীলা' শব্দ দুটির মধ্যে কোনরকম প্রভেদ কল্পনা করেন নি। আবার সাহিত্যে আনন্দ-ব্যতীত অন্য কোন ফলের প্রতি আকাঙ্ক্ষাকে সমর্থন করেন নি। সাহিত্য থেকে লাভ হয় আনন্দ, 'খেলা' থেকেও লাভ হয় আনন্দ। তাঁর মতে, এই দুই আনন্দ স্বরূপতঃ একই। প্রমথনাথ বলেছেন, আনন্দব্যতীত যদি উপরি কিছু পাওনা থাকে কোন খেলা থেকে, তবে তাকে 'খেলা' না বলে বলতে হবে 'জুয়াখেলা'। অর্থাৎ তিনি মনে করেন খেলার আনন্দ 'disinterested satisfaction'। শিল্প-সাহিত্য থেকে যে আনন্দ লাভ হয় তা-ও 'disinterested satisfaction'। সুতরাং প্রমথনাথ কাণ্ট এবং শিলার-এর মতানুসারী। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের কণ্ঠেও শিলার-এর কথাই যেন উদ্ঘোষিত হল : 'আর্টিস্ট তারা সুন্দরকে অসুন্দরকে নিয়ে চিরকাল খেলা করছে।'[২] অথবা, 'আর্টিস্টরা ভক্তেরা কবিরা—পরম সুন্দরের সঙ্গে সুন্দর-সুন্দর খেলা খেলেন'[৩] এবং 'আর্টিস্ট তারা সুন্দরকে নিয়ে খেলা করে সুন্দরকে ধরে আনে চোখের সামনে'[৪]। কিন্তু 'খেলা' শব্দটির বিরুদ্ধে আপত্তি জানালেন রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথ 'খেলা' নয়, 'লীলা' শব্দটি ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে। রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'খেলার বৃত্তি আর প্রয়োজন-সাধনের বৃত্তি মূলে একই। সেইজন্যে খেলার মধ্যে জীবনযাত্রার নকল এসে পড়ে। কুকুরের জীবনযাত্রায় যে লড়াইয়ের প্রয়োজন আছে, দুই কুকুরের খেলার মধ্যে তারই নকল দেখতে পাই। বিড়ালের খেলা ইঁদুর-শিকারের নকল। খেলার ক্ষেত্র জীবনযাত্রাক্ষেত্রের প্রতিরূপ। অপরপক্ষে যে প্রকাশচেষ্টার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে আপন প্রয়োজনের রূপকে নয়, বিশুদ্ধ আনন্দরূপকে ব্যক্ত করা, সেই চেষ্টারই সাহিত্যগত ফলকে আমি রসসাহিত্য নাম দিয়েছি। বেঁচে থাকবার জন্যে আমাদের যে মূলধন আছে তারই একটা উদ্বৃত্ত অংশকে নিয়ে সাহিত্যে আমরা জীবন-ব্যবসায়েরই নকল করে থাকি, একথা বলতে তো মন সায় দেয় না।'[৫] বিশুদ্ধ আনন্দরূপকে ব্যক্ত করার এই চেষ্টাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'লীলা'; 'খেলা' নয়। 'অন্তরের অহেতুক আনন্দকে বাহিরে প্রত্যক্ষ গোচর করার দ্বারা তাকে পর্যাপ্তি দান করার যে চেষ্টা তাকে খেলা না বলে লীলা বলা যেতে পারে'।

এই বৃত্তি প্রয়োজন-সাধনের বৃত্তি নয়, রূপসৃষ্টি করার বৃত্তি। প্রমথনাথ বা অবনীন্দ্রনাথও 'খেলা' শব্দটি এমনভাবে ব্যবহার করেন নি যাতে রবীন্দ্রনাথ-ব্যাখ্যাত 'লীলা'র সঙ্গে তার কোন পার্থক্য আছে বলে মনে হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ স্পেন্সর-এর 'Principles of Psychology' (২য় খণ্ড) গ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন বলেই 'খেলা' শব্দটির প্রতি তাঁর অত বিরক্তি! রবীন্দ্রনাথ যে স্পেন্সর-এর উক্তগ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন তা রবীন্দ্রনাথের দেওয়া দৃষ্টান্তগুলি থেকেই স্পষ্ট হয়, যদিও রবীন্দ্রনাথ স্পেন্সর-এর নামোল্লেখ করেন নি।* কিন্তু স্পেন্সর-এর নামোল্লেখ না থাকলেও স্পেন্সর-এর মতের প্রতিবাদই যে রবীন্দ্রনাথের লেখায় ফুটে উঠেছে তাতে সংশয় নেই। অথচ স্পেন্সর 'aesthetic character of feeling' বলতে যে প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা-নিঃসম্পর্কিত আনন্দকে বুঝিয়েছেন তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'লীলা' শব্দটির পার্থক্য কোথায়? আসলে স্পেন্সর প্রমুখের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতের অমিল প্রচণ্ড না হলেও 'খেলা'র সঙ্গে সাহিত্যের 'Partial resemblance'কে 'Complete identity' রূপে গণ্য করার স্পেন্সরীয় প্রচেষ্টার ত্রুটির জন্যই রবীন্দ্রনাথ 'খেলা' শব্দটির বিরুদ্ধে আপত্তি তুলে তার জায়গায় 'লীলা' শব্দটি ব্যবহার করতে চেয়েছেন এবং 'লীলাময় ঈশ্বর' ও কবিকে গণ্য করেছেন সমধর্মী রূপে। অমুজ কবি-বন্ধু অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ জানালেন (১৩৪৩, ৮ই আশ্বিন)—'সৃষ্টি-কর্তাকে আমাদের শাস্ত্রে বলেছে লীলাময়। অর্থাৎ তিনি আপনার রসবিচিত্র পরিচয় পাচ্ছেন আপন সৃষ্টিতে। মানুষও আপনার মধ্যে থেকে আপনাকে সৃষ্টি করতে করতে নানাভাবে নানা রসে আপনাকে পাচ্ছে। মানুষও লীলাময়। মানুষের সাহিত্যে আর্টে সেই লীলার ইতিহাস লিখিত অঙ্কিত হয়ে চলেছে।' সাহিত্যসৃষ্টি, যা মানুষের প্রয়োজনের অতিরিক্ত, তার ভিতর মানুষ আপনাকে বিচিত্র পদ্ধতিতে প্রকাশ করে নিজেকেই খুঁজে পাচ্ছে। এই পাওয়ার নামই রবীন্দ্রনাথের মতে 'লীলা'। কিন্তু যাকে পাচ্ছে মানুষ তা তার 'ego' বা অহং-সম্পর্ক শূন্য। প্রয়োজনের ধূলিমালিন্যের স্পর্শ যেখানে, সেখানে 'অহং'-এর রাজত্ব, সেখানে 'নানারসে' তার নিজেকে লাভ করার সম্ভাবনা নেই। লাভের লোভ সেখানে বিকাশের পথে বাধাস্বরূপ। আবরণমুক্ত চিত্তই অহমিকা-মুক্ত শিল্প-সাহিত্যের জন্মস্থান। সেখানে যেহেতু তার অন্তরের অহেতুক আনন্দ তাই সেখানে মানুষের পরিচয় সেই লীলাময় ঈশ্বরের দোসররূপে, যিনি জগৎসৃষ্টি

করেছেন শুধু নিজেকেই বহুর মধ্যে পাওয়ার জন্যে। নিজেকে বহুরূপে এবং বহুর মধ্যে নিজেকে পাওয়ার ইচ্ছা থেকে বিশ্বেশ্বরের বিশ্বসৃষ্টি, ভারতীয় ভাববাদী-দের এই বিশ্বাস, উপনিষদে যার প্রকাশ ঘটেছে বহুভাবে—সেই বিশ্বাস রবীন্দ্র-নাথের উপর প্রভাব বিস্তার করার ফলেই, বোধ হয়, রবীন্দ্রনাথ জগৎস্রষ্টার 'লীলা'র সঙ্গে সাহিত্যিকর্মের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন। তাই সাহিত্যের ক্ষেত্রে স্পেন্সর-এর 'Surplus energy' তত্ত্বের প্রতি রবীন্দ্রনাথের কোন সমর্থন ছিল না। আবার এই বিশ্বাস থেকেই তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন, দুঃখের বর্ণনাও সাহিত্যের পাঠককে আনন্দ দিয়ে থাকে। দুঃখের কাহিনী মানুষের হৃদয়কে বিস্তৃত ক'রে তার অহং-এর সীমানা ভেঙে দেয়। ফলে ব্যক্তিজীবনে যা দুঃখদায়ক, সাহিত্য-শিল্পে তা হয়ে ওঠে আনন্দময়। সুতরাং সাহিত্যিক তাঁর প্রয়োজনোত্তীর্ণ অন্তরানুভূতিকে লীলাময় ঈশ্বরের মত নিষ্কাম আনন্দের সঙ্গে প্রকাশ করেন আর সাহিত্যরসিক তাঁর নিজেরই অন্তর্গত চাহিদাকে সাহিত্যে দেখেন মূর্তিলাভ করতে এবং লাভ করেন নিষ্কাম আনন্দ ;—'আপন স্বভাবগত এই চাওয়াটাকে মানুষ সাহিত্যে আর্টে উপভোগ করছে। একে বলা যায় লীলা, কল্পনায় আপনার অমিশ্র উপলব্ধি। রামলীলায় মানুষ যোগ দিতে যায় খুশি হয়ে, লীলা যদি না হত, তবে বুক যেত ফেটে।'

গ ॥ রস ও আনন্দ

সাহিত্যে সাহিত্যিক 'খেলা' করেন বা 'লীলা' করেন, সত্য যাই হোক না কেন, প্রয়োজনোত্তীর্ণ নিষ্কাম আনন্দময় জগৎনির্মাণই সাহিত্যিক বা শিল্পীর লক্ষ্য ; কান্টের সৌন্দর্যদর্শন থেকে গৃহীত একটি অনুসিদ্ধান্ত এই মতবাদ। কিন্তু সাহিত্যের জগতে সাহিত্যিক ছাড়া অপরপক্ষ যিনি আছেন সেই পাঠকের ভূমিকা কি বা তাঁর প্রাপ্য কি ? অবনীন্দ্রনাথ বলছেন, 'শিল্পকর্মীর দেখা এবং শিল্পরসিক ভাবুকের দেখা এই দুই দেখার ফলে পায় শিল্পরচনা পরিপূর্ণতা'।[১] এভাবে দেখলে শিল্পরচনায় শিল্পীর চেয়ে শিল্পরসিকের ভূমিকা কম প্রয়োজনীয় নয়। একদিক থেকে কথাটা ঠিকও। কারণ যতক্ষণ না শিল্পকর্ম শিল্পরসিকের হৃদয়ের সমর্থন লাভ করছে, ততক্ষণ তার অস্তিত্ব নিরর্থক। দার্শনিক সার্ত্রে এই কারণে শিল্পীর উর্ধ্বে শিল্পরসিকের স্থান নির্ণয় করেছেন। তাঁর মতে,

লেখকের দায়িত্ব 'প্রকাশ' করা এবং পাঠকের দায়িত্ব 'সৃষ্টি করা'। পাঠকের চিত্তলোকই সাহিত্যের প্রকৃত জন্মভূমি। ভাষায় সমর্পিত হওয়ার পর লেখকের চিন্ময়-অনুভূতি রূপান্তরিত হয় একটি বস্তুতে এবং সেই বস্তুরূপই আবার বিভিন্ন পাঠকের মনের আলোকস্পর্শে প্রতিভাত হয় বিভিন্ন রূপে। কিন্তু সাহিত্যরাজ্যে লেখক বা পাঠক কার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ সেই অবান্তর প্রসঙ্গ বাদ দিলে সন্দেহ নেই যে পাঠক ছাড়া সাহিত্য নিরর্থক। পাঠকবিবর্জিত সাহিত্যকর্ম যেন স্বগত সংলাপ। বস্তুত পাঠকের অস্তিত্ব গুরুত্বপূর্ণ সত্য বলেই প্রকাশ করা নিয়ে ভাবতে হয় লেখককে, ভাবতে হয় আভাস-ইঙ্গিত ও ছলা-কলা নিয়ে। আপন মনের মাধুরী মেশালেই সাহিত্যিকের কাজ শেষ হয় না, অপরের মনের মাধুরী সেই সঙ্গে যুক্ত হয় বলেই সাহিত্য হিসেবে সাহিত্যের স্বীকৃতি। কল্পনার প্রসাদে শিল্পসৃষ্টি করলেন শিল্পী আর কল্পনাশক্তি আছে বলেই সেই শিল্পকর্মের তারিফ করলেন রসিক সমঝদার। সুতরাং কল্পনাশক্তির অধিকারী দু'জনেই এবং কল্পনার দ্বারা চোখে দেখা সত্যকে মনের মত করেও নেন দু'জনেই। আবার আনন্দও ভোগ করেন দু'জনে। একজনের আনন্দ কাজ করে চলার আনন্দ এবং অপরজনের আনন্দ 'কাজটা দেখে চলার আনন্দ' তফাৎ শুধু এখানেই। 'আর্টিস্ট ও সমঝদার—এরা দুজনে ক্রিয়া করছে বিভিন্ন রকম'[২]। কিন্তু কাজটা বিভিন্ন রকম হলেও তারা ফল পেতে চলেছে এক। এই ফল হচ্ছে 'রস'। 'রসের দিক থেকে অনুপ্রাণিত হল যে-রচনা তাই হল আর্ট, রসের অবর্তমানে রচনাটি হল কম বা নো আর্ট'।[৩] রসের দিক থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে যিনি সাহিত্য সৃষ্টি করলেন তিনি তো স্রষ্টা, কিন্তু সাহিত্যের সমঝদার যিনি তিনিও রসেই প্রাণিত হন। এবং এই জন্য দু'জনকেই সাধনা করতে হয়। ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রে তাই 'সহৃদয়' রসিক পাঠকের প্রসঙ্গ সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। তাঁরা বিশ্বাস করতেন, সহৃদয় ছাড়া সাহিত্যের মর্যাদা নেই। এই সহৃদয়ের আস্বাদ্য বস্তুর নামই 'রস'। 'রসোত্তীর্ণ সাহিত্য' কথাটায় রসিকের স্বীকৃতিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। অভিনবগুপ্ত বলেছেন, রস ছাড়া কাব্য নেই—'ন হি তচ্ছূণ্যম্ কাব্যম্ কিঞ্চিদস্তি' যেহেতু 'রসেনৈব সবং জীবতি কাব্যম্'। কাব্যের প্রাণই রস। বিশ্বনাথ কবিরাজের মতে, রসাত্মক বাক্যই কাব্য। কিন্তু রসের বোধ জন্মে কার মধ্যে? এ বিষয়ে কিছু মতভেদ সত্ত্বেও অধিকাংশ আলংকারিকদের মতে সহৃদয় পাঠকের হৃদয়ই

কাব্যরসের আধার। রস-কে বলাই হচ্ছে 'সকল সহৃদয়-হৃদয়-সংবেদন-সাক্ষিকঃ' অথবা মম্মটের ভাষায়, রস হচ্ছে 'সকল সহৃদয়-হৃদয়-সংবেদনভাজা প্রমাত্রা গোচরীকৃতঃ'।

ভারতীয় আলংকারিকেরা এই সহৃদয়-হৃদয়ের সংবেদন-সাক্ষিক কাব্যের জগতে রস-সৃষ্টির কারণ হিসেবে বাহ্য উপাদান হিসেবে বিভাব ও অনুভাবের এবং আন্তর উপাদান হিসেবে স্থায়িভাব ও ব্যভিচারী ভাবের উল্লেখ করেছেন। তাঁরা বলছেন, বিভাবাদি যোগে স্থায়িভাবের যে পরিণতি ঘটে তা-ই 'রস' এবং যার মধ্যে ঘটে তিনি 'সহৃদয়'। যে-কোন পাঠককেই ভারতীয় অলংকার-শাস্ত্রে সহৃদয়ের মর্যাদা দেওয়া হয় নি। অভিনবগুপ্ত বলেছেন 'যেষাং কাব্যানুশীলনাভ্যাসবশাদ্ বিশদীভূতে মনোমুকুরে বর্ণনীয়তন্ময়ীভবনযোগ্যতা তে সহৃদয়সংবাদভাজঃ সহৃদয়াঃ'। পুনঃ পুনঃ কাব্যচর্চায় স্বচ্ছতাপ্রাপ্ত মনোমুকুরের অধিকারীই সেই সহৃদয় পাঠক, যাঁর অন্তরে রসের প্রতীতি বা অভিব্যক্তি ঘটে। অভিনবগুপ্তের মতে রসের উৎপত্তি হয় না, অনুমানও হয় না; হয় প্রতীতি। এই প্রতীতি সম্ভব হয় কাব্যভাষার ধ্বনিগুণ বা ব্যঞ্জনা-বৃত্তির জন্য। শব্দের বাচ্যার্থ বা লক্ষণাগত অর্থ নয়, ব্যঞ্জনাগত অর্থ বা প্রতীয়মান অর্থের বোধ থেকে রসানুভূতির জন্ম হয়। এই প্রতীয়মান অর্থ, আনন্দবর্ধন বলছেন, রমণীদেহের প্রসিদ্ধ অবয়বের অতিরিক্ত 'লাবণ্য' সদৃশ, বাহ্য অলংকারের সংযোগ বা বিয়োগে যার পরিবর্তন ঘটে না। এই প্রতীয়মান অর্থ বোধের জন্য শব্দার্থের জ্ঞান থাকাই যথেষ্ট নয়, কাব্যার্থের বোধ থাকাও প্রয়োজন ('শব্দার্থ-শাসন জ্ঞানমাত্রেনৈব ন বেদ্যতে / বেদ্যতে স তু কাব্যার্থতত্ত্বজ্ঞৈরেব কেবলম্'— ধ্বন্যালোকঃ, ১।৫)। কাব্যার্থের বোধবিশিষ্ট সেই পাঠকই সহৃদয়পাঠক। কিন্তু এই বোধ যে 'স্বয়ম্ভু' নয়, তার জন্য পুনঃ পুনঃ কাব্যচর্চার প্রয়োজন, সেই সত্যটি ভারতীয় অলংকারিকের দৃষ্টি এড়ায় নি। সুতরাং যিনি কাব্যরচনা করেছেন তিনি যেমন রসসৃষ্টির সাধনা করেন, তেমনি যিনি কাব্যপাঠ করছেন তিনিও কাব্যের রস আস্বাদের জন্য সাধনা করেন ('রস আস্বাদ' বলা হল, যদিও যা আস্বাদ করা হল তা-ই রস)। অতএব কাব্যের জগতে স্রষ্টা ও রসিক উভয়েই সাধক। পার্থক্য শুধু এই, একজনের সাধনা দানের জন্য, অপরজনের সাধনা গ্রহণের জন্য। একজনকে সাধনা করতে হয় অভিজ্ঞতালব্ধ সত্যকে কল্পনা-সমৃদ্ধ ক'রে অপরের হৃদয়ের দুয়ারে পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্যে আর অপর পক্ষকে

সাধনা করতে হয় নিজের হৃদয়ের গভীরে অন্যের অভিজ্ঞতা ও কল্পনাকে বরণ করার জন্যে। এই দ্বিতীয় ব্যক্তির অন্তরের 'রতি' প্রভৃতি সংস্কার বা বাসনাই কাব্যপাঠ বা নাট্যদর্শনকালে রসে অভিব্যক্তি লাভ করে। কিন্তু এই বাসনা বা সংস্কারই 'রস' নয়, 'ভাব'; ইমারত নয়, ভিত্তি মাত্র। এই রসের ভিত্তি সহৃদয়ের হৃদয়ের মধ্যে, অভিনেতা বা ঐতিহাসিক নায়কের মধ্যে নয়। দশরূপককার ধনঞ্জয়ের ভাষায় 'রসঃ স এব স্বাদ্যত্বাদ্ রসিকস্যৈব বর্তনাৎ / নানুকার্যস্য বৃত্তত্বাৎ কাব্যস্যাতৎপরত্বতঃ'।

কিন্তু দর্শকের হৃদয়ের 'রতি' প্রভৃতি বাসনা বা সংস্কার তো ব্যক্তিগত। তাহলে রসের অভিব্যক্তি ঘটে কি ক'রে? অভিনবগুপ্তাচার্য রসের সংজ্ঞা দিচ্ছেন, 'স্ব সংবিদানন্দ চর্বণ ব্যাপার রসনীয় রূপো রসঃ'। এই 'চর্বণা' হচ্ছে অভিব্যক্তি বা 'বীত বিঘ্ন-প্রতীতি'। বিঘ্ন কি? বিঘ্ন হচ্ছে জাগতিক লাভালাভ, প্রয়োজনাপ্রয়োজন। কারণ জাগতিক কোন উদ্দেশ্য বা ভোগসুখের বাসনা মানুষের চিত্তকে আবৃত করে স্বার্থপরতার দ্বারা। সাধারণ অবস্থায় মানুষ নিজের চিন্তাতেই মশগুল থাকে যা আলংকারিক পরিভাষায় রজঃ ও তমোগুণে আচ্ছন্ন থাকে মানুষের মন। এই আবৃতচিত্ত-ব্যক্তির পক্ষে সহৃদয় হওয়া সম্ভব নয়। অতএব তা বিঘ্নস্বরূপ। তারপর কাব্যের বিভাবাদি পাঠকের মনের উপরকার আবরণ ছিন্ন করে (বিভাবাদি সমূহাবলম্বনেন রত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যাভিব্যক্তিশ্চর্বণা সা চ ভগ্নাবরণা চিৎ)। এই আবরণ মুক্ত চিত্তই রসের আধার এবং যিনি এই মনের অধিকারী তিনিই সহৃদয়। মন যখন আবরণ মুক্ত হয়ে গেল তখন ব্যক্তিস্বার্থবিস্মৃত সহৃদয়ের হৃদয়ে সত্ত্বগুণের উদয় হল, ব্রহ্মাস্বাদতুল্য আনন্দের উদ্রেক হল, বেদ্যান্তর-স্পর্শশূন্যতা ঘটল। এইজন্য রসকে বলা হচ্ছে চিত্তবিস্তারক। বিশ্বনাথ কবিরাজ তাঁর সাহিত্যদর্পণে (তৃতীয় পরিচ্ছেদ) লিখছেন—'সত্ত্বোদ্রেকাদখণ্ড স্বপ্রকাশানন্দচিন্ময়ঃ। / বেদ্যান্তরঃ স্পর্শশূন্যো ব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ / লোকোত্তর চমৎকার-প্রাণঃ কৈশ্চিৎ প্রমাতৃভিঃ'...ইত্যাদি। সত্ত্বগুণের উদ্রেককারী বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্য ব্রহ্মাস্বাদসহোদর স্বপ্রকাশ অখণ্ড চিন্ময়ানন্দ ও লোকোত্তর আনন্দের নামই হচ্ছে রস। অর্থাৎ রসানুভূতির মুহূর্তে চিত্তাবরক রজঃ ও তমোগুণের বিলোপ হয়, ফলে প্রয়োজনের জগৎসম্পর্ক বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয় (বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্য)। অন্য কোন জ্ঞানের দ্বারা রসের অনুভূতি ঘটেনা (স্বপ্রকাশ)। বিভাবাদির দ্বারা অখণ্ড মূর্তিতে

আবির্ভূত এই রস অজাগতিক আনন্দদায়ক ও ব্রহ্মসাক্ষাৎকার তুল্য।

রসের এই স্বভাবের দিকে তাকিয়েই বোধ হয় ভারতীয় আলংকারিকেরা শৃঙ্গারাদি আটটি ('শান্ত'কে ধ'রে নয়টি) রসকে এক-বচনাত্মক 'রস' শব্দের দ্বারা ব্যঞ্জিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। শৃঙ্গার, বীর ইত্যাদি তাঁদের মতে, একই রসের বিভিন্ন নাম। অভিনব গুপ্ত লিখেছেন, ভরতও একটিমাত্র রসের অস্তিত্বই স্বীকার করেছেন। 'ন হি রসাদৃতে কশ্চিদর্থঃ প্রবর্ততে', এই সূত্র উল্লেখ করে ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অভিনব গুপ্ত লিখছেন 'তত এব নির্বিঘ্ন স্ব-সংবেদনাত্মক বিশ্রান্তি লক্ষণেন রসনা পরপর্যায়েণ ব্যাপারেণ গৃহ্যমাণত্বাদ্ রসশব্দেনাভিধিয়তে। তেন রস এব নাট্যম্, যস্ত ব্যুৎপত্তিঃ ফলমিত্যুচ্যতে। তথা চ রসাদৃতে ইত্যত্র একবচনোপপত্তিঃ'। আলংকারিক ভোজরাজের (একাদশ শতক) রসতত্ত্বের টীকাকার ভট্টনরসিংহ বলেছেন, রস একটি এবং কেবল একটি মাত্র। সুতরাং 'অষ্টাবেব স্থায়িনঃ ইতি কুতঃ?' রস যে একটিই এই বিষয়ে সুগভীর ও সুদীর্ঘ আলোচনা করেছেন কবিকর্ণপুর গোস্বামী। তিনি রজঃ ও তমোগুণ বিনির্মুক্ত একমাত্র সত্ত্বগুণের দ্বারা গঠিত রসানুভূতিকে 'এক' বলে উল্লেখ করে বলেছেন, বিভাবাদির বিভিন্নতায় এক রসেরই বিভিন্ন অভিধা। অলঙ্কারকৌস্তভের ৫ম পরিচ্ছেদে তিনি লিখছেন 'রসস্ত আনন্দধর্মত্বাৎ একধ্বম্, ভাব এবহি।' এবং 'সামাজিকতয়া সতাং সামাজিকানাম্ এক এব কশ্চিদাস্বাদঙ্কুরকন্দো মনসঃ কোঽপি ধর্মবিশেষঃ স্থায়ী। স তু বিভাবস্য উক্তপ্রকারদ্বিবিধস্য ভেদৈরেব ভিদ্যতে।' এইভাবে ভারতীয় আলংকারিকেরা রসের যে স্বরূপ আলোচনা করেছেন তা জার্মাণ দার্শনিক কাণ্ট-এর 'disinterested satisfaction' কথাটিরই সদৃশ। যে-তৃপ্তিতে জড়িয়ে থাকে ব্যক্তিগত লাভালাভের প্রশ্ন, কাণ্ট-এর নন্দনতত্ত্বে তাকে 'aesthetic pleasure' বলা হয় নি কখনও।* রসবাদীরাও ব্যক্তিগত দুঃখ-সুখের প্রসঙ্গকে রসের জগৎ থেকে দূরে রাখতে চেয়েছিলেন। পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ যখন কাব্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছিলেন 'রমনীয়ার্থপ্রতিপাদকশব্দঃ কাব্যম্' তখন তিনি 'রমনীয় অর্থপ্রতিপাদক শব্দ' ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে স্পষ্টই জানালেন 'পুত্রস্তে জাতঃ' বা 'ধনং তে দাস্যামি' জাতীয় কথা তিনি কাব্য পদবীতে গণ্য করছেন না। আসলে এই জাতীয় উক্তিতে ব্যক্তিমানুষের সুখ-সৌভাগ্যের কথাই প্রধান বলে তা 'disinterested' নয় এবং সেই কারণে রসসৃষ্টিও করে না। নিষ্কাম তৃপ্তি ছাড়া রস নেই। সেইজন্যই ভরতের রসসূত্রের অন্যতম

ব্যাখ্যাতা ভুক্তিবাদী ভট্টনায়ক বলেছেন রসের সাধারণী-করণের কথা। এই 'সাধারণী-করণ' কী ? বিশ্বনাথ 'সাহিত্য দর্পণে' লিখছেন 'ব্যাপারোঽস্তি বিভাবাদের্নাম্না সাধারণীকৃতিঃ' (৩।৯)। 'প্রমাতা তদভেদেন স্বাত্মানং প্রতিপদ্যতে' (৩।১০)। অর্থাৎ বিভাব প্রভৃতি সাধারণীকৃতিরূপ ব্যাপারের ফলে সহৃদয় বিভাবাদির সঙ্গে নিজের অভিন্নতা বোধ করেন। এই 'সহৃদয়' এবং কাব্যাদিগত বিভাব ইত্যাদি এমন এক নূতন ধরণের ঐক্য লাভ করে যার ফলে সহৃদয়ের নিজের বৈশিষ্ট্য বলে কিছু থাকে না। এই সাধারণীকৃতি নামক ব্যাপার থেকে আত্মাতে শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে অভেদজ্ঞান হয় এবং সেই অভেদ-জ্ঞান থেকেই সামাজিকের নায়কাদি বিষয়ে রত্যাদির উদয় হয়। এই সাধারণী-কৃতির দ্বারাই যে-বস্তু এই জগতে অনিত্য কাব্যজগতে তাই হয়ে ওঠে নিত্য, শাশ্বত। ব্যক্তিত্ব-বিসর্জিত রসানুভূতির জগতে 'সাধারণী করণ' কথাটি ভারতীয় আলংকারিকদের এক অনবদ্য সৃষ্টি। ভারতীয় আলংকারিকেরা যে-সাধারণী-করণের কথা বলেছেন সেই কথাই যেন কাণ্ট-এর 'Critique of Judgement' গ্রন্থে এইভাবে ব্যক্ত হ'ল : 'Consequently the judgement of taste, accompanied with the consciousness of separation from all interest, must claim validity for every man, without this universality depending on objects. That is, there must be bound up with it a title to subjective universality.' ⁴

কাণ্ট-কথিত 'Subjective universality'ই ভারতীয় রসতত্ত্বের প্রকৃত স্বরূপ।⁵ এইজন্যই রসকে তাঁরা বলতেন 'লোকোত্তর-চমৎকার-প্রাণ'। লোকোত্তর-চমৎকারিত্বই নাটক বা কাব্য থেকে অনুভূত হয়, যেহেতু প্রথমতঃ দর্শক বা পাঠক ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতির ভাবনা থেকে মুক্ত হয় নাট্য-দর্শন মুহূর্তে এবং কাব্য পাঠকালে ; দ্বিতীয়তঃ, দর্শক বা পাঠক অনুভব করেন এ ঘটনা তাঁর ব্যক্তি-জীবনের নয় অথচ তাঁর জীবনেই ঘটা সম্ভব আবার এই ঘটনা সম্পূর্ণরূপে অপরের অথচ অপরেরও নয়। একই সঙ্গে এই বিপরীত ধরণের অনুভূতি বাস্তবে সম্ভব হয় না, কিন্তু রস বা কাব্যের জগতেই সম্ভব হয়। বাস্তবের অসম্ভব কাব্যে সম্ভব হয় বলেই কাব্যের বা রসের জগৎ লোকোত্তর আনন্দের (চমৎকার) জগৎ।

লৌকিক আনন্দে ব্যক্তিগত স্বার্থ জড়িত থাকে। কিন্তু কাব্য-সাহিত্যে বাস্তব-প্রয়োজন ও জীবনের মৌহূর্তিক উপলব্ধির কোন স্থান থাকে না। এই দিকে লক্ষ্য রেখেই থিয়োডর লিপ্‌স্ (১৮৫১-১৯৪১) শিল্প-সাহিত্যে *'Einfühlung'* শব্দটির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। জার্মানে *'Einfühlung'* তত্ত্বের প্রথম প্রবক্তা ছিলেন কার্ল গ্রুস, ফ্রান্সে ছিলেন V. Basch, ইংলণ্ডে ভার্নন লী। এই *'Einfühlung'* বা *Empathy* তত্ত্বের প্রচারকেরা বস্তু ও চেতনার দ্বন্দ্ব মানেন না। কাব্য-সাহিত্য পাঠকালে, তাঁরা মনে করেন, পাঠকের সঙ্গে সাহিত্য-বর্ণিত বিষয়বস্তুর একাত্মকতা ঘটে থাকে। এই একাত্মকতাই তাঁদের মতে শিল্পজ আনন্দের কারণ। ভারতীয় আলংকারিকেরা পাঠক ও কাব্যাদিগত বিভাবাদির মধ্যে একাত্মকতা লক্ষ্য করেই 'সাধারণীকরণ' কথাটি ব্যবহার করেছিলেন। Empathy মতের প্রচারকেরা বলেন, বস্তু ও চেতনার একাত্মকতা সম্পূর্ণরূপে স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাপার, কোন রকম চেষ্টাকৃত ব্যাপার নয়। যেখানে এই একাত্মকতার ভাব, হয় আংশিক নয় খণ্ডিত, সেখানে *'Einfühlung'* ঘটে না, ঘটে *'Nachfühlung'* এবং *'Zufühlung'*। কিন্তু নাট্যবর্ণিত বিষয়বস্তুর সঙ্গে দর্শকের ব্যক্তিত্বের এই একীকরণের ফলে যে *Einfühlung*-এর সৃষ্টি হয় তার ফলে দর্শকের আনন্দলাভের কোন উপায় থাকে কি? অথচ নাটক বা কাব্য দর্শন বা পাঠে আমরা তো আনন্দই লাভ করে থাকি। *Einfühlung* মতবাদীরা বলছেন, *Einfühlung* ঘটলে পাঠকের অন্তর্গত 'pantheistic urge to reunion with the universe' চরিতার্থ হয় বলেই আমরা কাব্য বা নাটক থেকে আনন্দ লাভ করি। এই আনন্দ আবার যেহেতু বাস্তব-প্রয়োজন সিদ্ধির সঙ্গে সংযুক্ত নয়, সম্পূর্ণরূপে ভাবজগতের ব্যাপার, তাই ভার্নন লী বলছেন, এই আনন্দ 'Contemplative' এবং সুচিরস্থায়ী। (এই আনন্দেরই যে-অভিব্যক্তি ঘটেছিল রোমান্টিক কবিদের মধ্যে সেই সত্যটি লক্ষ্য করেছেন ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক পি. স্টার্ন।) কিন্তু কল্পনার জগতে যদি পাঠক কাব্যবর্ণিত চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়েন তাহ'লে দুঃখের নাটক পাঠে বা দর্শনের জন্য রসিকদের এত আগ্রহ কেন? তার উত্তরে *Einfühlung* মতবাদীরা বলেন, রসিকের আগ্রহবৃদ্ধি বা আনন্দলাভের কারণ হচ্ছে 'Joyous feeling of sympathy'। কিন্তু ভারতীয় রসবাদীরা বলেছেন, দর্শকের হৃদয়ে একই সঙ্গে নৈকট্যবোধ ও দূরত্ববোধ থাকলে তবেই আনন্দলাভ

সম্ভব হয়। আবার এই কথাটাই বলেছিলেন রোজার ফ্রাই তাঁর 'Vision and Design'-এ এইভাবে : 'In the imaginative life,....we can both feel the emotion and watch it. When we are really moved at the theatre we are always both on the stage and in the auditorium.'[৭] দর্শক যখন অনুভব করেন, এই দুঃখ তাঁর অথচ তাঁর নয়, অপরের অথচ অপরের নয়, তখনই তিনি, ভারতীয় আলংকারিকের ভাষায়, 'রসানুভব' করেন বা বলা যায় আনন্দলাভ করেন। পূর্বেই বলেছি এই মিশ্র অনুভূতি 'লোকোত্তর', বাস্তবে সম্ভব নয়। বাস্তবে দুঃখের কারণ থেকে দুঃখ এবং আনন্দের কারণ থেকে আনন্দই লাভ হয় অর্থাৎ কার্য ও কারণ থাকে অবিচ্ছিন্ন। সাহিত্যের জগতে এই লৌকিক ন্যায়শাস্ত্রানুমোদিত কারণ-কার্যের অবিচ্ছিন্নতা বলবান থাকে না। অ্যারিষ্টটল এই সত্য লক্ষ্য করেই 'ট্রাজেডি' প্রসঙ্গে 'ক্যাথারসিস' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। অ্যারিষ্টটলের মতে 'ভীতি' ও 'করুণা'র মিশ্রণে 'ক্যাথারসিস' ঘটে বা 'ট্রাজিক প্লেজার' লাভ হয়। মানুষ 'ভীত' হয় স্বার্থ ভেবে এবং 'করুণা' বোধ করে অপরের জন্য। ভীতির মুহূর্তে ব্যক্তিত্ব থাকে বিজড়িত এবং 'করুণা'র মুহূর্তে সৃষ্টি হয় দূরত্ব। লিপ্ততা এবং দূরত্বের জাগতিক বৈপরীত্য ট্রাজেডিতে তথা সাহিত্যে থাকে না বলেই ট্রাজেডি বা সাহিত্য পাঠ থেকে লব্ধ আনন্দ জাগতিক আনন্দের সমতুল নয়। কিন্তু অ্যারিষ্টটল নিদানশাস্ত্রোক্ত যে-'ক্যাথারসিস' শব্দটি ট্রাজেডি প্রসঙ্গে ব্যবহার করেছেন তা নিয়ে পরবর্তীকালে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। নিদানশাস্ত্রের 'ক্যাথারসিস' দৈহিক ঘটনা আর কাব্যানন্দ সম্পূর্ণ মানসিক। অতএব কি ক'রে এই দুই এক হবে? এমন কি 'ক্যাথারসিস' বা 'পারগেশন' শব্দটি বাচ্যার্থে গ্রহণ করলে রঙ্গালয় ও চিকিৎসালয়ে ভেদ থাকে না কিছু, এমন কথাও বলেছেন অনেকে। হাম্‌ফ্রে হাউস শব্দটিকে 'ভারসাম্য' অর্থে গ্রহণ করে সমালোচনার জগতে উত্থিত 'ক্যাথারসিস'-সংক্রান্ত তর্কের ঝড় প্রশমিত করার চেষ্টা করেছেন। ট্রাজেডির আনন্দ ছাড়াও অ্যারিষ্টটল কাব্য-সাহিত্যের আনন্দ প্রসঙ্গে (ক) অনুকরণের আনন্দ এবং (খ) ছন্দ-অলংকারে সুগঠিত রূপদর্শনের আনন্দের কথাও বলেছেন। যদিও কাব্যরূপের লক্ষ্যই হচ্ছে রসসৃষ্টি বা আনন্দ দান, তবু নিছক ছন্দ-অলংকারের রূপগত পারিপাট্যে মুগ্ধতা ও 'রসানুভূতি' এক জিনিস নয়। কবিতা হিসেবে সত্যেন্দ্রনাথের 'তাজ'

বর্ণনার কৌশলে মনোমুগ্ধকর কিন্তু রসসৃষ্টির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের 'শাজাহান'-এর স্থান 'তাজ'-এর অনেক ঊর্ধ্বে। 'তাজ'-এর আকর্ষণ বর্ণনার নিপুণতায়, ভাষা ও অলংকারের পারিপাট্যে; কিন্তু 'শাজাহান'-এর আবেদন স্পষ্টতঃই আমাদের রসানুভূতির জগতে।

কাব্য, বিশেষ করে দুঃখের কাব্য বা নাটক থেকে আমরা কেন আনন্দলাভ করি অ্যারিষ্টটলের পর তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। কেউ বলেছেন, 'দুঃখ ও আনন্দের মধ্যে হেতুগত কোন পার্থক্য নেই। এই দুই অনুভূতির মধ্যে আছে সূক্ষ্ম একটি মায়াযবনিকার অন্তরালমাত্র' (ফঁতেঁল); কেউ বলেছেন, 'মানুষের আত্মার ভিতর যে জৈবিক সত্তা ও অন্তরতম সত্তার দুই ভাগ থাকে, তাদের সামঞ্জস্য থেকে আনন্দের সৃষ্টি। এবং তীব্রতম দুঃখই মহত্তম আনন্দের কারণ' (শেলী)। অন্যদিকে দার্শনিক শোপেনহাওয়ার বলেছেন 'প্যাশনের ঝড়, দুঃখ ও ভীতির অসহনীয় চাপ এবং ইচ্ছার যাতনা সব কিছু প্রশমিত হয় কাব্যপাঠের ফলে। অহং-চেতনার বিলোপ ঘটে। লাভ হয় আনন্দ'। রবীন্দ্রনাথ যদিও জীবনের গোড়ার দিকে সৌন্দর্যসৃষ্টিকেই কবির লক্ষ্য বলেছিলেন, পরে নিজের অভিমত সংশোধন করে বললেন সৌন্দর্য-সৃষ্টি নয়, সৌন্দর্যসৃষ্টির দ্বারা আনন্দদানই কবির লক্ষ্য। নিজের সংশোধিত অভিমত তিনি জানিয়েছিলেন ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে। অবশ্য তার আগে বহুবার আনন্দদানকেই কবির উদ্দেশ্য বলে ঘোষণা করেছেন। ১৩১৪-বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত 'সৌন্দর্য ও সাহিত্য' প্রবন্ধে কবি বললেন, 'একটি কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, সাহিত্য দুইরকম করিয়া আমাদিগকে আনন্দ দেয়। এক, সে সত্যকে মনোহররূপে আমাদিগকে দেখায়; আর, সে সত্যকে আমাদের গোচর করিয়ে দেয়।' দেখা যাচ্ছে, সত্যকে 'মনোহর' এবং সত্যকে 'গোচর' দুটি কথার মধ্যে মূল কথাটা হচ্ছে 'সত্য'। সাহিত্যিকের কাজ 'সত্য'কে নিয়ে এবং এই সত্য সাহিত্যে রূপায়িত হয় বলেই সাহিত্য আনন্দদায়ক— রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য থেকে এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যেতে পারে। তারপর শুধু রূপায়ণ নয়, সত্যকে 'প্রত্যক্ষবৎ' এবং 'মনোহর' রূপে প্রতিষ্ঠিত করে বলেই সাহিত্য আনন্দদায়ক, কবির মত অনুসরণ করে এই তত্ত্বে পৌঁছুনো যায়।* সাহিত্যিক সত্যকে মনোহর রূপে উপস্থিত ক'রে আনন্দদান করে, এই ধারণায় রবীন্দ্রনাথ অবশ্য অ্যারিষ্টটল থেকে বেশী দূরে যান নি। কিন্তু আনন্দদানের

আরেকটি যে কারণ তিনি দেখিয়েছেন—সাহিত্য সত্যকে 'গোচর করিয়া দেয়' বলে সাহিত্য থেকে আনন্দলাভ হয়—তা কিন্তু তত্ত্ব হিসেবে খুব প্রাচীন নয়। সাধারণ ভাবে সাহিত্য থেকে আনন্দলাভের কারণ ব্যাখ্যা ছাড়াও, রবীন্দ্রনাথ ট্রাজেডি আমাদের কেন আনন্দ দেয় সে বিষয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অভিমত প্রকাশ করেছেন: (১) 'দুঃখের তীব্র উপলব্ধিও আনন্দকর, কেননা সেটা নিবিড় অস্মিতা-সূচক।……গভীর দুঃখ ভূমা, ট্রাজেডির মধ্যে সেই ভূমা আছে—সেই ভূমৈব সুখম্'।[৮] (২) 'দুঃখের অভিজ্ঞতায় আমাদের চেতনা আলোড়িত হয়ে ওঠে।… দুঃখের অনুভূতি সহজ আরামবোধের চেয়ে প্রবলতর। ট্রাজেডির মূল্য এই নিয়ে'[৯]। এই ধারণা অবশ্যই অ্যারিস্টটলীয় নয়। ভারতীয় আলংকারিকেরা রসের ব্যাখ্যায় যে ধরণের অনুভূতির কথা বা চিত্তবিস্তারের কথা বলেছেন, রবীন্দ্র-নাথের 'ট্রাজেডির আনন্দ' ব্যাখ্যা অনেকটা সেই জাতীয় বলে মনে হয়।

মোটকথা সাধারণভাবে একথা মেনেছেন সকলেই যে, সাহিত্য হচ্ছে আনন্দ-দায়ক রূপনির্মিতি। ট্রাজেডির নায়কের দুঃখজনক পরিণতিও পাঠক বা দর্শকদের কাছে আনন্দদায়ক, সেই আনন্দের কারণ ও স্বরূপ যাই হোক না কেন। আবার শুধু ভাববাদীরা নয়, বস্তুবাদীরাও এই সত্য স্বীকার করেন: 'The public have a right to be entertained……And the artists have a right to be allowed to entertain.'[১০] কিন্তু শিল্পজ আনন্দের স্বরূপ নিয়ে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন মতবাদ, যেগুলি কয়েকটি প্রধান সূত্রে এইভাবে নিবদ্ধ হতে পারে: (ক) নৈতিক জগৎ শোধনের আনন্দ। প্লেটো এই মতের সূত্রধার। অ্যারিস্টটলের ট্রাজেডি সম্পর্কিত আলোচনায় তার প্রভাব আছে। আর্নল্ড এবং রাস্কিনের রচনায় এই মতের বিস্তার আছে। বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র এই মতের পোষক। (খ) ব্যক্তি ও সমাজের মঙ্গলময় পরিণতি দর্শনের আনন্দ। মার্ক্সীয় দর্শনে বিশ্বাসীরা এই মতের সমর্থক। (গ) আত্মিক পরিতুষ্টির আনন্দ। অভিনবগুপ্তাচার্য, পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ এবং পাশ্চাত্যের দার্শনিকদের মধ্যে প্লোটিনিউ (প্রাচীনকালে) এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে কাণ্ট ও হেগেল এই মতবাদের প্রচারক। (ঘ) কল্পনার লীলা-জাত আনন্দ। অ্যারিস্টটলের রচনায় এই মতের বীজ আছে। অষ্টাদশ শতকে এডিসন এবং বিশ শতকে ক্রোচে এই মতের প্রচারক। (ঙ) ইন্দ্রিয়বোধের পরিতৃপ্তিজাত আনন্দ। মনস্তাত্ত্বিক ফ্রয়েড এই মতের প্রবক্তা।

(চ) সুন্দর রূপ দর্শনের আনন্দ। অ্যারিষ্টটলের আলোচনায় এই মতবাদের অঙ্কুরোদ্গম এবং উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর কলাকৈবল্যবাদীদের দ্বারা এই মতবাদের প্রসার। ...এই সমস্ত বিভিন্ন মতবাদের প্রত্যেকটিই আংশিকতা-দোষদুষ্ট। কিন্তু বিভিন্ন মতবাদ থেকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে পারে যে, সাহিত্যের দ্বারা যে পাঠকের অন্তরে রসানুভূতির জাগরণ ঘটানো বা আনন্দ দান করা হয়ে থাকে এ বিষয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিল্পী ও দার্শানিকরা সকলেই একমত। পাঠকেরা সাহিত্যপাঠে আনন্দলাভ করেন, এ বিষয়ে সংশয় নেই; কারণ দুঃখ পাওয়ার জন্য কেউই সাধনা করেন না। এমন কি তপস্বীরাও যে দুঃখ বা যন্ত্রণাকে বরণ করেন তারও উদ্দেশ্য মহাসুখলাভ বা নির্বাণ। অতএব জগতে সকলেই আনন্দ সন্ধান করেন। তবে সাহিত্যের আনন্দ জাগতিক অভীষ্টলাভের আনন্দ নয়, কারণ সাহিত্য থেকে পার্থিব সুখ-সৌভাগ্য লাভ হয় না। শুধু জাগতিক সুখ নয়, অজাগতিক 'মোক্ষ' বা 'নির্বাণ'ও লাভ হয় না সাহিত্য থেকে, যদিও ভারতীয় আলংকারিকেরা কাব্য-সাহিত্য থেকে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গ লাভের কথা বলেছিলেন। তবে সেই 'মোক্ষ' অর্থে তাঁরা ব্যক্তিগত জাগতিক কামনার দাসত্ব থেকে মুক্তি বুঝিয়েছিলেন মনে হয়। (মোনিয়ের উইলিয়ম্‌স্ 'মোক্ষ' শব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দ হিসেবে 'emancipation', 'liberation' প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন)। সুতরাং কাব্য-সাহিত্য থেকে যেমন পার্থিব সুখ-সৌভাগ্য লাভের আনন্দ মেলে না, তেমনি মেলে না ভবযন্ত্রণা থেকে চিরমুক্তিলাভে' ঋষি-কল্পিত দিব্যানন্দ। এই আনন্দের স্বরূপই আলাদা। বিশ্বনাথ কবিরাজ একে বলেছেন 'ব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ'। এখানে 'সহোদর' শব্দে 'পার্থক্য' বোঝালে অর্থ দাঁড়ায় কাব্যের আনন্দ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারজাত আনন্দের চেয়ে পৃথক, যদিও কাব্যপাঠজাত আনন্দ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারজাত আনন্দের উৎস একই—অনুভব-কর্তার হৃদয়লোক। আবার পার্থিব জগতের ভাষায় এই উভয় আনন্দের কোনটিরই প্রকাশ সম্ভব নয়। কিন্তু প্রশ্ন হতে পারে, ধনলাভে বা পুত্রমুখদর্শনে তথা জাগতিক সৌভাগ্যলাভে মানুষের যে-আনন্দ 'আনন্দ' হিসেবে সাহিত্য-পাঠের আনন্দ থেকে তা কেন পৃথক এবং কেনই বা নিকৃষ্ট? পুত্রের মধ্যে পিতা নিজেকে দেখে যে-আনন্দ লাভ করেন, বা ধনী ধন উপার্জনের মধ্যে নিজের সাফল্য দর্শন-হেতু যে আনন্দলাভ করেন তা কি নিজেকেই দেখার আনন্দ নয়? এখন যদি পুত্রের মধ্যে নিজেকেই সাক্ষাতের

আনন্দ লাভ হয় পিতার, তাহ'লে সাহিত্যে পাঠকের নিজেরই উপলব্ধি-সাক্ষাতের আনন্দের সঙ্গে তার তো পার্থক্য থাকা উচিত নয়। দুটি ক্ষেত্রে প্রায় একই জাতীয় 'সাক্ষাৎকার'.নামক ব্যাপার ঘটছে। কিন্তু লক্ষ্য করা যেতে পারে, (ক) কাব্যানন্দলাভের মুহূর্তে পাঠকের দ্বারা নিজের উপলব্ধি সাক্ষাৎকারের ঘটনা ঘটে অর্থাৎ অ-লৌকিক সাক্ষাৎকার ঘটে এবং সন্তানের মধ্যে বা সম্পদের মধ্যে ঘটে লৌকিক সাক্ষাৎকার। (খ) দ্বিতীয়তঃ, কাব্যপাঠে যে ধরণের 'জ্ঞান' লাভ হয় বা সুকুমার বৃত্তির স্ফুরণ ঘটে তা কোন জাগতিক ঘটনা থেকে লাভ হয় না। (গ) তৃতীয়তঃ, কাব্যপাঠ থেকে বিশ্বাস জন্মে সুনীতির উপর। জাগতিক নীতি নিয়মের প্রতিষ্ঠা লাভ যদি না ঘটত, যদি পাপিষ্ঠের জয় এবং পুণ্যবানের মৃত্যু কোন নাটকে প্রতিষ্ঠিত হ'ত তাহ'লে তা থেকে কি আমরা আনন্দ পেতাম? সুতরাং যত নিস্পৃহ নিষ্কাম আনন্দের কথাই বলি না কেন, নাটকের পরিণতির সঙ্গে আমরা আমাদের ব্যক্তিত্বকে কখনও নিঃসম্পর্কিত রাখতে পারি না। আসলে কাব্য-পাঠের আনন্দ আমাদের আবেগ, বুদ্ধি, আত্মিক সুখবোধ সব কিছু জড়িয়ে এক উপাদেয় ব্যাপার।

সাহিত্য থেকে লাভ হয় আনন্দ, একথা বলেই অনেকে বলেন, আবার সাহিত্যের উদ্দেশ্যও আনন্দদান। ভারতীয় ভাববাদীরা সাহিত্যিককে জগৎস্রষ্টার সঙ্গে উপমিত করে বলেছেন, আনন্দ থেকে যেমন জগতের সৃষ্টি, আনন্দেই লয়, তেমনি আনন্দ থেকে কাব্যের জন্ম, আনন্দই পরিণাম। শুধু তাই নয়, কবি-প্রজাপতি তাঁর জগৎকে নিজের পছন্দ মত পরিবর্তন সাধনে সক্ষম। সাহিত্যিকের উদ্দেশ্য আনন্দ দান, এই ধরণের ভাববাদী ধারণার বিরুদ্ধে কিছু কিছু প্রশ্ন উত্থা-পিত হয়েছে। সাহিতিক সাহিত্য রচনার মুহূর্তে কি আনন্দদানের জন্যই উন্মুখ হয়ে থাকেন? নিজের অন্তরের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিকে সঠিক প্রকাশ করা ছাড়া সাহিত্যিকের অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকে কি? পাঠকও আবার দুঃখ পাবে বলে সাহিত্য-পাঠ শুরু করেন না যেমন, তেমনি আনন্দলাভের দিকে লক্ষ্য রেখেও সাহিত্য-পাঠ শুরু করেন কি? আমাদের ধারণা, পাঠকের কাছে 'আনন্দ' লক্ষ্য নয়, লাভ; বেতন নয়, উপরিপাওনা। আবার যে-কোন লেখকই শুধু প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখলে পরিণামে উদ্দেশ্যভ্রষ্ট হতে বাধ্য। এই উদ্দেশ্য সমাজের হিতসাধন বা পাঠককে আনন্দদান, যাই হোক না কেন। সমাজের মঙ্গল বা আনন্দ নিঃসন্দেহে সাহিত্যের by-product। আই. এ. রিচার্ডস্ এদিকে আমাদের

দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন নির্ভুলভাবে : 'It is the poem in which we should be interested, not in a by-product of having managed successfully to read it........It is no less absurd to suppose that a competent reader sits down to read for the sake of pleasure, than to suppose that a mathematician sets out to solve an equation with a view to the pleasure its solution will afford him'[১১] মোট কথা, আনন্দদানকেই লক্ষ্য স্থির করে যদি লেখক অগ্রসর হ'ন, অথবা আনন্দলাভই একমাত্র উদ্দেশ্য ভেবে যদি পাঠক সাহিত্য-পাঠে ব্রতী হন তাহ'লে এই পরিস্থিতির উদ্ভব অস্বাভাবিক নয় যে, লেখক ও পাঠকের মধ্যবর্তী দূরত্ব ক্রমেই বিস্তারলাভ করতে লাগল। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের লক্ষ্য যদি হ'ত পাঠককে তুষ্ট করা, তাহ'লে সমকালের গণ্ডি অতিক্রম করা কি সম্ভব হ'ত তাঁদের পক্ষে? লেখকের সম্মুখে রয়েছেন তাঁর যে-সমস্ত পাঠক তাঁদের আনন্দলাভের কারণটুকুই মাত্র জানা সম্ভব হয় তাঁর পক্ষে। অনাগত কালের রসিকের রুচির সংবাদ জানবেন তিনি কি ভাবে? কিন্তু সুদূর ভবিষ্যতের পাঠকেরা লেখকদের সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন বলেই হোমর-বাল্মীকি-কালিদাস-শেক্স্‌পীয়র আজও জীবিত আছেন তাঁদের সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে। সমকালের পাঠকদের মনস্তুষ্টি সাধন তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল না বলে আজও পাঠকেরা তাঁদের সম্পর্কে উৎসুক। একালের পাঠকেরা প্রাচীনকালের শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে যে উৎসুক তার কারণ এই নয় যে সেই সমস্ত শিল্পকর্ম থেকে তাঁরা শুধুই আত্মতুষ্টির খোরাক পেয়েছেন। আনন্দ নিশ্চয়ই পেয়েছেন, তবে সে আনন্দ তাঁদের অন্বিষ্টবস্তু লাভের ফল; এই অন্বিষ্টের লাভ সম্ভব হয়েছে যেহেতু সাহিত্যিক নিকট বা সুদূর কোন লক্ষ্যের দিকে একাগ্র না থেকে সাহিত্যকে সাহিত্য হিসেবে সফল করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। সুতরাং সাহিত্যিকের প্রথমতম ও প্রধানতম কামনা হওয়া উচিত সাহিত্যকে সাহিত্যরূপে সার্থক করে তোলায় সাফল্যলাভ। ভাববাদী ও বস্তুবাদী উভয়-শ্রেণীর শিল্পতাত্ত্বিকেরাই এই মতের সত্যতা স্বীকার করেছেন। কিন্তু এক শ্রেণীর সাহিত্যিক এই সাধারণ সত্যকে—শিল্পের সার্থকতা শিল্পে—এই চূড়ান্ত মতবাদে পর্যবসিত করলেন উনবিংশ শতকের প্রথমার্দ্ধে।

ঘ ॥ 'শিল্পের সার্থকতা শিল্পে'
বা
'কলাকৈবল্যবাদ'

সুলেখক যিনি তাঁর পক্ষে আলপিন নিয়েও মহাকাব্য রচনা করা সম্ভব এবং এবং যা ভয়ঙ্কর ও বেদানাদায়ক তাও তাঁর হাতে হয়ে উঠতে পারে সুন্দর ও আনন্দদায়ক। বিষয়বস্তুর গৌরব অথবা অগৌরব শিল্পের স্বধর্মকে স্পর্শ করে না। —এই জাতীয় বিশ্বাস থেকে শিল্পের জগতে বিষয়ের ঊর্ধ্বে রূপকে স্থাপন করে যাঁরা নতুন আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন শিল্পতত্ত্বের জগতে তাঁরা 'কলাকৈবল্যবাদী' নামে চিহ্নিত। এই মতবাদীরা যেহেতু বিষয় ও রূপের আপেক্ষিক গুরুত্বের দ্বন্দ্বে বিষয়কে তিরস্কার করেছিলেন এবং শিল্পের সৌন্দর্য ও বাহ্যরূপই এদের অন্তরে মোহ সঞ্চার করেছিল, তাই শিল্পের জগতে সুনীতি-দুর্নীতির প্রশ্ন এঁদের কাছে হ'ল অবান্তর এবং রসিকের ব্যক্তিহৃদয়ে প্রজাত রূপই হ'ল, এঁদের মতে, শিল্পের যথার্থ পরিচয়। নীতির প্রসঙ্গ বাহুল্য বিবেচিত হওয়ায় এবং পাঠকের গুরুত্ব স্বীকৃতি লাভের ফলে নতুন মতবাদ থেকে শিল্পতত্ত্বের জগতে একটি পৃথক দিগন্ত আবিষ্কৃত হ'ল যেখানে জগৎ-হিতে শিল্পকে সমর্পিত হতে হয় না এবং সহৃদয় আস্বাদক ও শিল্পী হয়ে ওঠেন অভিন্ন-হৃদয়ানুভূতির অধিকারী। সুতরাং প্লেটো-অ্যারিস্টটলের কাল থেকে বিষয় ও রূপের গুরুত্বের দ্বন্দ্ব নিয়ে এবং শিল্পের বাহ্য উপযোগিতা নিয়ে তাত্ত্বিকদের মধ্যে চলছিল যে কূটতর্ক তা এক জাতীয় সমাপ্তির সীমারেখা স্পর্শ করল কলাকৈবল্যবাদীদের সাহায্যে।

বিশুদ্ধ শিল্প উদ্দেশ্যনিরপেক্ষ ও স্বয়ম্প্রভ, হিতবাদীর সিদ্ধিলাভের সহায়ক সামগ্রী নয়—এই হচ্ছে কলাকৈবল্যবাদীদের গৃহীত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তে আকস্মিকভাবে উপস্থিত হন নি তাঁরা। যে গোতিয়ের-এর নামের সঙ্গে l'art pour l'art (এরই ইংরেজী রূপান্তর art for art's sake এবং বাঙলা কলাকৈবল্য) 'শ্লোগান' একযোগে উচ্চারিত হয় যদিও তিনি নতুন আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি তবু প্রথম বা একমাত্র নন। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে বেঞ্জামিন কন্স্তাঁত 'জুর্ণাল ইন্তাইম'-এ এবং ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে ভিক্তোর কুজাঁ তাঁর বিখ্যাত সোরবোঁ-বক্তৃতামালা 'কুর দ্য ফিলোসফি' ('Cours de philosophie)-তে এই 'শ্লোগান' ব্যবহার করেছিলেন। কন্স্তাঁত ও তাঁর বান্ধবী মাদাম দ্য স্তেল (Stael) অন্যান্য অনেক বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে যখন শতকের

প্রারম্ভে পারী-তে প্রত্যাবর্তন করেন, তারপর থেকে ফরাসী দেশে কান্টীয় দর্শন জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ফলে 'বিশুদ্ধ শিল্প', 'বিশুদ্ধ সৌন্দর্য', 'নিরপেক্ষতা', 'স্বাধীনতা', 'রূপ', 'প্রতিভা' প্রভৃতি কথাগুলির সঙ্গে 'কলাকৈবল্য' কথাটিও অস্বচ্ছ অর্থে হলেও ফরাসী সাহিত্যে প্রচলিত হতে থাকে। এর পর তিরিশের দশকের গোড়ার দিকে গোতিয়ের 'Albertus' (১৮৩২) ও 'Mademoiselle de Maupin' (১৮৩৫)-এর মুখবন্ধে সৌন্দর্যসৃষ্টি ছাড়া শিল্পের অন্য উদ্দেশ্য অস্বীকার করলেন। সন্ত সিমোঁ ও ফুরিয়ের প্রমুখ তৎকালীন ইউটোপীয় সমাজবাদীদের মতবাদ এবং শতোব্রিয়াঁর খ্রীষ্টীয় আদর্শকে তিনি সযত্নে শিল্পের রাজত্ব থেকে দূরে রাখলেন। স্পষ্টভাষায় ঘোষণা করলেন, প্রয়োজনের জগতে যার মূল্য সর্বাধিক তা অসুন্দর। অবশ্য এই মত পরে তিনি সংশোধন করে বলেছিলেন, অপ্রয়োজনীয় কুৎসিৎ একটি প্রতিমূর্তির নির্মাণ অপেক্ষা একটি সুন্দর ঘড়ি নির্মাণ অনেক ভালো। কিন্তু তা সত্ত্বেও ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'Les Beux Arts en Europe' প্রবন্ধে গোতিয়ের পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্যের উৎস সন্ধান করেছিলেন দিব্যলোকে। তিনি বললেন 'সৌন্দর্য', 'সত্য' এবং মঙ্গলের সঙ্গে একই অলৌকিক জগতে অবস্থান করে। মাঝে মাঝে সেই সৌন্দর্য ইহলোকের বস্তুসমূহের মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয়ে থাকে। প্রতিবিম্বিত হওয়ার ফলে স্বর্গীয় সৌন্দর্যের রূপান্তর হয় মাত্র, ধ্বংস হয় না। অতএব ইহলৌকিক সৌন্দর্যের উৎস অন্তহীন। মানুষ শিল্প-সাহিত্যে 'ইমেজ'-এর মাধ্যমে দিব্য-সৌন্দর্যকে বাহ্য-ইন্দ্রিয়ের অধিগম্য করে তুলতে চেষ্টা করে। তখন পরিপার্শ্বের স্পর্শে দিব্য-সৌন্দর্যের প্রকাশও খণ্ড ও মলিন হয়ে পড়ে। সভ্যতার অধোগতি হলে শিল্প-সাহিত্যের মাধ্যমে যে অলৌকিক সৌন্দর্যের অভিব্যক্তি ঘটে তারও অধোগতি হয়। এবং বিপরীতটাও সত্য। কিন্তু শিল্প-সাহিত্যে সৌন্দর্যের প্রকাশ যত নিখুঁতই হোক তা 'আইডিয়া'র অংশমাত্র। শিল্প-সাহিত্যের মধ্যে এইভাবে সৌন্দর্য তথা দিব্য-সৌন্দর্যের অভিব্যক্তি সন্ধান করায় কবি ও চিত্রকর গোতিয়ের অতীতের শিল্প-সাহিত্যে অনুরাগী হয়েও আগামী দিনের শিল্পের অধিকতর দিবত্যালাভের সাফল্য বিষয়ে আশাবাদী হয়ে উঠলেন। সৌন্দর্যের দিব্যলোক-সম্ভাবনা ও চিরন্তনতায় গোতিয়ের-এর এই আস্থার জন্য এলউড হার্টমান বললেন : 'Gautier's theory owes much to Plato, of course, as well as to Victor Cousin '১

স্মরণে রাখতে হবে, যে-সময় গোতিয়ের সৌন্দর্যের প্রকাশকে শিল্প-সাহিত্যের উদ্দেশ্য বলে ঘোষণা করেছিলেন এবং পার্থিব সৌন্দর্যের উৎসে এক অখণ্ড অলৌকিক সৌন্দর্যকে খুঁজে পেয়েছিলেন তার কিছুদিন পূর্বে থেকে ফ্রান্সে শিল্প-বিপ্লবের সূত্রপাত। এর ফলে শহুরে শ্রমজীবী শ্রেণীর মানুষেরা সাহিত্যের উপর দু'ধরণের প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছিলেন। পাঠক হিসেবে তাঁরা যেমন একদিকে রহস্য ও রোমাঞ্চে ভরা কাহিনীর ব্যাপক চর্চার দিকে উৎসাহিত করতে লাগলেন লেখকদের, আবার তেমনি অন্যদিকে তাঁদের জীবনের বিচিত্র ধরণের সমস্যা নিয়ে বস্তুরসিক শিল্পীদের দ্বারা উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হতে লাগলেন। কিন্তু ক্লাসিকাল-ঐতিহ্যে বিশ্বাসী ও সদ্য-ধ্বংসপ্রাপ্ত অভিজাততন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক সাহিত্যিকেরা এই নতুন পরিস্থিতিতে নিজেদের হৃদয়ের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার বোধকে লালিত করতে শুরু করলেন। এরই ফল সংখ্যাগুরু সাহিত্য-পাঠক সম্পর্কে অমনোযোগ এবং স্বল্পসংখ্যক রুচিশীল পাঠক সম্পর্কে অতিমাত্রায় আগ্রহ। গোতিয়ের এবং বদ্‌ল্যার ছিলেন এই বিচ্ছিন্নতা-পীড়িত, সংখ্যালঘু পাঠক সম্পর্কে আগ্রহী, সৌন্দর্যের অনুরাগী শিল্পীদের অন্যতম। 'L'art pour l'art' এই বৃহত্তর জনজীবন-বিচ্ছিন্ন সাহিত্যিকদের শ্লোগান। গোতিয়ের তাঁদের নেতৃস্থানীয় পুরুষ। ফ্রান্সে গোতিয়ের-এর পর বদ্‌ল্যার এই মতবাদের প্রচারক।

যদিও বদ্‌ল্যার বিশ্বাস করতেন, সাহিত্য তার প্রাণের স্পন্দন খুঁজে পায় সমকালের মধ্যে, অলস শিল্পীই সমকাল বিস্মৃত; কিন্তু তথাপি নিজে ফ্রান্সের শিল্প-সাহিত্যের জগতে উদ্ভূত 'বস্তুবাদী' আন্দোলন সম্পর্কে স্পৃহাশূন্যতা প্রকাশ করেছেন বরাবর। বদ্‌ল্যার-এর কবি-সাহিত্যিক হচ্ছেন সেই মুক্তপক্ষ গগন-বিহারী 'অ্যালবাট্রস' কঠিন মাটিতে যার স্বচ্ছন্দ বিচরণ প্রতিমুহূর্তে বাধাপ্রাপ্ত।[২] কল্পনার প্রসাদে কবি, যিনি ছিলেন স্বাধীন, প্রাত্যহিক সংসারে তিনি মূর্ছিত। বাস্তবের মাটিতে তাঁর কল্পনার স্বাধীনতা অপহৃত। কল্পলোকচারী এই কবি সৌন্দর্যের উপাসক। সৌন্দর্যের প্রেমে সৌন্দর্যের জগতে তিনি বন্দী ক্রীতদাস। সুন্দরের চিরউজ্জ্বল বিশাল নয়নের মোহে তিনি আবিষ্ট। তাঁর 'Les fleurs du Mal' (1857) কবিতাগুচ্ছে বদ্‌ল্যার কবি-সাহিত্যিককে এই-ভাবে প্রাত্যহিক সংসারের ঊর্ধ্বস্থ অনন্ত সৌন্দর্যলোক-বিহারী বলে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু বদল্যার-কথিত 'সৌন্দর্য' সম্পূর্ণতঃ এক আধ্যাত্মিক ব্যাপার।

ইন্দ্রিয়ের দ্বারা নয়, কল্পনার দ্বারাই এই সৌন্দর্যের সাক্ষাৎ মেলে। মানুষের যাবতীয় শক্তির মধ্যে কল্পনাই সর্বোত্তম। ইন্দ্রিয়োত্তীর্ণ সুন্দরের অস্তিত্ব স্বীকার করেছিলেন বলেই 'Les litanies de Satan' কবিতায় শয়তানের দ্বারস্থ কবি বারবার প্রার্থনা করেছেন 'O Satan, prends pitie' de ma longue mise're !' ('O, Satan have pity on my long misery')। সুন্দর, বিষ ও পুষ্পে সমান সত্য—এই ছিল বদ্‌ল্যার-এর ধারণা। সমাজ ও সংসারের সনাতন বিচার পদ্ধতিতে যা অসুন্দর ও পাপ বদ্‌ল্যার তাকেও সুন্দর বলে গণ্য করে শিল্প-সাহিত্যের জগৎকে এমন এক স্তরে উন্নীত করলেন যেখানে বাস্তববাদী পৌঁছুতে পারেন না। গোতিয়ের যেমন বিশ্বাস করতেন পার্থিব সৌন্দর্যের উৎস হিসেবে এক অনন্ত অখণ্ড সৌন্দর্যলোকের অস্তিত্বে, তেমনি বদ্‌ল্যার-এর কাছেও ঈশ্বর ও সৌন্দর্য ছিল সমার্থক। ঈশ্বরের রাজত্বে ভাল-মন্দ সমান। কাব্য সাহিত্যে এই সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্যই, বদ্‌ল্যার বলতেন, ধ্বনিমাধুর্য ও ছন্দোস্পন্দন সৃষ্টির দিকে তথা কলাকৌশল বিষয়ে শিল্পীর সমস্ত চেতনা জাগ্রত থাকা চাই। সাহিত্যের কৌশল হচ্ছে ঈশ্বর সদৃশ যে-সুন্দর তাকেই রূপায়িত করার পন্থা মাত্র। এই সুন্দর সুন্দরতর হয়ে ওঠে যখন লাগে বিস্ময়ের ছোঁয়া। বিস্ময়-বিমিশ্র সৌন্দর্যের প্রতি বদ্‌ল্যার-এর এই অনুরাগ সৃষ্টি হয়েছিল যার প্রভাবে তিনি এডগার এ্যালেন পো। পো-এর প্রতি বদ্‌ল্যার-এর আকর্ষণ ছিল অপরিসীম। যেমন তিনি পো-এর সৌন্দর্যভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, তেমনি পো-এর 'The philosophy of Composition' (১৮৪৬) ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করে পো-এর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে শিল্পের সার্বভৌমত্বের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন এবং সঙ্গীতের ধর্মে কাব্যকে দীক্ষিত করতে চেয়েছেন।

দেখা যাচ্ছে, উনিশ শতকের প্রথমার্দ্ধে ফ্রান্সে কলাকৈবল্যতত্ত্বের উদ্গাতা ছিলেন যে গোতিয়ের ও বদ্‌ল্যার তাঁরা উভয়েই সৌন্দর্যের দিব্যতায় বিশ্বাসী এবং শিল্পকে মনে করতেন সৌন্দর্যের অভিব্যক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম। বলাবাহুল্য যেহেতু সৌন্দর্যের প্রকাশেই তাঁরা শিল্পের চরম সিদ্ধি লক্ষ্য করেছিলেন সুতরাং তাঁরা বিষয়বস্তুর গুণাগুণের বিচারক ছিলেন না। অসীম সুন্দরকে সুন্দর রূপের মাধ্যমে বাস্তবে ধরতে হবে, এই ছিল তাঁদের কাছে কবি-সাহিত্যিকের প্রধান কর্তব্য। এঁদের বক্তব্য রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে এইভাবে রূপ নিয়েছিল—

'বৈষয়িকেরা যাহাই বলুন-না কেন, আর কোন উদ্দেশ্যের আবশ্যক করে না, মনে সৌন্দর্য উদ্রেক করাই যথেষ্ট মহৎ। কবির ইহা অপেক্ষা মহত্তর উদ্দেশ্য আর থাকিতে পারে না।.........অতএব কবিদিগকে আর কিছুই করিতে হইবে না, তাঁহারা কেবল সৌন্দর্য ফুটাইতে থাকুন'।[৩] 'সৌন্দর্য উদ্রেক' করার অর্থ রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'হৃদয়ের অসাড়তা অচেতনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা'। অর্থাৎ তিনি মনে করেন কবির কাজ আমাদের হৃদয়ের অসাড়তা দূর ক'রে তাকে স্বাধীনক্ষেত্রে বিচরণের অধিকার সৃষ্টি করে দেওয়া। এই মত প্রকাশ করার সময় রবীন্দ্রনাথ এডগার এ্যালেন পো-এর রচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন কি না জানি না তবে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'The Poetic principle'-এ ঠিক এই কথাই বলেছিলেন পো—'I need scarcely observe that a poem deserves its title only inasmuch as it excites by elevating the soul.'

কবিতার কাজ আমাদের আবেগ ও চেতনার রাজ্যে উদ্দীপনা সঞ্চার করা, চিত্তের জড়ত্ব মোচন করা, এই বিশ্বাস থেকে 'পো' দীর্ঘ কবিতার বিরুদ্ধে তাঁর আপত্তি প্রকাশ করলেন। মহাকাব্যের বিরোধিতা করলেন। মহাকাব্য অসলে কতকগুলি খণ্ডকবিতার সংকলন, ইলিয়ড হচ্ছে কতকগুলি গীতিগুচ্ছের সমাহার, এই ধারণা ছিল পো-এর মনে বদ্ধমূল। তিনি ভাবতেন, ক্ষুদ্রাকার কবিতার পক্ষেই মনের গভীরে স্থায়ী প্রভাব সৃষ্টি করা সম্ভব। দীর্ঘ কবিতায় মন মুহুর্মুহু কেন্দ্রচ্যুত হয়। কবিতার ক্ষুদ্রাবয়বের সপক্ষে পো-এর বক্তব্য ছিল যেমন সুনিশ্চিত বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত, তেমনি কাব্যে সঙ্গীতধর্মের প্রতি তাঁর অনুরাগই প্রভাবিত করেছিল বদলেয়ারকে। শুধু বদ্‌ল্যার নয়, ভার্লেন (১৮৪৪-১৮৯৬), মালার্মে (১৮৪২-১৮৯৮) ও ভালেরি (১৮৭১-১৯৪৫) কাব্যের সঙ্গীত-ধর্মের প্রতি তাঁদের অনুরাগ প্রকাশ করেছিলেন এবং আস্থা জ্ঞাপন করেছিলেন কাব্যের অন্যফল-নিরপক্ষ বিশুদ্ধ শিল্পমূর্তিতে। একদিকে গোতিয়ের-বদ্‌ল্যার প্রমুখ স্বদেশী কবি এবং অন্যদিকে বিস্ময়বিমিশ্র সুন্দর-রূপের অনুরাগী পো বিশেষভাবে আবিষ্ট করেছিলেন এই সমস্ত ফরাসী কবিদের। আর সকলের উপরে ছিলেন কান্ট যাঁর 'Purposiveness without purpose' প্রবচনটি গোতিয়ের থেকে আরম্ভ ক'রে ফ্রান্সের রোমান্টিক কবিদের বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের প্রতি অভিলাষকে বিবৃদ্ধি দান করেছিল। বস্তুতঃ উনিশ শতকের প্রথম থেকে

ফ্রান্সের ভিক্‌তোর কুজাঁ, গোতিয়ের যে-কলাকৈবল্যতত্ত্ব প্রচার করেছিলেন তা যে কোন বিচ্ছিন্ন ব্যাপার ছিল না, দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে ছিল ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে যুক্ত তা পূর্বেই বলেছি। আবার এ সত্যও আমাদের কাছে স্পষ্ট যে বিপ্লবোত্তর ধনতান্ত্রিক পৃথিবীর সাহিত্যফসল রোমান্টিক কাব্য-কবিতার সঙ্গে কলাকৈবল্যতত্ত্বের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। তাই অল্প কিছুকালের মধ্যে ফ্রান্সে, আমেরিকায় ও ইংলণ্ডে কলাকৈবল্যতত্ত্ব সাহিত্যের জগতে বিশেষ প্রাধান্য বিস্তার করে। আমেরিকান 'পো' যে ফ্রান্সের কবি বদ্‌ল্যারকে অভিভূত করেছিলেন তা আমরা পূর্বেই বলেছি। আসলে গোতিয়ের, পো এবং বদ্‌ল্যার সকলেই ছিলেন সুন্দর ও সুন্দরের অনুধ্যান-জাত আনন্দে আস্থাশীল। গোতিয়ের ও বদ্‌ল্যার পার্থিব সৌন্দর্যের অজাগতিক উৎসে ছিলেন বিশ্বাসী। আর পো বললেন 'I make beauty the province of the poem, simply because it is an obvious rule of Art that effects should be made to spring as directly as possible from their causes'. অন্তরে উদ্দীপনা সৃষ্টি এবং আনন্দদান যেহেতু কবিতার দ্বারা ঘটে অতএব তা কোন অসুন্দর থেকে সম্ভব নয়, কারণ কার্য-কারণের সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন। সুন্দরের স্রষ্টা কবি-সাহিত্যিকেরা সৌন্দর্যের দ্বারাই আমাদের প্রাণিত ও উদ্দীপিত করবেন এবং প্রাণনা ও উদ্দীপনা থেকেই জন্ম নেবে আনন্দ।

মোটকথা কাব্যের সংক্ষিপ্ত অবয়ব ও সংগীতধর্মে আস্থাশীল এডগার এ্যালেন পো সৌন্দর্যসৃষ্টি ও সৌন্দর্যের মাধ্যমে আনন্দদানকেই গণ্য করেছিলেন কাব্যের উদ্দেশ্য বলে। আবার শুধু পো নন, গোতিয়ের এবং বদ্‌ল্যার প্রমুখ ফরাসী সাহিত্যিকেরাও সৌন্দর্যসৃষ্টি এবং আনন্দদান ছাড়া কাব্য-সাহিত্যের অন্য কোন উদ্দেশ্য স্বীকার করেন নি। এঁদের পর ভার্লেন-মালার্মে-ভালেরিও কাব্যের বিশুদ্ধ রূপের মাহমাই ঘোষণা করেছেন তাঁদের সৃষ্টিকর্মে এবং সমালোচনায়।

যে-আন্দোলনের পুরোভাগে ফ্রান্সে এসেছিলেন গোতিয়ের ও বদ্‌ল্যার, আমেরিকায় এসেছিলেন এ্যালেন পো, ইংলণ্ডে সেই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিলেন অস্কারওয়াইল্ড এবং অতঃপর ক্লাইভ বেল, রোজার ফ্রাই ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সমালোচক এ. সি. ব্রাড্‌লে। অস্কার ওয়াইল্ড জীবন ও শিল্পের সম্পর্ক নিরূপণ করতে গিয়ে বললেন, তথার্থ শিল্পী যিনি তিনি তাঁর শিল্পকর্মে নির্দিষ্ট রূপাবয়বহীন জীবনকে করে তোলেন রূপবান। অতএব জীবন

থেকে শিল্প নয়, শিল্পকে অনুকরণ করে জীবন। শিল্পের সর্বাত্মক প্রভাব এই ভাবে অস্কার ওয়াইল্ডের আগে কেউ স্বীকার করেন নি। শিল্পের জগৎ স্বতন্ত্র একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ জগৎ হয়ে উঠেছে তাঁর কাছে। শিল্পের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করতে গিয়ে অস্কারওয়াইল্ড গোতিয়ের-এর কথাই প্রায় পুনরুচ্চারণ করলেন—যতক্ষণ কোন বস্তু আমাদের কাছে প্রয়োজনীয় হয়ে থাকবে অথবা সুখ বা দুঃখের কারণ বলে গণ্য হবে, ততক্ষণ সেই বস্তু শিল্পের জগতে প্রবেশাধিকার পাবে না।* প্রয়োজনীয় বস্তুর সঙ্গে শিল্পের বিরোধাত্মক সম্পর্ক স্বীকার করে নিয়ে অতঃপর অস্কারওয়াইল্ড বললেন, শিল্পীর কাছে পাপ-পুণ্যের প্রশ্ন চিত্রকরের কাছে রঙ-মেশাবার আধার-তুল্য অর্থাৎ নিতান্তই গৌণ। প্রয়োজন এবং সুনীতি-দুর্নীতির প্রসঙ্গ শিল্পের সর্বভৌমত্বে বিশ্বাসী অস্কার ওয়াইল্ডের দ্বারা এইভাবে পুরোপুরি বর্জিত হল। বিষয়বস্তুর গুরুত্ব অস্বীকার করার পর অস্কারওয়াইল্ড বরণ করে নিলেন শিল্প-রূপের শ্রেষ্ঠত্ব—'Form is the beginning of things', 'Form, which is the birth of passion, is also the death of pain.' এবং পো-এর মত সৌন্দর্যকে শীর্ষস্থান দিয়ে তাকেই শিল্পের পরম অন্বিষ্ট বলে ঘোষণা করলেন—সৌন্দর্য সব কিছুকে উদ্ভাসিত করে, কোন কিছু প্রকাশ করে না এবং আমাদের প্রয়োজনের জগতের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত এই 'সৌন্দর্য' হচ্ছে 'Symbol of Symbols.'

বিষয়ের ঊর্ধ্বে 'রূপ'কে স্থাপন করে অস্কার ওয়াইল্ড 'all art is useless' বলে তাঁর যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়েছিলেন সেই সিদ্ধান্তের সঙ্গে ক্লাইভ বেল, রোজার ফ্রাই-এর অভিমত গেল অভিন্নসূত্রে গ্রথিত হয়ে। ক্লাইভ বেল বললেন, শিল্প অহিতকর কি নয়, এ বিচার অপ্রাসঙ্গিক। শিল্প হচ্ছে 'Significant form'। শিল্পের এই সংজ্ঞার তাৎপর্য অসামান্য। বেল অবশ্যই এখানে বাহ্য রূপের সুসমঞ্জস বিন্যাসের কথা বলেন নি। প্রাত্যহিক জীবনের গতিছন্দ থেকে কাব্যের জগৎ সম্পূর্ণ পৃথক এবং এই জগতের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে আমাদের মধ্যে যে ধরণের আবেগের উদ্দীপনা সৃষ্টি হয় তা বাস্তব অভিজ্ঞতা-বহির্ভূত 'aesthetic emotion'। এই সত্য ধ'রে নিয়ে শিল্পকে 'Significant form' বলে চিহ্নিত করেছেন তিনি। শিল্প-সাহিত্যের জগৎকে বাস্তবের তথা প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের ধূলি-স্পর্শ (?) থেকে মুক্ত রাখতে চেয়েছিলেন বলেই বেল-এর শিল্পের সংজ্ঞা এইরকম। বেল-এর অভিমত সমর্থন করেছিলেন রোজার

ফ্রাই। বর্তমান গ্রন্থের প্রথমেই হার্বার্ট রীড-প্রদত্ত শিল্পের যে সংজ্ঞার উল্লেখ করেছি আমরা, সেখানে দেখি 'form' সৃষ্টির দিকেই ('pleasing form') ঝোঁক দিয়েছেন তিনি। কিন্তু এঁরা কেউই 'form' শব্দটি নয়নলোভন-বাহ্যরূপ অর্থে ব্যবহার করেন নি। Form যেহেতু লেখকের অনুভূতিরই বহিঃপ্রকাশ অতএব যে-বিশেষ ধরণের আবেগ থেকে শিল্প-সাহিত্যের জন্ম হয় এই 'form' সেই আবেগের সহচর এবং অবিচ্ছেদ্য সহচর। অতএব এই 'form' ও বিশিষ্ট। মোটকথা সব 'emotion'ই যেমন কাব্য-কবিতার জন্ম দেয় না, তেমনি যে-কোন 'form'ই আবার কাব্য-কবিতা নয়। এই 'ফর্ম' 'Significant' হওয়া চাই। রোজার ফ্রাই, ক্লাইভ বেল-কে সমর্থন জানিয়ে নিজের যে অভিমত জানিয়েছেন সেখানে আমাদের এই বিশ্লেষণের সমর্থন মিলবে: 'I conceived the form of the work of art to be its most essential quality, but I believed this form to be the direct outcome of an apprehension of some emotion of actual life by the artist, although, no doubt, that apprehension was of a special and peculiar kind and inplied a certain detachment.'* এই উদ্ধৃতির শেষাংশটুকু (that apprehension....certain detachment) খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এবং বিশেষ মনোযোগের দাবী রাখে। কাব্যরূপকে এইভাবে দেখার জন্যই কাব্যের 'ফর্ম' এবং 'ইমোশনে'র মধ্যে কোন পার্থক্যই চোখে পড়ে নি ফ্রাই-এর। এবং 'ফর্ম' ও 'ইমোশনে'র অবিচ্ছেদ্য রূপকেই 'শিল্প' বলে ঘোষণা করতে চেয়েছিলেন তিনি। সুতরাং ক্লাইভ বেল এবং রোজার ফ্রাই উভয়েই যদিও শিল্পকে 'Significant form' বলে গণ্য করেছিলেন তথাপি বিশেষ ধরণের 'ইমোশন' থেকে এবং বিশেষ ধরণের 'ইমোশন' জাগরণের জন্য শিল্পের সৃষ্টি, এই ছিল তাঁদের মৌলিক প্রত্যয়। এই 'ইমোশন' হচ্ছে 'ইস্থেটিক ইমোশন'। 'ইস্থেটিক ইমোশন' থেকে শিল্পী শিল্পরচনা করেন আর রসিক সুজনের মধ্যে শিল্প থেকে 'ইস্থেটিক ইমোশন' জন্ম নেয়। একজন অরূপ থেকে রূপে এলেন এবং অন্যজন গেলেন রূপ থেকে অরূপে। রূপ থেকে অরূপের উপলব্ধিতে রসিক যাতে পৌঁছুতে পারেন সেইজন্যই শিল্পরূপে প্রয়োজন হয় 'order' এবং 'variety' মিশ্রিত unity বা ঐক্যের। রসিককে বিশেষ উপলব্ধির রাজ্যে উপস্থিত করাই যেহেতু শিল্পীর লক্ষ্য, অতএব এই 'রূপ'

('Order' এবং 'Variety' থেকে সৃষ্ট) হচ্ছে ফ্রাই-এর কাছে 'purposeful'। এবং এই কারণেই বেল-এর মতে তা 'Significant'। রোজার ফ্রাই বৈচিত্র্য ও শৃঙ্খলা-জাত ঐক্য থেকে সৃষ্ট 'ইস্থেটিক ইমোশন'কে কিছুটা কান্ট-এর অনুকরণে 'disinterested contemplation' বলে বিশেষভাবে চিহ্নিত করলেন। তাঁর 'Vision and Design' গ্রন্থের 'Retrospect' অংশে বেল-কথিত 'Significant form'-এর প্রতি রোজার ফ্রাই-এর সমর্থন যেভাবে উচ্চারিত হয়েছে তাতে মনে হয় ফ্রাই-এব শিল্পচিন্তায় বেল-এর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ছিল। তাঁরা উভয়েই আবার শিল্প-সাহিত্যের উদ্দেশ্যনিরপেক্ষতা প্রচারে ছিলেন কাণ্টের পদাঙ্ক অনুসারী এবং যাবতীয় শিল্পের উৎকর্ষ সংগীতে সন্ধান করার ব্যাপারে ওয়াল্টার পেটার-এর যোগ্য উত্তরাধিকারী।[৬]

ক্লাইভ বেল এবং রোজার ফ্রাই কলাকৈবল্যের প্রতি তাঁদের আসক্তি যখন যথাক্রমে 'Art' এবং 'Vision and Design'-এর মাধ্যমে প্রকাশ করেন তখন বিশ শতকের প্রথম দশক সমাপ্ত। কালের বিচারে ব্রাড্‌লে-র 'Poetry for poetry's sake' প্রবন্ধটি বেল এবং ফ্রাই-এর উক্ত গ্রন্থ দু'খানির পূর্ববর্তী। উনিশ শতকের শেষদিকে অস্কার ওয়াইল্ড[৭] ও হুইস্টলার[৮] এবং বিশ-শতকের প্রথমদিকে ব্রাড্‌লে[৯] কলাকৈবল্যতত্ত্বের প্রধান প্রচারক ও পৃষ্ঠপোষক রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। আবার এঁদেরই সমকালে আর্নল্ড, রাস্কিন এবং মার্কিন যুবক হাওয়েল্‌স্ নানাভাবে কলাকৈবল্যতত্ত্বের বিরোধিতা করেছিলেন। আর্নল্ড বললেন, নৈতিক আদর্শের বিরোধিতা আছে যে-কাব্যে সে-কাব্য জীবনবিরোধী এবং নৈতিক আদর্শ সম্পর্কে অমনোযোগী কাব্য জীবন সম্পর্কেও অমনোযোগী। রাস্কিন আরও স্পষ্টভাষায় তাঁর 'Lectures on Art'-এ শ্রেষ্ঠশিল্পের সামনে তিনটি উদ্দেশ্যকে প্রধান বলে উল্লেখ করলেন : (ক) ধর্মের প্রতিষ্ঠা, (খ) নৈতিক-জীবনের শোধন, (গ) বাস্তব-প্রয়োজন সিদ্ধিতে সহায়তা। আর্নল্ড বা রাস্কিন নীতি ও ধর্ম সম্পর্কে সাহিত্য তথা শিল্পের যে ধরণের মনোযোগিতা কামনা করেছিলেন তা তো স্পষ্টই 'শিল্পের সার্থকতা শিল্পে' এই মতবাদের প্রতিবাদ। তবে হাওয়েল্‌স্-এর মত উগ্র ছিলেন না এঁরা কেউই। হাওয়েল্‌স্ বলেছিলেন (১৮৮৬): 'the old heathenish axiom of art for art's sake is dead as great Pan himself.' সুতরাং সেই মৃত তত্ত্ব আর প্রতিষ্ঠা পাবে না কোনদিন। যাঁরা তা সত্ত্বেও কলাকৈবল্যের উপাসনা করতে চান তাঁরা

মিথ্যা ঈশ্বর নয়, মৃত ঈশ্বরের উপাসক। কিন্তু এঁদের এই বিরোধিতা সত্ত্বেও হুইস্টলার বললেন (১৮৮৮), শিল্পের সার্থকতা শিল্প হিসেবে পূর্ণতালাভে। শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে নয়, চিরন্তন সৌন্দর্যের সন্ধান ও রূপায়ণেই শিল্পের সার্থকতা। অস্কার ওয়াইল্ডের কথা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। আলোচনা করেছি বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে বেল এবং ফ্রাই-এর কলাকৈবল্যতত্ত্বের প্রতি অনুরাগের কথা। সুতরাং হাওয়েল্‌স্‌-এর ঘোষণা সত্ত্বেও 'the old heathenish axiom of art for art's sake' ধ্বংস না হয়ে নতুন করে সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে। এমন কি এখনও সাহিত্য সমালোচনার জগতে সমাজহিতবাদীদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী এই কলাকৈবল্যবাদীরাই।

বিশ শতকের প্রারম্ভে ব্রাড্‌লে তাঁর প্রখ্যাত 'Poetry for poetry's Sake' প্রবন্ধে শ্রেষ্ঠ কবিতার, শুধু শ্রেষ্ঠ নয়, যে-কোন কবিতার চতুর্দিকেই অসীম ব্যঞ্জনার পরিমণ্ডল বিরাজ করে—এই ধারণা প্রকাশ ক'রে কবির ব্যক্ত অর্থকে অতিক্রম যে অব্যক্ত সুষমা কাব্যকে ঘিরে থাকে সেখানেই কাব্যের চূড়ান্ত তাৎপর্য সন্ধান করলেন। মানুষের ভাষাটুকু অর্থ দিয়ে বদ্ধ চারিধারে, সুতরাং সেই ভাষার মধ্যে ভাষাতীতের ব্যঞ্জনা সৃষ্টির জন্য কবিকে এমন কৌশল অবলম্বন করতে হয় যাতে কাব্যভাষা পাঠকের কল্পনা-শক্তি সমেত সমস্ত সত্তাকে আন্দোলিত করতে পারে। কাব্য-কবিতা পাঠকের বাস্তব প্রয়োজনে সীমাবদ্ধ না থেকে তার কল্পনাশক্তিকে ও ভাবপ্রতিভাকে উদ্দেজিত করে, এই বিশ্বাস থেকেই ব্রাড্‌লে তাঁর পূর্ববর্তী কলাকৈবল্যবাদীদের সমর্থন জানালেন। কাব্য-সাহিত্যের জগৎ, ব্রাড্‌লের কাছে 'প্রাত্যহিক পরিচিত জগৎ থেকে পৃথক জগৎ, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি স্বাধীন জগৎ যেখানে তথাকথিত নিয়মানুবর্তিতার কোন প্রয়োজন হয় না। এই জগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফলে হয়ত পাঠকের কৃষ্টি, সংস্কৃতি বা ধর্মবুদ্ধির শোধন ঘটতে পারে অথবা কাব্য-কবিতা রচনা করে কবি খ্যাতি অর্জন ও বিত্ত-লাভ করতে পারেন, কিন্তু তাঁর মতে, কাব্য-কবিতা বিচারের সময় এই সমস্ত প্রসঙ্গ বর্জিত হওয়া উচিত এবং 'this is to be judged entirely from within'। এই ধরণের মতবাদ যে কলাকৈবল্যবাদের সমর্থন করে এ বিষয়ে নিশ্চয়ই কোন সংশয় নেই। ব্রাড্‌লে কলাকৈবল্যবাদীদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত প্রধান অভিযোগগুলি খণ্ডন করে তাঁর নিজের সিদ্ধান্ত জানালেন : (ক) কবির কবিতা প্রচলিত অর্থে জগতের কোন মঙ্গল সাধন করে না, যদিও 'poetry is one

kind of human good'; কবিতা ও মানবহিতসাধনের মধ্যে কোন রকম খাদ্য-খাদক সম্পর্ক নেই। (খ) কবিতার সঙ্গে জীবনের বিচিত্র ধরণের সম্পর্ক আছে এবং সেই সম্পর্ক বাহ্য নয়, অন্তর্লীন। জীবন ও কবিতা একই সত্যের দুইরূপ। প্রথম ক্ষেত্রে প্রাত্যহিক সংসারের বাস্তবতাই একমাত্র সত্য এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সত্য হচ্ছে কল্পনা। বাস্তব ও কল্পনা পরস্পর-বিরোধী নয়। এদের বিকাশ সমান্তরাল। কল্পনাবৃত্তির তৃপ্তি সাধনেই কাব্যের চূড়ান্ত সাফল্য। (গ) বাস্তববাদীরা বিষয়ের মাহাত্ম্যে বিশ্বাসী আর রূপবাদীরা শুধু রূপের জন্য রূপসৃষ্টিতে। আসলে উভয় মতবাদীরাই বিষয় ও রূপের বৈপরীত্যকেই সত্য বলে গণ্য করেন। কিন্তু কোন কবিতা বা শিল্পকর্মে বিষয় ও রূপের দ্বন্দ্ব স্বীকার্য নয়। পৃথকভাবে বিষয় বা রূপ বলে কবিতায় কিছু থাকে না। বিষয় ও রূপ মিলেই কবিতা। রূপবাদীরা বলতে পারেন, একই বিষয় অবলম্বনে যখন বিভিন্ন জাতের ও মানের কবিতা রচনা সম্ভব তখন অবশ্যই বিষয়ের উপর কাব্যের মাহাত্ম্য নির্ভর করে না। এবং একথাও হয়ত যথার্থ যে, আমরা কখনই বলতে পারি না কোন্ ধরণের বিষয়বস্তু কাব্যের ক্ষেত্রে অধিক উপযোগী এবং কোন্‌টি নয় অথবা কোন্ বিষয়বস্তু কাব্যের পক্ষে সুন্দর ও উদ্দীপনাময় এবং কোন্‌টি কুৎসিৎ ও বিরক্তিকর; তথাপি বিষয়ের মাহাত্ম্য বলে কিছু নেই এবং যে-কোন বিষয়বস্তু অবলম্বনেই মহৎকাব্য রচনা করা সম্ভব রূপবাদীদের এই মতবাদও নির্বিচারে গ্রহণযোগ্য নয়।…লক্ষ্য করা যেতে পারে বাস্তবজীবন সম্পর্ক-বিচ্ছিন্নভাবে কাব্যমূল্য বিচারের দ্বারা ব্রাডলে তাঁর কলাকৈবল্যবাদী পূর্বসূরী ও উত্তরসূরীদের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্পর্কে যুক্ত। কিন্তু কাব্যের জগতে তিনি বিষয় ও রূপের দ্বন্দ্ব যেভাবে বর্জন করেছেন তা যে-কোন শিল্প সম্পর্কে সত্য হলেও কলাকৈবল্যবাদীরা কোন দিনই তা স্বীকার করেন নি। শিল্প-সাহিত্যের জগতের এক প্রাচীনতম দ্বন্দ্বের সুন্দর সমাধান করেছেন ব্রাডলে। কিন্তু তিনি যে-সমস্ত যুক্তি দ্বারা প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে কাব্যের সম্পর্ক এবং কাব্যের উদ্দেশ্য বিবৃত করেছেন তা নিয়ে অনেক কিছু আপত্তি উঠেছে। আপত্তি তুলেছেন আই. এ. [illegible] বলেছেন: (ক) কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ধর্মের জগতের সঙ্গে সাহিত্যের নিবিড় কোন ধরণের সম্পর্ক নেই, একথা যথার্থ নয়। (খ) কাব্যের বিচারে অন্য কোন প্রসঙ্গ গ্রাহ্য নয়, কাব্যের বিচার শুধু কাব্য হিসেবে হবে—এ মতও ভ্রান্ত। একটি কাব্যকে আরও বিভিন্নভাবে বিচার করার সঙ্গে সঙ্গে

শুধুমাত্র কাব্য হিসেবেও বিচার করতে হবে, এই হচ্ছে সঠিক পদ্ধতি। (গ) বিভিন্ন কবিতার দ্বারা বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে এবং হয়েও থাকে। সলোমনের গীতি, দান্তের 'ডিভাইন কমেডি', ভোলতেয়ারের 'কাঁদিদ', কীট্স-শেলী-ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতা একই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে না। আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি যেমন বিচিত্র তেমনি কাব্যকবিতাও বিভিন্ন জাতের হয়। আর বিভিন্ন জাতের কবিতার ভূমিকাও আমাদের জীবনে বিচিত্র ধরণের হওয়াই স্বাভাবিক। (ঘ) সর্বোপরি কাব্যের জগতের সঙ্গে আমাদের পরিচিত জগতের কোন নিকট সম্পর্ক নেই, এমতও যথার্থ নয়। যদি কাব্যের জগৎ হত একান্ত কবির নিজের জগৎ যেখানে সংসারের কোন নিয়মই প্রযোজ্য নয়, তাহ'লে লেখক ও পাঠকের মধ্যে যোগাযোগ সম্ভব হ'ত কিভাবে? যতদিন কবিকে তাঁর অন্তরের ভাব-প্রকাশ ও ভাবসঞ্চার নিয়ে চিন্তিত থাকতে হবে ততদিন জাগতিক নিয়ম ও অনেক কিছু মানতে হবে তাঁকে।

রিচার্ডস্ যে আপত্তি উত্থাপন করেছে ব্রাড্লের বিরুদ্ধে সেই সমস্ত আপত্তি নিঃসন্দেহে অন্যান্য কলাকৈবল্যবাদীদের বিরুদ্ধেও উত্থাপিত হতে পারে। কাব্যের জগৎকে ইহ-সংসারের নীতিনিয়মের ঊর্ধ্বে স্থাপনের যে-প্রয়াস ব্রাড্লে-র রচনায় চোখে পড়ছে তা তো আসলে সাধারণভাবে সমস্ত কলাকৈবল্যবাদীদের ক্ষেত্রেই সহজলভ্য। শুধু ব্রাড্লে যেভাবে বিষয় ও রূপের দ্বন্দ্ব নিষ্পত্তি করেছিলেন তা প্রশংসা আকর্ষণ করে, কারণ কি ভাববাদী কি বস্তুবাদী সবাই বিষয় ও রূপের আপেক্ষিক গুরুত্বের দ্বন্দ্বে কোন না-কোন একটিমাত্র পক্ষ অবলম্বন করে বিভ্রান্ত হয়েছেন।

মোটকথা, সাধারণভাবে সমস্ত কলাকৈবল্যবাদীরাই (ব্রাড্লে ছাড়া) শিল্পের জগতে রূপের প্রাধান্য স্বীকার ক'রে এবং জাগতিক প্রয়োজন সিদ্ধির ঊর্ধ্বে শিল্পকে স্থাপন করে শিল্পবিচারে নতুন মাত্রা সংযোজন করেছেন। শুধু তাই নয় সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে সমালোচক ও লেখকের দূরত্বের ব্যবধান অস্বীকার করেও নতুনত্ব সৃষ্টি করেছেন এঁরা। বদ্ল্যার বলেছেন: দিদেরো, গেটে, শেক্স্পীয়র প্রত্যেকেই ছিলেন স্রষ্টা ও শ্রদ্ধেয় সমালোচক। কবিই সমস্ত সমালোচকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। শুধু বদ্ল্যার-এর নয়, এ-বিশ্বাস একদিক থেকে কলাকৈবল্যবাদীদেরই। শিল্পীই শিল্প-বিচারের যোগ্যতম ব্যক্তি, বদ্ল্যার-এর এতাদৃশ মন্তব্যের প্রতিধ্বনি আমরা শুনেছি রাস্কিন প্রসঙ্গে হুইস্টলারের

রচনায়। হুইস্টলার-এর বক্তব্য আরেক দিক থেকে ঘুরিয়ে বললেন অস্কার ওয়াইল্ড—নিজের স্ফুরিত ব্যক্তিত্বের আলোকেই সমালোচক অপরের রচনা ও ব্যক্তিত্বকে আলোকিত করে থাকেন। সমালোচনা হচ্ছে এক সৃষ্টিকে অবলম্বন করে নতুন আর এক সৃষ্টি। অর্থাৎ সমালোচক নিজেই স্রষ্টার ভূমিকা গ্রহণ করে থাকেন। হুইস্টলার শিল্পীকে শ্রেষ্ঠ বিচারক বলেছেন, আর অস্কার ওয়াইল্ড বিচারককে দিয়েছেন স্রষ্টার সমমর্যাদা। সুতরাং এক জায়গায় উভয়েই সম্মিলিত যে, গুণগত দিক থেকে বিচারক ও স্রষ্টার মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, বিচারক ও স্রষ্টার প্রভেদ লুপ্ত হয় কিভাবে? ওয়াল্টার পেটার ও অস্কার ওয়াইল্ড-এর লেখায় তার উত্তর মিলছে। উভয়েই বলেছেন, অনুভূতিই হচ্ছে সেই সামান্য-ধর্ম যার সাহায্যে লেখক ও সমালোচকের মধ্যে বিভিন্নতা দূর হয়। সুন্দরের যে-ধরণের উপলব্ধি স্রষ্টাকে বিচলিত করে সেই ধরণের উপলব্ধির অধিকারী হলে তবেই বিচারক যথার্থ বিচারকের মর্যাদা দাবী করতে পারেন, এবং তখন কেবল তখনই শিল্পীর সঙ্গে তাঁর কোন গুণগত প্রভেদ থাকে না। ল্যাম্ এবং হ্যাজলিটও স্বীকারোক্তির ঢঙে এই সত্যের দিকেই সংকেত দিয়েছেন—'বই আমি পড়ি না, বই আমার কানে বাজে এবং পড়ার সময় আমার অন্তরে উষ্ণতা অনুভব করি' (ল্যাম্); 'আমি যা চিন্তা করি তা-ই বলি, আবার যা অনুভব করি তা-ই চিন্তা করি। কোন বস্তু থেকে আমার একটা বিশেষ বোধ জন্মে এবং এই বোধের প্রকাশ ব্যাপারে আমি কুণ্ঠাহীন (হ্যাজলিট)। অর্থাৎ এঁদের কাছে (ল্যাম্ ও হ্যাজলিট) সমালোচনা হচ্ছে কোন গ্রন্থ সম্পর্কে পাঠক বা সমালোচকের অন্তরে সঞ্জাত প্রতীতিবিশেষের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এই জাতীয় সমালোচনাকেই বলা হয় 'Impressionistic Criticism'. বস্তুতঃ কলাকৈবল্যতত্ত্বে বিশ্বাসী শিল্পী ও শিল্পতাত্ত্বিকেরাই এই ধরণের সমালোচনা-পদ্ধতির প্রবর্তক ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক। এখন এঁদের তত্ত্বানুযায়ী প্রকৃষ্ট সমালোচনা যেহেতু স্রষ্টা ও বিচারকের সমানুভূতি থেকে সৃষ্ট অতএব যথার্থ সমালোচক সংখ্যায় স্বল্প। বোধহয় এইজন্যই বর্তমান শতকের অন্যতম কলাকৈবল্যবাদী রোজার ফ্রাই বলেছেন, শিল্প যত বিশুদ্ধ হয় ততই বোদ্ধার সংখ্যা হয় কম, কারণ যে-নান্দনিক বোধবিশিষ্ট মানুষের কাছে শিল্পের আবেদন সেই জাতীয় মানুষেরা সংখ্যায় অপ্রচুর।[১১] শিল্প-সাহিত্যের বিচারে ধর্মপ্রতিষ্ঠা, নীতিশিক্ষা দান প্রভৃতি তথাকথিত মহৎ উদ্দেশ্যগুলি যাঁরাই পরিত্যাগ করে নান্দনিকতার উপর

বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন তাঁরা কলাকৈবল্যবাদের প্রচারক বা এই আন্দোলনের শরিক না হলেও শিল্পের বিশুদ্ধতার খাতিরে রসিকসংখ্যার লাঘবতা কামনা করেছেন। যেমন এজরা পাউণ্ড, রবার্ট গ্রেভস। তাঁর জীবনের প্রথম দিকে একখানা চিঠিতে পাউণ্ড জানিয়েছিলেন, তাঁর কবিতার মর্ম বুঝবেন এমন পাঠকের সংখ্যা তিরিশ জনের বেশী হবে এই কামনা কোন কবিরই থাকা উচিত নয়। গ্রেভস আরও নির্দিষ্ট করে বললেন, কবিতা লেখা উচিত শুধু কবিদের জন্যই। পাউণ্ড বা গ্রেভস শিল্পের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্যই অল্প সংখ্যক পাঠকের অস্তিত্ব কামনা করেছিলেন। ১৯১৩ সালে লেখা একটি প্রবন্ধে পাউণ্ড স্পষ্টই বললেন—শিল্প কোনদিন কোন মানুষকে বিশেষ কিছু করতে বলেনি, ভাবতে বলেনি বা হতে বলেনি। এরপর ১৯২৮-এ পাউণ্ড প্রশ্ন তুললেন,—সমাজে বা রাষ্ট্রে সাহিত্যের কোন ভূমিকা আছে কি? সঙ্গে সঙ্গে নিজেই উত্তর দিলেন 'হ্যাঁ, আছে'। তবে সেক্ষেত্রে তিনি লেখককে সামাজিক জীবনে কোন সংস্কারকের ভূমিকা দিতে সম্মত হলেন না। বললেন, 'It has to do with the clarity and vigour of 'any and every' thought and opinion.' কথাটা আরও স্পষ্ট করে বললেন ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে: 'Writers are the valtometers and steamgauges of the nation's intellectual life. They are the registering instruments, and if they falsify their report there is no end to the harm they can do'.[১২] কবিকে সমাজের চাহিদা বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে, এমন কথা বলছেন না তিনি। তবে সততা রক্ষা করলে বুদ্ধিজীবী হিসেবে জাতীয়-জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন কবিরা—এই হচ্ছে পাউণ্ড-এর বক্তব্য। শতকের গোড়ার দিকে ব্রাডলে কবির জগৎকে পৃথক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বনির্ভর জগৎ বলে উল্লেখ করেছিলেন। পাউণ্ড ঠিক তা বলছেন না, তবে কবিকে তিনি সমাজের চিন্তাবিদদের মধ্যমণি ভাবতেন বলে মনে হচ্ছে। উভয়ের মিল এইখানে যে, কাব-সাহিত্যিককে তাঁরা জাগতিক নীতিনিয়মের বশীভূত বলে মনে করতেন না, বরং শিল্পীকে ভাবতেন 'একেশ্বর'। শিল্প ও শিল্পীর এই সার্বভৌম আধিপত্যে পাউণ্ডের মত এলিয়টও বিশ্বাসী ছিলেন। ১৯২৩-এ ('The function of criticism' প্রবন্ধে) তিনি বলছেন: শিল্প হিসেবে সার্থকতা লাভ ছাড়া শিল্পের অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই, একথা আমি স্বীকার করি

না। তবে শিল্পীকে সে বিষয়ে সজাগ থাকতে হয় না। বরং সেই সমস্ত উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিস্পৃহ থেকেই শিল্পী সেই সমস্ত কাজ ঠিকভাবে সম্পন্ন করতে পারেন। এই মন্তব্যের সাত বছর পরে (১৯৩০) এলিয়ট বললেন, এখনও কলাকৈবল্যতত্ত্ব সমান সত্য। এই সমস্ত অভিমত প্রকাশ কালে এলিয়ট, রোজার ফ্রাই ও এজরা পাউণ্ডের মতই পাঠকের সংখ্যাল্পতাকে কাব্যের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণরূপে গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য ১৯৪১ নাগাদ এলিয়ট তাঁর পূর্বের অভিমত সংশোধন করে কাব্য-সাহিত্যের 'moral function' স্বীকার করেছিলেন, যদিও সেই নীতি উনিশ শতকীয় অর্থে 'নীতি' নয়। সুতরাং এলিয়ট বা পাউণ্ড অল্পবিস্তর পরিমাণে কলাকৈবল্যবাদেরই সমর্থক ছিলেন।

বাঙলা-সাহিত্যে কলাকৈবল্যতত্ত্বের প্রবক্তা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। যদিও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ইংরেজী রোমান্টিক কবিদের ভক্ত পাঠক, ভিক্টোরীয় আর্নল্ড রাস্কিন-অস্কার ওয়াইল্ডের সমকালীন এবং এলিয়ট-পাউণ্ডের কাব্যকবিতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিত, তবু তিনি যেমন নৈতিকজীবনের শোধন বা ধর্মবোধের প্রতিষ্ঠাকে সাহিত্যের উদ্দেশ্য বলে গণ্য করেন নি, তেমনি রূপের প্রতি অত্যাশক্তিকেও তিরস্কার করেছেন। তাঁর কাছে, যেমন বিষয়টাই ঐকান্তিক-ভাবে কাব্য নয় 'রচনার মধ্যেই লেখক যথার্থরূপে বাঁচিয়া থাকে ; ভাবের মধ্যে নহে, বিষয়ের মধ্যে নহে,' এবং শিল্পী হচ্ছেন 'রূপকার', 'রূপদক্ষ' আর শিল্প হচ্ছে 'রূপবান', তেমনি তাঁর মতে, রূপের নেশায় 'রসকে' অস্বীকার করাও একান্ত মিথ্যাচার। আবার যে সময় তিনি বলেছেন, বিশুদ্ধ সাহিত্য অপ্রয়োজনীয়, ঠিক সেই সময়েই কালিদাসের 'শকুন্তলা' ও 'কুমারসম্ভব'-এর বিচারকালে aesthetics-এর সঙ্গে সনাতন ethics-এর মিলন সাধন করেছেন। সুতরাং কলাকৈবল্যবাদীদের বিষয়ে ও নীতিতে সমান বিরাগ এবং রূপে-আসক্তি রবীন্দ্র-নাথের ছিল না। ভারতীয় আলংকারিকদের 'রস'কে এবং 'রসাত্মক বাক্যই কাব্য' কাব্যের এই সংজ্ঞাকে সত্য বলে গ্রহণ করার জন্যই মনে হয় কলাকৈবল্যবাদীদের এক-দেশদর্শিতা রবীন্দ্রনাথকে বিচারমূঢ় করে নি। তবে যথার্থ বিচারকের স্বরূপ বিশ্লেষণ কালে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য সমালোচককে 'ব্যবসাদার বিচারক' থেকে যেভাবে পৃথক্ করে নিয়েছেন তাতে তাঁর উপর কলাকৈবল্যবাদীদের প্রভাব সক্রিয় বলে মনে হয়। প্রকৃষ্ট বিচারক 'সাহিত্যের নিত্যবস্তুর সহিত পরিচয় লাভ করিয়া নিত্যত্বের লক্ষণগুলি তাঁহারা জ্ঞাতসারে এবং অলক্ষ্যে অন্তঃকরণের

সহিত মিলাইয়া লইয়াছেন, স্বভাবে এবং শিক্ষায় তাঁহারা সর্বকালীন বিচারকের পদ গ্রহণ করিবার যোগ্য।'[১৩] এই বিচারকেরা 'নিজে সরস্বতীর সন্তান; তাঁহারা ঘরের লোক, ঘরের লোকের মর্যাদা বোঝেন'। এখানে রবীন্দ্রনাথ যাঁদের 'সর্বকালীন বিচারক' ও স্রষ্টার 'ঘরের লোক' বলে অভিহিত করেছেন তাঁদের সঙ্গে স্রষ্টার কোনরকম গুণগত পার্থক্য নেই। অস্কার ওয়াইল্ড প্রমুখ এই জাতীয় সমালোচকদেরই শুধু সাহিত্যবিচারকের মর্যাদা দিতে সম্মত ছিলেন। সাধারণভাবে সমস্ত কলাকৈবল্যবাদীরাই একজন ভালো বিচারকের কাছ থেকে স্রষ্টার সমান হৃদয়ানুভূতি দাবী করেছেন। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ বিশুদ্ধ নান্দনিকতার স্বার্থে সুরুচি ও সুনীতিকে বিসর্জন দিতে সম্মত না হলেও সৌন্দর্য ও আনন্দের প্রতি এবং রসানুকূল রূপরচনার প্রতি সমর্থন প্রকাশে এবং সমালোচক ও স্রষ্টার মধ্যে কোনরকম বিভিন্নতার অস্বীকৃতিতে ছিলেন কলা-কৈবল্যতত্ত্বেরই সমর্থক।

এখন উনিশ ও বিশ শতকের পাশ্চাত্ত্যের ভাববাদী কবি-সাহিত্যিকেরা 'শিল্পেই শিল্পের সার্থকতা' তত্ত্বটি প্রচারের দ্বারা শিল্প-সাহিত্যের যে সমস্ত মূল তত্ত্বের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন সেগুলি হচ্ছে: (ক) শিল্প-সাহিত্যে বিষয়বস্তু গৌণ, রূপটাই প্রধান (ব্রাডলে অবশ্য 'রূপ' ও 'বিষয়ে'র দ্বন্দ্ব মানতেন না); (খ) বিশুদ্ধ শিল্প বা সাহিত্য কোন জাগতিক প্রয়োজন সিদ্ধ করে না; (গ) সৌন্দর্যবোধ উদ্রেকের দ্বারা আমাদের হৃদয়ের অসাড়তা দূর করাই শিল্পী-সাহিত্যিকদের লক্ষ্য; (ঘ) কবিরা সৌন্দর্যের জগতে বন্দী ক্রীতদাস; শিল্প-সাহিত্যের জগৎ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জগৎ; (চ) শিল্পের সমালোচক শিল্পীর সমানুভূতির অধিকারী।

*   *   *   *

পূর্বেই বলেছি, কলাকৈবল্যবাদীদের উপর কান্ট-দর্শনের প্রভাব ছিল উল্লেখযোগ্য। আসলে সমস্ত উনিশ শতকের ভাববাদী শিল্প-দর্শনে হেগেলের পাশাপাশি কান্টের প্রভাবই ছিল বোধ হয় সর্বাধিক। তাঁর প্রভাবেই শিলার শিল্পকে বলেছিলেন মানবাত্মার খেলা, তাঁর 'disiuterested satisfaction' উক্তিটি শিল্প-সাহিত্য থেকে আনন্দলাভের কারণ ব্যাখ্যায় নির্দ্বিধায় স্বীকৃত

হয়েছিল এবং তাঁর 'Purposiveness without purpose' প্রবচনটি কলাকৈবল্যবাদীদের ভাবনাকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল। কিন্তু যখন একদিকে ভাববাদী দর্শনের প্রভাবে শিল্প-সাহিত্যে বিষয়বস্তুর গরিমা অস্বীকৃত হচ্ছে, উদ্দেশ্যহীনতাকে বলা হচ্ছে শিল্পের সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য তখন অন্যদিকে বস্তুবাদী দার্শনিকদের নেতৃত্বে গড়ে উঠেছে শিল্প-সাহিত্যের জগতে দুটি প্রধান আন্দোলন—'রিয়ালিজ্‌ম্' বা বাস্তববাদ এবং 'ন্যাচারালিজ্‌ম্' বা যথাস্থিতবাদ। এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনে শুধু যে কাণ্টের শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কিত মতবাদই খণ্ডিত হ'ল তা নয়, হেগেল-এর ভাববাদী দর্শনও খণ্ডিত হল অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে। হেগেলের ভাববাদ যেমন তাঁর স্বদেশ জার্মাণকে অতিক্রম করে ছড়িয়ে পড়েছিল পাশ্চাত্যের বিভিন্ন অঞ্চলে, তেমনি হেগেল-দর্শনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড়ও কেন্দ্রীভূত হ'ল নানা প্রান্তে। হেগেলেরই লীলাভূমি জার্মাণে উনিশ শতকের প্রথমার্দ্ধে বস্তুবাদী দার্শনিক লুডউইগ ফয়ারবাখ (১৮০৪-৭২) ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা কার্ল মার্ক্স (১৮১৮-৮৩) হেগেলের ভাববাদের বিরুদ্ধবাদী রূপে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করলেন। আর রাশিয়ায় হার্জেন (১৮১২-৭০), বেলিনস্কি (১৮১৮-৪৮), চেরনিশেভস্কি (১৮১৮-৮৯) প্রমুখ 'revolutionary democrat' গণ সেই সমস্ত বস্তুবাদী দার্শনিক যাঁরা স্পষ্টতঃই 'চ্যালেঞ্জ' জানালেন হেগেল-দর্শনকে। অন্যদিকে ফ্রান্সে সন্ত সিমোঁ ও ফুরিয়ের এবং ইংলণ্ডে রবার্ট ওয়েন-এর মত 'ইউটোপীয় সমাজবাদী'দের আবির্ভাব বস্তুবাদী সমাজতান্ত্রিক দার্শনিক রূপে। মার্ক্স-এর 'Scientific Socialism'-এর পূর্বে এঁদের প্রভাব ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং পাশ্চাত্যের বিভিন্ন অঞ্চলে উনিশ শতকের প্রথম ভাগেই ভাববাদ-বিরোধী বস্তুবাদী দার্শনিকদের প্রতাপ অনুভূত হচ্ছিল। অথচ এই সময়েই রোমান্টিক কবিদের সর্বোত্তম বিকাশ। হাইনে, বদ্‌ল্যার, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-শেলী-কীট্‌স্ এই সময়েরই কতকগুলি অবিস্মরণীয় নাম। উনিশ শতকের কাব্য-সাহিত্যের জগতে স্বর্ণযুগের স্রষ্টা ছিলেন এঁরাই। এঁদের মধ্যে হাইনে ও শেলী ছাড়া আর সকলে ছিলেন মোটামুটিভাবে বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের উপাসক। শেলীর 'The Revolt of Islam' এবং 'Prometheus Unbound' অন্ততঃ এই দু'খানি কাব্য তাঁকে তাঁর সহযাত্রী ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও কীট্‌স্ থেকে পৃথক রূপে চিহ্নিত করে। তাঁর এই দু'খানি সৃষ্টিকে গোর্কি-কথিত 'active romanticism'-এর দৃষ্টান্ত স্বরূপ গ্রহণ করা সম্ভব বলে মনে করি।

গোর্কি-র এই 'active romanticism' এর লক্ষণ হচ্ছে 'to strengthen man's will to live and raise him up against the life around him, against any yoke it would impose.'[১৪] আর হাইনে, যাঁর কবিতায় প্রেমানুভূতির ঘটেছিল বিচিত্রমুখী বহিঃপ্রকাশ, তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির দীপ্তি, সতেজ মননশীলতা, সামাজিক ও রাজনৈতিক দোষ-ত্রুটির প্রতি আপাতসরল তির্যক মন্তব্যের তাৎপর্য মুগ্ধ করেছিল মনীষী কার্ল মার্ক্সকে।[১৫] সুতরাং রোমান্টিক হিসেবে পরিচিত কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যেও বিপ্লবী-ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে এবং সঙ্গত কারণেই তা ঘটা সম্ভব। আবার অন্যদিকে যে বালজাক-পুশকিন-এর সৃষ্টিকর্ম বাস্তববাদের দৃষ্টান্তরূপে পরিচিত তাঁরাও রোমান্টিকতার স্পর্শমুক্ত ছিলেন না। আসলে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকে রোমান্টিক বা রিয়ালিস্ট উভয় শ্রেণীর শিল্পীরাই মানুষের ব্যক্তিত্ব-বিকাশের অনুপযোগী মনে করতেন বলে এই শ্রেণীর সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। পার্থক্য শুধু সেই বিদ্রোহের প্রকাশে। সেই পার্থক্যের কারণ আছে রোমান্টিকদের অতিসজাগ 'ego'-এর মধ্যে। অতএব ইতিহাসের একই অধ্যায়ে আবির্ভূত রোমান্টিক ও রিয়ালিস্টরা তাঁদের নিজেদের মধ্যেকার কল্পিত বিভেদ-রেখা লঙ্ঘন করতে পারেন অনায়াসে। সাহিত্যের জগতে এই সমস্ত বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে কোনরকম সুনির্দিষ্ট পার্থক্যজ্ঞাপক সীমাচিহ্ন অঙ্কন করা সম্ভব নয়। গোর্কি ঠিকই লক্ষ্য করেছেন, 'in great artists realism and romanticism seem to have blended.'

৪ ॥ সংশয়, দ্বন্দ্ব ও পথের সন্ধানে

ক ॥ বাস্তববাদ

'মহৎ শিল্পীদের রচনায়, মনে হয়, বাস্তবতা ও রোমান্টিকতা বিমিশ্রিত হয়ে থাকে'। —গোর্কির এই মন্তব্যের সারবত্তা প্রমাণ করা সম্ভব নানা দৃষ্টান্ত সহযোগে। ইতিহাসের একই পটভূমিতে যাঁদের আবির্ভাব ও বিকাশ, জীবন সম্পর্কে তাঁদের দার্শনিক প্রত্যয়ের পার্থক্য যত গভীরই হোক, তাঁরা কদাপি নিজেদের সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করবেন না, তা কখনও হয় না। তদুপরি তাঁদের সাম্রাজ্যের সীমারেখাই যদি স্পষ্ট না হয়। সুতরাং রোমান্টিকের বাস্তবজীবন-প্রীতি ও বাস্তববাদীর রোমান্টিক-ভাবুকতা কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। এখন তাহ'লে কোন সূত্রের উপর নির্ভর করে রোমান্টিকের সঙ্গে বাস্তববাদীর পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভব? এমার্সন ও পো-এর সঙ্গে হাওয়েলস ও হেনরি জেমস্-এর পার্থক্য কোথায়? পার্থক্য কোথায় বদ্‌ল্যার-এর সঙ্গে বালজাকের? এই পার্থক্য কি তাঁদের বিষয়বস্তু নির্বাচনে? অথবা, তাঁদের রূপ-রচনারীতিতে? অথবা, উভয় ক্ষেত্রেই?

প্রাচীন গ্রীক নাটকে রীতিগত বাস্তবতা ছিল না, ছিল বিষয়বস্তুর বাস্তবতা। মধ্যযুগীয় রোমান্সে বিষয়বস্তুর বাস্তবতা ছিল না, ছিল রূপরীতির বাস্তবতা। কিন্তু আমরা বাস্তবতা-প্রধান রচনা বলে প্রাচীন বা মধ্যযুগের কোন সৃষ্টিকেই তো গ্রহণ করি না। বাস্তব-জগতের উপর তাঁদের সৃষ্টির ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন হোমর-শেক্‌স্‌পীয়র-রাবেলা-সারভেনতেজ, আবার উনিশ শতকে স্তাঁদাল-বালজাক ফ্লোবেয়ার, পুশকিন টলস্টয়-শেকভ, শার্লোটব্রন্টি-ডিকেন্স-হেনরি জেমস্ও সেই বাস্তবজগতের উপাদান এবং সমস্যাই তাঁদের গল্পে-উপন্যাসে-নাটকে ব্যবহার করেছেন। এখন সাধারণত 'বাস্তবতা' বলতে যদি বুঝি বস্তুজগৎ থেকে আহৃত উপাদানের যথাযথ ব্যবহার তাহ'লে সেই বাস্তবতা যেমন হোমরে ছিল না, তেমনি হেনরি জেমস্ এও নেই। প্রাত্যহিক সত্যের যথাযথ রূপায়ণকে সাহিত্য

বলে গ্রহণ করতে কোন শিল্পী বা আলংকারিকই সম্মত নন। অথচ 'বাস্তব' বলতে আমরা বুঝি সেই সত্য যা চোখে দেখি বা ধরতে ছুঁতে পারি। এককথায় পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কোন না-কোন একটির পথে যার আবির্ভাব ঘটে তাকেই শুধু 'বাস্তব' বলে মানি আমরা। কিন্তু এই অর্থে সাহিত্য কোনদিনই 'বাস্তব' নয়।

শিল্প-সাহিত্যে 'বাস্তব' শব্দটি এসেছে দর্শন থেকে। দর্শনে 'রিয়ালিজ্‌ম্'-এর ব্যবহার কখনও 'নোমিনালিজ্‌ম্'-এর আবার কখনও বা 'আইডিয়ালিজ্‌ম্' ও 'সিনিসিজ্‌ম্'-এর বিপরীতার্থে। শিলার এবং শ্লেগেল, এই দুই দার্শনিক অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে শিল্প-সাহিত্যে 'external reality' অর্থে 'realism' শব্দটি আমদানি করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা শব্দটিকে সাহিত্যে খুব কাম্য বিবেচনা করেন নি। নতুবা ১৭৯৮-এ একটি চিঠিতে শিলার গ্যেটেকে লিখতেন না—রিয়ালিজ্‌ম্-এর প্রতি আসক্তি থেকে কেউ কবি হন না। অথচ যে-গ্যেটেকে শিলার এই কথা লিখছেন সেই তিনি বিশ্বভ্রাতৃত্ববাদ প্রচারের মত ভাববাদী হলেও বেশ কিছু ঐতিহাসিক কাহিনীনির্ভর নাটকের রচয়িতা এবং জ্ঞানভিক্ষু ফাউস্তের ট্রাজিক পরিণতির রূপকার। তা ছাড়া ফরাসী বিপ্লবের পরবর্তী কালের রচনাগুলিতে জীবনের উপান্ত পর্বে গ্যেটে য়ুটোপীয় সমাজবাদীদের চিন্তাই যেন প্রকাশ করতে শুরু করেছিলেন তাঁর সৃষ্টিকর্মে। এমন কি স্বয়ং শিলারও তাঁর শেষ দিকের নাটকগুলিতে[১] ইতিহাস থেকে শুধু বিষয়বস্তুই সংগ্রহণ করেন নি, ইতিহাসের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্যে যথার্থ বস্তুসচেতন শিল্পীর দৃষ্টি ব্যবহার করেছিলেন। আসলে যেহেতু 'realism' বলতে তখন 'external reality'-র হুবহু অনুকরণ বোঝান হত তা-ই সাহিত্যে এই শব্দের অনুপ্রবেশের তাৎপর্য শিলার-এর কাছে খুব সুখদায়ক মনে হয় নি, আবার গ্যেটে-শিলার-এর কালেই বা বলি কেন, দীর্ঘকাল পর্যন্ত অনেক ভাববাদী রোমান্টিকের কাছেই 'realism' শব্দটি বাহ্যবস্তুর অনুকরণ-ছাড়া কিছু ছিল না। এই অর্থেই 'বাস্তব' শব্দটিকে গ্রহণ করে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—'বাস্তবিকতা কাঁচপোকার মতো আর্টের মধ্যে প্রবেশ করিলে তেলাপোকার মতো তাহার অন্তরের সমস্ত রস নিঃশেষ করিয়া ফেলে।'[২] এবং অন্যত্র: 'য়ুরোপীয় সাহিত্যে কোথাও কোথাও দেখিতে পাই, মানবচরিত্রের দীনতা ও জঘন্যতাকেই বাস্তবিকতা বলিয়া স্থির করা হইয়াছে'।[৩] রবীন্দ্রনাথের এই শেষোক্ত মন্তব্যের অনুরূপ একটি

উক্তি আছে ইংরেজ সমালোচক হার্বার্ট-রীড-এর একটি লেখায়: 'the realistic writer is generally one who emphasizes a certain aspect of life, that being the one least flattering to human dignity'[8]। কিন্তু সত্যিই কি আর্টের মধ্যে বাস্তবতা প্রবেশ করলে তার অন্তরের রস নিঃশেষ করে ফেলে? অথবা, মনুষ্যত্বের ন্যূনতম মর্যাদাই স্বীকার করে থাকেন বাস্তববাদী শিল্পীরা? প্রথম প্রশ্নের সহজ সমাধান হচ্ছে, বাস্তবতা যে আর্টের অন্তরের রস নিঃশেষ ক'রে না-ফেলে আর্টকে উজ্জ্বল করে তোলে বিগত এক শতকের বিশ্বের শিল্প-সাহিত্যে তার প্রমাণ আছে। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয়, মনুষ্যত্বের অবমাননাই যদি বাস্তববাদীদের লক্ষ্য হত তাহলে বালজাক-ফ্লোব্যার-টলস্টয়-গোর্কি-ডিকেন্স-হেনরি জেম্স্ অথবা 'শ-ইবসেন বিদগ্ধ পাঠকদের তৃপ্ত করতেন না। এবং এঁদের গল্পে-উপন্যাসে-নাটকে মানুষের চরিত্রের দীনতা ও জঘন্যতাই যদি একমাত্র প্রচারের বিষয় হত তাহ'লে পৃথিবীর মানবপ্রেমিকেরা এঁদের রচনাকে তাঁদের ভাবনার সঙ্গী করতেন না।[৫] সুতরাং এঁরা 'বাস্তব' শব্দটি যে অর্থেই গ্রহণ করুন না-কেন, এঁদের দেওয়া 'বাস্তবের' সংজ্ঞার্থ পৃথিবীর বাস্তববাদী শিল্পীদের কর্মের দ্বারা সমর্থিত নয়। বাস্তববাদী দার্শনিকেরাও পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা স্বীকার করেন না। অর্থাৎ 'external reality'-কেই সাহিত্যে 'realism' বলে শিল্পীরা মানেননি, দার্শনিকেরাও ন'ন।

'External reality'ই যদি সাহিত্যের 'বাস্তব' হয় তাহ'লে বিষয়টাই হয় বাস্তববাদী সাহিত্যের 'সর্বস্ব', বিষয়ীর কোন স্থান বা মর্যাদা থাকে না সেখানে। কিন্তু এমন সাহিত্য বা শিল্পের অস্তিত্ব কি সম্ভব যেখানে বিষয়ীর কোন ভূমিকা থাকে না? হয়ত রোমান্টিক কাব্যে 'বিষয়ী' প্রধান, 'বিষয়' গৌণ। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, রোমান্টিক কাব্যে বিষয়ের এবং বাস্তববাদী সাহিত্যে বিষয়ীর কোন মূল্যই নেই। তাই যদি হয় তাহ'লে রোমান্টিক কাব্য শুধু কবির অলীক কল্পনা এবং বাস্তববাদী সাহিত্য কতকগুলি বাস্তব ঘটনার সমাহারমাত্র। কিন্তু সাহিত্যের পাঠকমাত্রেই জানেন, একথা সত্য নয়। 'মনের পরশ' ছাড়া সাহিত্য হয় না; রোমান্টিক সাহিত্য নয়, বাস্তববাদী সাহিত্যও নয়। কোন অবস্থাতেই কোন শিল্পীর পক্ষে তাঁর 'মন' বা 'রুচি' বিসর্জন দেওয়া সম্ভব নয় বা উচিত নয়। 'ক্যামেরাম্যান'-এর সঙ্গে চিত্রকরের পার্থক্য মৌলিক। 'ক্যামেরাম্যান' যত কৌশলীই হোন, শিল্পী বা কলাবিদ্‌গুণী নন।

তিনি 'যথাযথে'র দাস। কিন্তু চিত্রকর তিনি 'অ্যাবস্ট্রাক্ট' বা 'রিয়ালিস্টিক' যে পদ্ধতিরই অনুরাগী হোন না-কেন 'মন' এবং মনের নির্বাচন-দক্ষতা বর্জন করতে পারেন না। অথচ প্রথম দিকে 'বাস্তব' বলতে মন-সম্পর্ক-শূন্য 'external reality'ই বোঝাত। ফলে দেখি ১৮৫৫-তে গুস্তাভ কুরবের (Courbet) আঁকা কৃষক ও মধ্যবিত্তের জীবন-ঘেঁষা কতকগুলি ছবি যখন 'Realism: Exhibit and Sale of 40 Pictures and 4 drawings' এই শিরোনামাঙ্কিত হয়ে ফ্রান্সে প্রদর্শিত হল তখন কুরবে ছবির সঙ্গে প্রকাশিত 'ক্যাটালগে' আপত্তি জানিয়ে বললেন, 'রিয়ালিজ্‌ম্' শব্দটা তাঁর শিল্পের উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, যেমন করে তিরিশের দশকের শিল্পীদের উপর 'রোমান্টিক'-এর স্মারক চিহ্ন সেঁটে দেওয়া হয়েছিল। কুরবে-র আপত্তি থেকে মনে হয় শিল্পের উপর কোনো বিশেষ 'ইজ্‌ম্'-এর পরিচয় চিহ্ন ব্যবহারের বিরুদ্ধেই তাঁর ক্ষোভ। এই জাতীয় ধারণায় অবশ্য যুক্তি আছে অনেকখানি। শিল্পী, তিনি যে-পদ্ধতিই অবলম্বন করুন না-কেন, বস্তুজগৎ থেকে বিষয় গ্রহণ করেন মনের নির্বাচন দক্ষতা দিয়ে, এবং তাকে যখন শিল্পমূর্তিতে স্পষ্ট করে তোলেন তখনও 'মন'ই তাঁর প্রধান সহায়। অর্থাৎ উপাদান ও রূপায়ণের পার্থক্য ছাড়া শিল্পসৃষ্টির মূল রহস্য সমস্ত মতবাদীর ক্ষেত্রেই অভিন্ন। জগতের উপর মনের কারখানা, মনের উপর বিশ্বমনের কারখানা এবং সাহিত্যের সৃষ্টি উপরতলা থেকে, রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য বাস্তববাদীদের ক্ষেত্রেও সমান প্রযোজ্য। বাস্তব-বাদী রুশ-দার্শনিক বেলিনস্কির মুখে গত শতকের প্রথমার্ধে শোনা গিয়েছিল: 'fidelity to nature is not the be-all and end all of art'........ 'The truth is that imagination in art plays the most active, the leading role'.* যখন এই কথাগুলি বেলিনস্কি বলেছেন তখন তিনি হেগেল-এর ভাববাদী দর্শনের প্রভাবের আওতা থেকে শুধু দূরে সরে আসেন নি, ভি. পি. বোটকিনের কাছে লেখা একখানি চিঠিতে (১. ৩. ১৮৪১) মৃত হেগেলের উদ্দেশে (হেগেলের মৃত্যু ১৮৩১-এ) চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন। সুতরাং হেগেলের প্রভাবে যে তিনি এখানে 'ইমাজিনেশন'-এর গুরুত্ব স্বীকার করেছেন, তা নয়। একজন বস্তুবাদী (realist) হিসেবেই বেলিনস্কি-র এই সিদ্ধান্ত। লেখকের কল্পনা, মর্জি বা যুক্তিবুদ্ধির খুবই মূল্য স্বীকার করতেন তিনি, যেহেতু শিল্পের জগৎ ছিল তাঁর কাছে নতুন সৃষ্ট এক জগৎ—'Art is

the representation of reality, the reduplicated, or, as it were, newly created world'।[৭] এই নতুন জগতে, তাঁর মতে, সত্যের সঙ্গে কল্পনার, বিজ্ঞানের সঙ্গে শিল্পের কোন দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক তো নেই-ই, বরং তারা পরস্পরের সহযোগী। শিল্প-সাহিত্যের জগতের সঙ্গে বিজ্ঞানের জগতের পারস্পরিক বৈপরীত্যকে একটি স্বীকৃত সত্যরূপে গ্রহণ করেছিলেন ভাববাদীরা। বিজ্ঞানের জগৎ, তাঁদের মতে, ভাবনা ও চিন্তার জগৎ, বস্তুর জগৎ; অন্যদিকে শিল্প-সাহিত্যের জগৎ ভাব ও আবেগের জগৎ, কল্পনার জগৎ। কিন্তু বেলিনস্কি বললেন, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের পার্থক্য ভাব ও ভাবনার পার্থক্য নয়, এই পার্থক্য রূপায়ণপদ্ধতিগত। সাহিত্যের কাজ প্রদর্শন, বিজ্ঞানের কাজ প্রমাণ; অতএব তাঁর সিদ্ধান্ত '....art and Science are equally indispensible, and neither science can replace art, nor art replace science.'[৮] এখন বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির দিনে মানুষ যখন তার সুচিরকালীন বিশ্বাস ও ভরসার স্বর্গলোক থেকে নির্বাসিত হয়ে সুখ-দুঃখের কার্য-কারণ সম্পর্ক বাস্তবে সন্ধান করতে আরম্ভ করেছে তখন শিল্পীর ভূমিকা কী হবে? তিনি কি তাঁর কল্পলোকেই নিশ্চিন্ত বিশ্রাম গ্রহণ করবেন, যেহেতু সে জগতে বাস্তবের দুঃখ-দৈন্য তার মলিনস্পর্শ যুক্ত করতে পারে না? এই প্রশ্নের সঠিক জবাব দিয়েছেন বেলিনস্কি: 'The poet's individuality is not something absolute, standing apart, beyond all extraneous influence. The poet is first of all a man and then a citizen of his land and a son of his times.'[৯] শিল্প যা-ই হোক, শিল্পী অন্ততঃ নিজের দেশ ও কালের সন্তান। সুতরাং শুধুমাত্র স্বাতন্ত্র্যের জোরে তিনি তাঁর সমকালের সভ্যতার প্রগতির ধারাকে অস্বীকার করতে পারেন না, পারেন না যুগের চাহিদাকে বিসর্জন দিতে। যেহেতু তাঁর কাল ও পরিবেশ থেকে শিল্পী তাঁর প্রাণের রস সঞ্চয় করে থাকেন, সুতরাং কাল ও পরিবেশকে অস্বীকার করে চিরন্তনতার অজুহাতে একই বিষয়বস্তু একই পদ্ধতিতে সাহিত্যিকেরা রূপায়িত করবেন, তা কখনও সমর্থন করা যায় না।

যাঁরা চিরন্তন-সাহিত্যের কথা বলেন তাঁদের প্রধান যুক্তি হচ্ছে—স্থান বা যুগের পরিবর্তন হলেও মানবপ্রবৃত্তি যেহেতু অপরিবর্তনশীল এবং মানবহৃদয় ও মানবচরিত্রই সাহিত্যের উপজীব্য অতএব ক্ষণ-চঞ্চল সমস্যাকে সাহিত্যের

বিষয়ীভূত করলে সে-সাহিত্য চিরজীবী হতে পারে না। শেক্স্‌পীয়র বা কালিদাস চিরন্তন সাহিত্যের স্রষ্টা, যেহেতু কোন বিশেষকালের স্পর্শ লাগেনি তাঁদের সৃষ্টিতে। কিন্তু এ যুক্তি খুব কঠোর ভিত্তির উপর স্থাপিত নয়। স্রষ্টা হিসেবে কালিদাস বা শেক্স্‌পীয়র তাঁদের যুগেরই সন্তান, এই হচ্ছে সঠিক সত্য। তাঁদের দেশ-কাল নিরপেক্ষভাবে তাঁরা মহান স্রষ্টা হন নি। বিক্রমাদিত্যের কাল বা এলিজাবেথীয় যুগ দ্বিতীয় একজন কালিদাস বা দ্বিতীয় একজন শেক্স্‌পীয়র দেয়নি বলেই যে এঁরা দেশ-কালের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত তা অবশ্যই সঠিক নয়। দ্বিতীয়তঃ, মানবহৃদয়ের প্রবৃত্তিগুলি শাশ্বত হলেও তাদের প্রকাশ চিরকাল এক নয়। সমাজের সঙ্গে ব্যষ্টির সম্পর্ক নিত্য পরিবর্তনশীল। সমাজের সমস্যাও উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়ে থাকে। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় ধনের সঙ্গে শ্রমের যে সম্পর্ক ছিল, কল-কারখানা ভিত্তিক ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সেই সম্পর্ক হয়েছে পরিবর্তিত। সুতরাং সমাজের মধ্যে মানুষে-মানুষে সম্পর্ক কোন একটি ধ্রুব আদর্শের ভিত্তির উপর চিরস্থির হয়ে নেই। মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটেছে, বঞ্চনা ও শোষণেরও স্বরূপ বদল হয়েছে। এই অবস্থায় সাহিত্যের বিষয়বস্তু, জীবন সম্পর্কে সাহিত্যিকদের বোধ নিশ্চয়ই প্রাচীন কোন আদর্শে বদ্ধ হয়ে থাকতে পারে না। যুগ ও পরিবেশের সন্তান হিসেবে পরিবর্তিত পরিস্থিতির নিত্য-নূতন সমস্যা সাহিত্যিক অঙ্গীকার করতে বাধ্য। তাই দেখি বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে মানুষের জীবনে নিত্যনূতন সুযোগ ও জটিলতা দুই-ই বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সাহিত্যিকও মানব জীবনকে রূপ দিতে গিয়ে বিশ্লেষণধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বাস্তবসমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন। রুশ বস্তুবাদী দার্শনিক চেরনিশেভস্কি ও ডোব্রোলিউবফ (বেলিনস্কির পর) বলেছিলেন: বাস্তবজীবনে যার অস্তিত্ব নেই, সাহিত্যে তা কদাপি রূপায়িত হবে না। সাহিত্য হবে প্রচারের মাধ্যম এবং কেমন ভাবে এই প্রচারকার্য সম্পন্ন হয় তার উপর নির্ভর করে সাহিত্যের মর্যাদা। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, বাস্তবের কোন্‌টি শিল্পী গ্রহণ করবেন এবং বর্জন করবেন কোন্‌টি? এর উত্তর একটাই—মানুষের জীবনের মূল-সমস্যা কেন্দ্রীভূত যেখানে, শিল্পীর সৃষ্টির উপাদানও সেখানেই মিলবে। মানুষের প্রবৃত্তিগুলি স্থান-কালোত্তীর্ণ, এ যেমন সত্য, তেমনি সত্য একই ধরণের অর্থনীতির বিকাশে মানুষে-মানুষে একই জাতের সম্পর্কের উদ্ভব। সুতরাং মানব-সম্পর্কের বিকাশ বিষয়ে সচেতন শিল্পীরা চিরকালই দেশকালোত্তীর্ণ হয়ে

থাকেন। স্থানের গণ্ডি ভেঙে ডিকেন্স লাভ করেছেন বেলিনস্কির সপ্রশংস অনুমোদন। আরও পরে স্তাঁদাল, বালজাক ও ফ্লোবেয়ার সম্পর্কে অকৃত্রিম মুগ্ধতা প্রকাশ করেছিলেন মাক্সিম গোর্কি। আর জন রীড পেয়েছেন লেনিনের সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি। কিন্তু দেশের গণ্ডি অতিক্রম করতে পেরেছেন বলে কালের গণ্ডি অতিক্রম করতে পারবেন কি? সংশয়বাদীর মনে এই জিজ্ঞাসার জন্ম হওয়া অসম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে বলতে হবে, শতাব্দীর বাধা ভেঙেছেন এঁরা, একালের পাঠকেরাই তার প্রমাণ। সুদূর ভবিষ্যতের কথা সুনিশ্চিতভাবে বলা যখন সম্ভব নয় তখন সেক্ষেত্রে সংশয়ও নিরর্থক। তবে বলতে বাধা নেই, প্রচলিত সমাজব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতি সমালোচনা করে বাস্তববাদী সাহিত্যিকেরা সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁদের যে সহানুভূতি দেখিয়েছেন, বঞ্চিতের সংগ্রামী জীবনের সঠিক ছবি এঁকেছেন, তার জন্যই আগামীকাল স্মরণ করবে তাঁদের।

শুধু বিষয়ের গুণে কেউ শিল্পী ন'ন, 'দৃষ্টি' ও 'সৃষ্টি' এই দুই-এ মিলে তবে একজন শিল্পী! ১৮৩১-এ ফরাসী বাস্তববাদী ঔপন্যাসিক বালজাক তাঁর 'La peau de chagrin'-এ বলেছিলেন—বই লেখার আগে লেখককে হতে হবে মানবচরিত্র বিশ্লেষণ ও রূপায়ণে দক্ষ, মানুষের বিচিত্র প্রবৃত্তি ও অনুভূতির সঙ্গে সুপরিচিত এবং ব্যাপক ও গভীর চিন্তাশক্তির অধিকারী। অর্থাৎ অভিজ্ঞতা, অনুভূতি ও রূপায়ণ-দক্ষতা এই তিনটি উপাদানের উপরেই, বালজাক মনে করতেন, কোন লেখকের সাফল্য নির্ভর করে। এই তিনের মধ্যে, লক্ষ্য করা যেতে পারে, অভিজ্ঞতাই শুধু তথাকথিত বাস্তব উপাদান, তা ভিন্ন 'অনুভূতি' শিল্পীর অন্তরের গোপনতম ব্যাপার (যার উদ্দীপনা অবশ্য বাহ্য-উপাদানের উপর নির্ভরশীল), আর রূপায়ণ-দক্ষতা শিল্পীকে চর্চার দ্বারা অর্জন করতে হয়। সুতরাং প্রয়োজনীয় বাস্তব উপাদানের জন্য বাহ্য-অভিজ্ঞতা থাকাই শিল্পীর পক্ষে সিদ্ধিলাভের ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। আরও কিছু থাকা চাই। সেই 'আরও কিছু' কিন্তু রোমান্টিক-রিয়ালিস্টিক নির্বিশেষে সকলেরই কাছ থেকে কাম্য। নতুবা শিল্পী হওয়া যায় না। অতএব বাস্তববাদী বালজাক 'যেন-তেন প্রকারেণ' বাস্তব ঘটনার সমাহারকেই সাহিত্য বলে গণ্য করতেন না। স্তাঁদালও দেখি উপন্যাসকে শুধু বাস্তব ঘটনার সংকলন রূপে দেখেন নি। তাঁর মতে, উপন্যাস হচ্ছে এমন একখানি 'আরশি' যেখানে নীল আকাশ ও কর্দমাক্ত পথ দুই-ই স্পষ্ট প্রতিবিম্বিত হয়। অথচ বাস্তববাদ-বিরোধীরা বাস্তববাদীদের সম্পর্কে এই

কথাই বলে থাকেন যে, এঁদের কাছে ফুল অপেক্ষা কর্দম বাস্তব, যা যত নীচে থাকে তাই তত বাস্তব। কিন্তু এ হচ্ছে প্রতিপক্ষ সম্পর্কে সহজ সিদ্ধান্তের লালসায় প্রকৃত সত্যের বিকৃতি। পুশকিন, স্তাঁদাল, বালজাক ও ফ্লোব্যার থেকে আরম্ভ করে হেনরি জেম্‌স্‌ পর্যন্ত বা তারও পরে কোন বাস্তববাদীই শুধু 'কর্দমাক্ত পথ'-এর রূপ ফুটিয়ে তোলেন নি তাঁদের সাহিত্যে। তাহ'লে এই অভিযোগের কারণ কি? মনে হয় বাস্তববাদীরাই যেহেতু প্রথম নীচুতলার মানুষের দুঃখ-দৈন্যের ছবি ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন, সক্ষম হয়েছিলেন সামাজিক উৎপীড়ন ও শোষণের ক্লেদাক্ত দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত করতে তা-ই তাঁদের বিরুদ্ধে ভাববাদীদের এই অভিযোগ। ইতিহাসের পৃষ্ঠা খুললে দেখা যাবে ফ্রান্সে যখন স্তাঁদাল-বালজাকের যুগ তখন ফ্রান্সের গৌরবময় অধ্যায় সমাপ্ত, শুরু হয়েছে অবক্ষয়ের পালা। এই পরিস্থিতিতে লেখকেরা ঘৃণা ও বিরক্তিতে তাকালেন সমকালের দিকে, নিজেদের লেখনীকে ব্যবহার করলেন সামাজিক অধঃপতনের বিরুদ্ধে অস্ত্ররূপে। পূর্বসূরী বেঞ্জামিন্‌ কনস্তাঁত-এর মত এঁরা আত্মজৈবনিক রচনা না লিখে ফুটিয়ে তুললেন স্ফীতোদর পুঁজিপতিদের সুতীব্র অর্থলালসা, চারিত্রিক অবিশুদ্ধতা, মাত্রাতিরিক্ত ইন্দ্রিয়াসক্তি ও গোপন ব্যভিচারের যথার্থ চেহারা। বালজাক তাঁর বিখ্যাত 'ড্রোল স্টোরিজ'-এ বিত্তবান পরিবারের মানুষগুলির চরিত্রের বিভিন্ন দিকের দৈন্যের স্বরূপ একজন সমালোচকের দৃষ্টিকোণ থেকে অতি নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুললেন। এই সমালোচনা মাঝে মাঝে তির্যক পথ ধরলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তীব্রবেগে ঋজুপথে ধাবিত হয়েছে প্রতিপক্ষের দিকে। স্তাঁদালও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার কুফল দেখিয়ে দিলেন জুলিয়েঁ সোরেল-এর মত একটি যুবকের আত্মিক পরাজয়ের করুণ কাহিনীর মধ্য দিয়ে। কলে-কারখানায় বিকশিত পুঁজিপতিরা কাঞ্চন-মূল্যের বিনিময়ে শুধু মানুষের শ্রম কেনে না, তাদের আত্মার স্বাধীনতাও কিনে ফেলতে চায়। জুলিয়েঁ সোরেল সেই বিপন্ন-হৃদয় মানুষের প্রতিনিধি। একেই যেন আমরা খুঁজে পেয়েছিলাম ডস্টয়েভস্কি-র 'Crime and Punishment'-এ রাসকল নিকভের নামান্তরে। ধনতন্ত্রের হাতে আত্মার পরাজয় জুলিয়েঁ সোরেল-এ, আর ফ্লোব্যার-এর 'মাদাম বোভারি'তে ধনতন্ত্রেরই কুফল সজনে নির্জনতা এবং লোকালয়ে একাকী-ত্ব বোধ-হেতু মানসিক বিচ্ছিন্নতার ব্যাধি-পীড়িত এমা-র আত্মহত্যা। পরিবেশের হাত থেকে নিষ্কৃতির জন্য অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত এমা শেষপর্যন্ত যে পথ বেছে নিয়েছে

তা বিশেষ অর্থ নৈতিক অবস্থায় যেমন অনিবার্য তেমনি মর্মপীড়াদায়ক। অভিজাততন্ত্রের অবসানে ফ্রান্সের রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক জীবনের যে-সংকট ব্যক্তিজীবনে ঘনীভূত হয়েছিল, স্তাঁদাল-বালজাক-ফ্লোব্যার তারই রূপকার। যে-কালের ইতিহাস সাহিত্য-রূপ পেয়েছে এঁদের হাতে, স্বাভাবিক কারণেই সে-কালের কোন স্বাস্থ্যোজ্জ্বল জীবনের ছবি ফুটতে পারে না এঁদের সৃষ্ট চরিত্রের মধ্যে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ-কথিত 'মানবচরিত্রের দীনতা', হার্বার্ট রীড-কথিত 'aspect of life.......least flattering to human dignity' বালজাক প্রমুখের উপন্যাসে আপাতভাবে সত্য বলে ধ'রে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু স্তাঁদালের জুলিয়েঁ সোরেল, বালজাকের Raphael, Rastignac, Vautrin তাঁদের মুক্ত-হৃদয় ও আদর্শবোধ নিয়ে সংগ্রাম চালিয়েছে ধনতন্ত্রের অনিবার্য কুফলের বিরুদ্ধে এবং আর সকলের প্রতিবাদকে ছাড়িয়ে গেল এমার বিষপান। এমা-র প্রতিবাদ নির্বাক ও নিষ্ঠুরতম। অতএব দীনতার ছবি আপাতসত্য মাত্র, প্রতিবাদেই লেখকদের বক্তব্য লুকিয়ে আছে। কিন্তু প্রতিবাদ থাকলেও শোষণ ও অনাচারের প্রতিকারের কোন পন্থা নির্ধারিত হয় নি। বালজাক প্রমুখ সে দায়িত্ব স্বীকার করেন নি। বালজাক জানতেন অভিজাতদের কথা, নয়া বিত্তবান ও শোষিত শ্রেণীর কথা। জানতেন সন্ত সিমোঁ-র মত 'য়ুটোপীয় সমাজতন্ত্রী'র কথা। তাই ধনতন্ত্রের ধ্বংসকে অনিবার্য জেনেছিলেন, সহানুভূতি প্রকাশ করেছিলেন সংগ্রামী শ্রমজীবীর প্রতি। কিন্তু প্রচলিত কাঠামোর বিপর্যয় না ঘটিয়ে বর্তমান পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটবে, এই ছিল তাঁর বিশ্বাস।

যে পদ্ধতিতে ফ্রান্সে ব্যক্তিজীবন-সমস্যাকে রূপায়িত করেছিলেন বালজাকের মত শিল্পীরা, সেই একই পদ্ধতি রুশ সাহিত্যে ব্যবহার করলেন পুশকিন-গোগোল আলেকজাণ্ডার অস্ট্রভস্কি এবং কিছুটা ভিন্ন কথা বললেও লিও টলস্টয় আর ইংরেজী সাহিত্যে ডিকেন্স ও পরে হেনরি জেম্‌স্ প্রমুখ। পুশকিনের বিভিন্ন স্তরের রচনার মধ্যে জনৈক সমালোচক বলেছেন 'Criticism of Capitalism became an important aspect'[১০] পুশকিন তাঁর নায়কের অশান্তির কারণ সন্ধান করেছিলেন সামাজিক ঘটনার মধ্যে, যেহেতু তিনি বিশ্বাস করতেন পরিবেশ ও পরিস্থিতির উপর নির্ভর করেই মানবচরিত্র গড়ে ওঠে। পুশকিন রোমাণ্টিক হিসেবে পরিচিত হলেও 'The Captain's

daughter' রচনার সময় বালজাক-কথিত 'লেখকের দায়িত্ব' সঠিক পালন করেছিলেন। ১৭৭৩-'৭৫-এর পুগাচেভ-এর নেতৃত্বে পরিচালিত কৃষক-বিদ্রোহের কাহিনী নিয়ে লেখা এই উপন্যাস রচনার সময় যথার্থ বাস্তববাদীর দৃষ্টি নিয়ে কাজান, ওরেনবার্গ এবং আরও বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে বেরিয়েছিলেন পুশকিন। এই অধ্যবসায় ও নিষ্ঠার কারণ জীবনকে বাস্তবতার পটে বিন্যস্ত করার বাসনা। গোগোল-এর বর্ণনার যথাযথতা, অস্ট্রোভস্কির দাসত্ব-বিরোধী জীবনমুক্তি-কামনা এবং দরিদ্রদের সততা ও নিষ্ঠার প্রচার, এঁদের সমাজ জীবনের সঠিক বিশ্লেষণ-দক্ষতা ও সাহিত্যের বর্ণনায় বাস্তবানুগত্য প্রমাণ করে। টলস্টয় এঁদেরই মত ধনতন্ত্রের কঠোর সমালোচক। কিন্তু তিনি আরও কিছুটা অগ্রসর হয়ে ব্যক্তিগত মালিকানার সমালোচনা করলেন, শিল্প-সাহিত্যকে চাইলেন মানুষে-মানুষে যোগাযোগ সৃষ্টি করার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে। শুধুমাত্র বিলাসীদের ভোগ্যবস্তুতে পরিণত না করে সাহিত্যকে পৌঁছে দিতে হবে বৃহৎসংখ্যক অজ্ঞ-মানুষের মধ্যে, এই ছিল টলস্টয়ের বলিষ্ঠ ঘোষণা। সুতরাং টলস্টয় আর সকলের চেয়ে বেশী শ্রেণী-সচেতন এবং অবজ্ঞাত-শ্রেণীর বঞ্চনা ও অধিকার সম্পর্কে সতর্ক। এই কারণেই তাঁর মতাদর্শে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী না হলেও লেনিন শ্রদ্ধা করতেন টলস্টয়কে।

ফরাসী ও রুশ সাহিত্যে বাস্তববাদীরা যেভাবে ধনতন্ত্রের সমালোচনা করেছেন, সেই পদ্ধতিতেই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অর্থের লালসা ও নানাবিধ সামাজিক উৎপীড়নের নগ্ন চেহারা উদ্‌ঘাটিত করেছেন, 'ডেভিড কপার ফিল্ড,' 'ব্লিক হাউস' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা চার্লস ডিকেন্স। যদিও ঐতিহাসিক[১১] বলেছেন 'ডিকেন্স বাস্তববাদী ঔপন্যাসিক ছিলেন না' তবু শ্রেণীচেতনা নিয়ে ধনতন্ত্রীদের নিজেদের দ্বন্দ্বের চেহারা যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি তাতে তাঁর দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা ও কল্পনার বস্তুচারিতা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। কিন্তু ডিকেন্স এবং শার্লোট ব্রন্টি উভয়েরই বিশ্বাস ছিল মানুষের 'মানবত্বে'। তাই দেখি ব্রন্টি একদিকে কায়েমি স্বার্থবাদীদের জনগণের উপর থেকে গুরু করভার লাঘব করতে বলেছেন, দয়ালু হতে বলেছেন, অন্যদিকে শ্রমিকশ্রেণীকে সংঘবদ্ধ সংগ্রামে অবতীর্ণ না-হতে আহ্বান জানিয়েছেন (যেমন A Manchester strike-এ)।

এখন ঊনবিংশ শতকের ফরাসী, রাশিয়া ও ইংরেজী সাহিত্যের বাস্তববাদীদের যে স্বভাবধর্ম তাঁদের সৃষ্টিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তা হচ্ছে :

(ক) বিশ্লেষণ-প্রবণতাই এঁদের রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। (খ) ব্যক্তির সঙ্গে তার পরিবেশের দ্বন্দ্ব এঁদের সকলের রচনারই উপজীব্য বিষয়। (গ) শ্রম ও পুঁজির দ্বন্দ্বের নিখুঁত ছবি এঁকেছেন এরা। (ঘ) ধনতন্ত্রের চাপে ব্যক্তিহৃদয়ের যন্ত্রণার ভাষাকার এই বাস্তববাদীরা। (ঙ) বর্ণনায় যথাযথতা বজায় রাখতে চেয়েছেন সকলে।

এই বাস্তববাদীদের অন্যতম মার্কিণ ঔপন্যাসিক হাওয়েল্‌স্‌ সাহিত্য সম্পর্কে বলেছেন: (ক) যে-সাহিত্য বাস্তবজীবন-ভিত্তিক নয়, তা সাহিত্য নামের যোগ্যই নয়, যদিও উপন্যাস 'ফটোগ্রাফ' নয় (বেলিনস্কি এবং ডোব্রোলিউবফও এই কথাই বলেছিলেন)। (খ) কলাকৈবল্যবাদীরা মিথ্যা ঈশ্বরে নয়, মৃত ঈশ্বরে বিশ্বাসী। (গ) প্রতিভায় বিশ্বাস হচ্ছে অন্ধ কু-সংস্কার। পরিশ্রমের দ্বারাই শিল্পীরা দক্ষতা অর্জন করেন।

মোটামুটি তত্ত্বগতভাবে বাস্তববাদীরা এই সত্য মানতেন যে, সাহিত্যের বিষয়-বস্তু হবে বাস্তবজীবন কেন্দ্রিক, সমস্যা হবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণের সঙ্গে সম্পর্কিত, চরিত্র হবে সজীব প্রাণবান, লেখক হবেন জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞ এবং তাঁর বর্ণনায় থাকবে যথাযথতা। কিন্তু খেয়াল করলে দেখা যায়, এই বাস্তববাদীরা জীবনের দ্বন্দ্ব ও সংকটের ছবি তুলে ধরেছেন, পথের কোন নির্দেশ দেন নি। এমন কি যে-সমাধানের ব্যবস্থা করেছেন তাতে সামাজিক কাঠামোর কোনরকম পরিবর্তনের আভাস দেন নি। বালজাক তো স্পষ্টই এই পরিবর্তন উপরের কোন শক্তির দ্বারা সাধিত হবে, এমন ধারণা পোষণ করতেন। ব্রন্টি এবং ডিকেন্স পরিবর্তন চেয়েছেন, তবে সেইজন্যে ধনীর দয়ালু প্রবৃত্তির জাগরণ কামনা করেছেন। অর্থাৎ এঁরা কেউই সমাজের স্থিতাবস্থায় পরিবর্তন কামনা করেন নি। এই জাতীয় বাস্তববাদীদের মাক্সিম গোর্কি 'Critical realists' নামে চিহ্নিত করেছেন। এঁরা জীবনের বাস্তবতার চিত্রকর, কিন্তু সমাজের পরিবর্তনে গ্রহণীয় কোন পথের সংকেত দেন নি। বাঙলা সাহিত্যে এই বাস্তবতার রূপ ফুটিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্করের মত মহান শিল্পীরা। রবীন্দ্রনাথ মুখ্যতঃ রোমান্টিক। কিন্তু রোমান্টিক রবীন্দ্রনাথ জীবনের গোড়ার দিকে সাহিত্যে কোন রকম বাস্তবতার অনুপ্রবেশকে সহ্য করতে না পারলেও পরবর্তীকালে শুধু আপত্তি তুলেছিলেন বাস্তবের নামে জঘন্যতার আমদানির বিরুদ্ধে। তাই জীবনের শেষ দিকে তরুণদের অনেকের, সকলের নয়, সাহসিকতার

প্রশংসা করেছেন। নিজে 'রক্তকরবী' ও 'রথের রশি'তে বাস্তবজীবন-সমস্যার রূপ দিয়েছেন, 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে সন্দীপের মত এবং 'যোগাযোগে' মধুসূদনের মত বাস্তব চরিত্র তুলে ধরেছেন। ধনতন্ত্রী মধুসূদনের চিত্তের দীনতা সমগ্রভাবে ধনতন্ত্রের আত্মিক দৈন্যই সূচিত করে। আর ধনতন্ত্রের 'inner contradiction' যে ভাঙনের কোন্ পথ ধরে রক্তকরবীর 'রাজা'র পরিণতিতে আছে তারই পরিচয় ('ঠকিয়েছে আমাকে। আমাকে ঠকিয়েছে এরা। সর্বনাশ! আমার নিজের যন্ত্র আমাকে মানছে না!' 'ঠকিয়েছে আমাকে। আমারি শক্তি দিয়ে আমাকে বেঁধেছে')। কিন্তু, যেহেতু রবীন্দ্রনাথ, টলস্টয় এবং ভিক্টোরীয় যুগের ডিকেন্স ও ব্রন্টির মত মানুষের অনন্ত সম্ভাবনায় বিশ্বাস করতেন তাই 'রক্তকরবী'তে যক্ষপুরীর বঞ্চিত মানুষগুলিকে একটি বিরুদ্ধশক্তি হিসেবে না দেখিয়ে 'রাজার'ই ভিতর থেকে জাত ভূমিকম্পে তাঁর আত্মার জাগরণ দেখিয়েছেন। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতেও আছে আমাদের সামন্ততান্ত্রিক গ্রামীণ সমাজের দীর্ঘকালীন অন্ধ বিশ্বাস, কু-সংস্কার এবং বঞ্চনা ও শোষণের বেদনাদায়ক আলেখ্য। কিন্তু শরৎচন্দ্রও সত্যের প্রতিলিপি-রচয়িতা মাত্র, সমাজ-মুক্তির পথ-প্রদর্শক ন'ন। আর তারাশঙ্কর দেখেছেন প্রাচীন সামন্ততন্ত্রের তিরোধান, কল-কারখানা-ভিত্তিক ধনতন্ত্রের প্রসার। তিনি ধনতন্ত্রের সমালোচক, কিন্তু দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন ইতিহাসের স্বাভাবিক নিয়মে হারিয়ে যাওয়া সামন্ততন্ত্রের জন্য। তারাশঙ্কর গ্রাম-বাঙলার বিশেষ করে রাঢ় বাঙলার বিভিন্ন জাতির মানুষের দুঃখ-দৈন্যে ভরা জীবনের হুবহু বর্ণনা দিয়েছেন। নবীন জীবনের আকর্ষণে প্রাচীন ব্যবস্থার ভাঙনের ছবি এঁকেছেন, কিন্তু সহানুভূতি দরিদ্রদের প্রতি থাকলেও আগ্রহ তাঁর হারিয়ে যাওয়া অতীতের জন্য। এ একধরণের পশ্চাদ্মুখীনতা। Critical realistরা অনেকেই এই পশ্চাদ্মুখীনতার ত্রুটিতে ভুগেছেন, শুধু তারাশঙ্কর একা নন। বালজাকও অভিজাততন্ত্রের রুচির সমর্থক ছিলেন, যদিও জানতেন সেইদিন আর ফিরবে না। Critical realistরা জীবন-সমস্যার সমাধানের যে ইঙ্গিত দিয়েছেন তার মধ্যেও কিছু পশ্চাদ্পরতা বর্তমান। সমাজের সমস্যার কারণ যদি হয় ধনতন্ত্রের বিকাশ, তাহ'লে ধনতন্ত্রের ত্রুটি-বিচ্যুতির পথেই তার সর্বনাশ ঘটবে এই হচ্ছে সাধারণ সত্য। ধনতান্ত্রিকেরা তাঁদের পুঁজির বিকাশে সবচেয়ে সহায়তা পেয়েছে বিজ্ঞানের কাছ থেকে, যন্ত্রের কাছ থেকে। কিন্তু কলে-কারখানায় শ্রমরত মানুষগুলি শুধু যন্ত্রের দাসেই

পরিণত হয় নি, নিজেদের ব্যক্তিত্বও বিস্মৃত হয়ে যন্ত্রমানুষ 'রোবোট্'-এ পরিণত হচ্ছে যেন। মানুষে মানুষে তৈরি হয়েছে একধরণের বিচ্ছিন্নতা বা alienation। এই alienation ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনিবার্য অভিশাপ। সুতরাং এই অবস্থার পরিবর্তন যদি ঘটে কোনদিন, তবে যন্ত্রদাসে পরিণত শ্রমিকদের তরফ থেকেই সেই পরিবর্তনের ঢেউ আসবে, যেহেতু পুঁজিপতির স্বার্থে তাদের সকলের মানবিক রুচি, চাহিদা ও স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়েছে তারা। কিন্তু Critical realistরা শ্রমিক বা কৃষকের দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করলেও এদের শক্তির বিস্ফোরণে বিশ্বাসী ছিলেন না। যক্ষপুরীর বিশু, ফাগুলাল বা নামহীন সংখ্যার দল 'রক্তকরবী' নাটকে রাজার প্রতিদ্বন্দী শক্তি নয়, এরা যন্ত্রণাকাতর বোবা প্রাণী, সোমরসে ও ভক্তিরসে নিমজ্জিত। শরৎচন্দ্রের 'গফুর' অত্যাচারিত কৃষক, বিচারের আশায় যার দীন আবেদন ঈশ্বরের উদ্দেশে উচ্চারিত। আর তারাশঙ্করের 'কালিন্দী'র চিনি কলের মালিকের বিকৃত যৌন-কামনা শ্রমিক পল্লীর দিকে প্রসারিত, অহীনের মত বিপ্লবীরা যার প্রতিকারে উদ্যত হয়েও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতা বহন করে ফিরে আসে। বালজাকের মত আমাদের দেশের বাস্তব-সমস্যার রূপকারেরাও কৃষক-শ্রমিকের জন্য বেদনা বোধ করেন, কিন্তু বিশ্বাস করেন শোষণের প্রতিকার হবে শোষকের হৃদয়-জাগরণে (যেমন জাগরণ হয়েছিল 'রক্তকরবী'র রাজার ক্ষেত্রে) অথবা আয়ত্তাতীত কোন শক্তির হাতে। সাধারণ-ভাবেই সমস্ত 'Critical realist' দেরই এই ধরণের সমাধান চিন্তার কারণ হচ্ছে : 'Out of the Romantic revolt of the lonely 'I', out of a curious mixture of the aristocratic and plebeian denials of bourgeois values, came critical realism.'[১২] কিন্তু ধনতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে একক ব্যক্তির প্রতিবাদ হিসেবে নয়, সংগঠিত শ্রমিক ও কৃষকের প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনার সুনিশ্চিত প্রতিশ্রুতি নিয়ে বিশ শতক থেকে জন্ম হল নতুন ধরণের বাস্তববাদী সাহিত্য, যে-বাস্তববাদ গোর্কির ভাষায় 'Socialist realism.' কিন্তু সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদীদের আবির্ভাবের পূর্বে উনিশ শতকীয় বাস্তববাদের চূড়ান্ত মূর্তি ফুটে উঠল শিল্প-সাহিত্যের জগতের নতুন আন্দোলন 'ন্যাচারালিজ্‌ম্' বা যথাস্থিতবাদের মধ্যে।

খ ॥ 'ন্যাচারালিজ্‌ম্‌'
বা
'যথাস্থিতবাদ'

বাস্তববাদের পূর্ণবিকাশ-মুহূর্তে 'যথাস্থিতবাদ' পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের জগতে একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন হিসেবে দানা বেঁধে উঠল। চারুশিল্প থেকে সংগৃহীত এই নতুন মতবাদ সাহিত্যে ব্যবহার করলেন এমিল জোলা তাঁর 'The're'se Raquin' এর দ্বিতীয় সংস্করণের (১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ) মুখবন্ধে। ন্যাচারালিজ্‌মের সঙ্গে তা-ই জোলা-র নাম অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে যুক্ত হয়ে রয়েছে। কিন্তু জোলা-র আগেই রাশিয়ায় কান্টেমির (Cantemir), ক্রাইলোব (Krylov) ও গল্পকার গোগাল এবং নাট্যকার অস্ট্রোভস্কি এই ন্যাচারালিজ্‌ম্‌-এর চর্চা করেছিলেন। নিবিড় বাস্তবানুগত্য এবং প্রকৃতি ও মানবজীবনের বিভিন্ন তুচ্ছ দিকগুলির যথাযথ রূপ রচনার জন্যই এঁদের 'ন্যাচারালিস্ট' বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। রুশ-সাহিত্যের পূর্ব ধারা থেকে বিচ্যুত এই শিল্পীরা সাহিত্যকে নিয়ে এসেছিলেন সাধারণ মানবজীবনের অতি কাছাকাছি। গোগোল প্রসঙ্গে বেলিনস্কি বলেছেন 'he reads only the book of nature, studies only the world of realities.'[১] এই গোগোল-এর হাতেই শিল্পের প্রাচীন সংজ্ঞার্থ পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়াল—শিল্প হচ্ছে বাস্তবের বিশ্বস্ত প্রতিরূপ। গোগোল তাঁর উত্তরসূরীদের উপর দীর্ঘকাল ধরে সুগভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। রুশ-সাহিত্যে তিনি ছিলেন দৈনন্দিন বাস্তবের নিখুঁত বিবৃতি-কারদের গুরুস্থানীয় ব্যক্তি। যে-অর্থে জোলা এবং তাঁর অনুসারীদের 'ন্যাচারালিস্ট' নামে চিহ্নিত করা হয় গোগোল সে অর্থে 'ন্যাচারালিস্ট' ন'ন। জোলা যে-ন্যাচারালিজ্‌মের কথা বলেছেন, সেই ন্যাচারালিজ্‌মের আদর্শ তিনি সংগ্রহ করেছিলেন একদল চিত্রকরদের কাছ থেকে, যাঁদের অন্যতম ছিলেন জোলারই স্কুলজীবনের সহপাঠী 'সেজানে' (Ce'zanne)। সেজানে এবং তাঁর সহগামীরা চিত্রশিল্পের জগতে 'ইম্প্রেশনিজ্‌ম্‌' নামে যে নতুন আদর্শের গোড়াপত্তন করলেন তার মূল বক্তব্য, সেজানের ভাষায়, 'The artist is merely a recording apparatus for sensory perceptions..... No theories। works ... theories corrupt men'।[২]

শিল্পসম্পর্কে প্রাচীন আদর্শের সমাপ্তি ঘোষণা করে সেজানে এবং তাঁর সহকর্মীরা যে নতুন ধরণের চিত্রাঙ্কন করলেন জোলা তার তাৎপর্য সম্পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম না হলেও কিছু আড়ম্বরপূর্ণ সমালোচনামূলক প্রবন্ধ রচনা করলেন এঁদের সপক্ষে। সেই সমস্ত প্রবন্ধে তিনি 'ইম্প্রেশনিস্ট', 'রিয়ালিস্ট', 'এ্যাকচুয়ালিস্ট' এবং 'ন্যাচারালিস্ট' শব্দগুলি অভিন্নার্থে ব্যবহার করলেন। জোলা নিজে, দেখা যাচ্ছে, গোড়ার দিকে 'রিয়ালিজ্‌ম্' ও 'ন্যাচারালিজ্‌ম্-এর মধ্যে কোন পার্থক্য স্বীকার করেন নি। আবার আমরা দেখেছি তাঁর 'Le Roman naturaliste' প্রবন্ধ গ্রন্থে সমালোচক ব্রুনেতিয়েরর তিরিশের পৃষ্ঠায় ফ্লোব্যার-এর 'মাদাম বোভারি'কে বলেছেন 'Realistic novel' আবার তিনশ' দুই পৃষ্ঠায় সেই একই উপন্যাসকে ন্যাচারালিজ্‌মের অগ্রদূত বলে চিহ্নিত করেছেন। সুতরাং 'রিয়ালিজ্‌ম্' ও 'ন্যাচারালিজ্‌মে'র মধ্যে পার্থক্য গোড়ার দিকে স্বচ্ছ ছিল না। আসলে 'ন্যাচারালিস্ট' ও 'রিয়ালিস্ট' উভয়েরই মূল বিশ্বাস, শিল্প প্রধানতঃ অনুকৃতিমূলক এবং প্রাত্যক্ষিক সত্যের রূপায়ণ। সেইজন্যে এঁদের ভিতর পার্থক্য অনেক ক্ষেত্রে স্পষ্ট নয়। জোলার ঘনিষ্ঠ বন্ধু Paul Alexis 'ন্যাচারালিজ্‌ম্' কথাটিকে একটু বিশদ করে বোঝাবার চেষ্টা করে বললেন, ন্যাচারালিজ্‌ম্ একটি বিশেষ রচনারীতি নয়, ন্যাচারালিজ্‌ম্ হচ্ছে জীবন সম্পর্কে পৃথক এক ধরণের 'way of thinking, of seeing, of reflecting, of studying, of making experiments, a need to analyse in order to know.' জীবনকে যে বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে 'ন্যাচারালিস্ট'রা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলেন তা বুদ্ধি ও বিজ্ঞান-নির্ভর, ফলে বিশ্লেষণধর্মী এবং বলা যায় 'এ্যান্টি-রোমান্টিক'। জীবন সম্পর্কে 'ন্যাচারালিস্ট'দের এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে জড়িয়ে আছে উনিশ শতকের অর্থনীতিতে ধনতন্ত্রের বিকাশ, ডারউনের বিবর্তনবাদ, কোঁতপ্রমুখের ধ্রুববাদ, এককথায় বস্তুবাদী দর্শন ও অর্থনীতি।

বস্তুবাদী দর্শন থেকে 'ন্যাচারালিস্ট'রা গ্রহণ করলেন এক ধরণের নিরপেক্ষ বিচার-প্রবণতা। রোমান্টিকদের মত ব্যক্তিত্বকে বিজড়িত করে নয়, দূর থেকে একজন বীক্ষণাগারের গবেষকের নিষ্কাম অথচ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে জীবনকে দেখতে ও বিচার করতে হবে, এই হ'ল এঁদের বক্তব্য। জোলার পূর্বে 'মাদাম বোভারি'র রচয়িতা ফ্লোব্যার বলেছিলেন—শিল্পী হবেন ঈশ্বরের মতই সর্বগ, সর্বজ্ঞ এবং অদৃষ্ট। নিজের মত প্রকাশে সাহিত্যিকের কোন স্বাধীনতা নেই। ঈশ্বর কি

কখনও কোথাও অভিমত প্রকাশ করেন? আবার জর্জ সাণ্ডের কাছে লেখা একটি চিঠিতে জানালেন—ঘৃণা নয়, প্রেম নয়, করুণা নয়, বৈজ্ঞানিকের নিরপেক্ষতাই শিল্পীর কাছ থেকে কাম্য ; 'I believe that great art is scientific and impersonal'. গোঁকুর ভ্রাতৃদ্বয় তাঁদের জুর্নাল-এ ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বলেছিলেন, ইতিহাস যেমন কোন ঘটনার প্রাপ্ত দলিল থেকে লেখা হয়, তেমনি একালের উপন্যাসও লেখা হয় ঘটমান বস্তু অবলম্বনে অথবা 'প্রকৃতি'কে অনুকরণ করে। জুর্নালের ঘোষণা মনে রেখে তাঁরা নিজেরাই সেই পদ্ধতিতে উপন্যাস রচনা শুরু করে দিয়েছিলেন। কিন্তু 'সায়েন্টিফিক ন্যাচারালিজ্ম্'এর প্রথম প্রবক্তা হিসেবে আবির্ভূত হলেন এমিল জোলা।

কোঁত, ডারউইন এবং টেইন জোলার অন্তর এমনভাবে আচ্ছন্ন করেছিলেন যে, তিনি নিজেকে একজন ধ্রুববাদী, বিবর্তনবাদী ও যথার্থ বস্তুবাদী বলে গণ্য করতে লাগলেন। তাঁর 'পরীক্ষামূলক উপন্যাসে' তিনি দাবী করলেন, লেখক হবেন একজন বীক্ষণাগারের বৈজ্ঞানিক এবং বংশগতি ও সামাজিক পরিবেশের পটভূমিতে মানুষকে দেখাবেন তিনি। এই চোখ নিয়ে তিনি গোঁকুরদের 'Germinie Lacerteux' নাটকের বিচার করে বলেছিলেন, মনস্তত্ত্ব ও শারীরবৃত্তের মূল সমস্যা সম্বলিত এই নাটকের কাহিনীর সত্যতা স্মরণীয় বলেই নাটকখানি অসাধারণ। চোখে দেখা পরীক্ষিত সত্যে এই আস্থা এবং তাকেই সাহিত্য হিসেবে দাঁড় করানোর প্রবণতা ধ্রুবধাদী দর্শনেরই প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফল। ধ্রুববাদ ছাড়া জোলা ঐতিহাসিক টেইনের 'রেস', 'মিলিউ' এবং 'মোমেন্ট' এই ত্রি-সূত্রের সাহায্যে মানুষকে বিচার করতে অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু যেহেতু টেইন সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত অভিরুচি ও বুদ্ধির স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেন নি, তাই জোলা ক্ষোভ প্রকাশ করলেন টেইনের অভিমতের সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে। লেখকের ব্যক্তিত্ব-আলোকিত রচনার প্রতি জোলা বরাবরই আগ্রহ প্রকাশ করে এসেছেন। তাঁর মতে, রচনার মৌলিকতা রয়েছে বাস্তব জগৎ সম্পর্কে শিল্পীর ব্যক্তিগত বোধের যথাযথ প্রকাশে। লেখকের মেজাজ বা রুচির উপর জোলা যে পরিমাণ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন, তাতে মনে হয় ন্যাচারালিস্ট লেখকের কাছ থেকে কাম্য নিরপেক্ষতার আবশ্যিকতা একসময় তিনি নিজেই বিস্মৃত হয়েছিলেন। কোঁত এবং টেইন ছাড়া চিকিৎসা-বিজ্ঞানী ক্লদ বার্নাদও একসময় জোলাকে অভিভূত করেছিলেন ব'লে জোলা চিকিৎসক এবং ঔপন্যাসিকের

পদ্ধতি হওয়া উচিত একই রকম, এই বিশ্বাস ঘোষণা করেছিলেন। শুধু রচনা-রীতির দিক থেকে যে জোলা 'রিয়ালিস্ট'দের থেকে পৃথক দিগন্তের ব্যক্তি ছিলেন তাই নয়, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত এবং বিভিন্ন স্তরের মানুষের পরিবেশ-নিয়ন্ত্রিত জীবনের নিখুঁত ঘটনা বিবৃতির দিকে ঝুঁকেছিলেন তিনি। কিন্তু জোলা যেহেতু মার্ক্স বা এঙ্গেলস-এর সমাজবিজ্ঞার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না, তাই মানুষকে ফুটিয়ে তুলতে লাগলেন বংশানুক্রম ও পরিবেশ-নিয়ন্ত্রিত, অসহায় ও নিষ্ক্রিয় জীবের মূর্তিতে। অথচ ধনতন্ত্রের কুফল সম্পর্কে যিনি সচেতন, মানুষের অসহায়ত্ব যিনি মর্ম দিয়ে উপলব্ধি করেছেন, প্যারীর শ্রমজীবীর জীবনকে নিজের সৃষ্টির বিষয়ীভূত করেছেন, এক সময় তাঁকে মানতেই হয়েছে, ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় 'all hope lies in the forces of to-morrow, which are with the people....' কিন্তু 'people'-এর ক্ষমতায় বিশ্বাসী হলেও যে-ন্যাচারালিজ্‌মের জনক তিনি, সেই 'ন্যাচারালিজ্‌ম্' উনিশ শতকীয় নৈরাশ্যপীড়িত সমাজজীবনের ফসল।

মানুষের মর্যাদা, পূর্ণতা ও প্রগতির প্রতি অনাস্থা থেকে এই 'যথাস্থিতবাদ' বা ন্যাচারালিজ্‌মের জন্ম। রুশো-র আগ্নেয়-ঘোষণা, ফ্রাঙ্কলিনের বুদ্ধিনির্ভর বিশ্বাস ও স্বাধীন নাগরিকের আবির্ভাব সম্পর্কে জেফারসনীয় আশা এ সব কিছুর বিরুদ্ধে ন্যাচারালিজ্‌মের বিদ্রোহ। ন্যাচারালিস্টের ধারণা—সমাজ যুক্তি ও বুদ্ধিশাসিত নয়, নীতি ও আদর্শ সবই মিথ্যা, ঈশ্বর মৃত, ইন্দ্রিয়ের অগোচর কিছুই নেই, মানুষ হচ্ছে প্রপঞ্চেরই এক বিশেষ রূপ। যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে জগৎ ও জীবনকে দেখেছেন তাঁরা, সেই বিজ্ঞানেরই সর্বময় প্রভুত্বের জন্য নৈরাশ্যের সঙ্গে সব কিছুর বিচার করেছেন। সমারসেট মমের 'Of Human Bondage'-এর ফিলিপ কেরীর মুখে যেন ন্যাচারালিস্টেরই জীবন-দর্শন শুনতে পেলাম—'জীবনের কোন মানে নেই। বেঁচে থেকেও মানুষ কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধি করতে পারবে না। সে জন্মাক বা নাই জন্মাক, জীবিত থাক বা নাই থাক কিছুই এসে যায় না। মানবজীবন বৈশিষ্ট্যহীন এবং মৃত্যুর পরেও কিছু থাকে না'। জীবন সম্পর্কে নৈরাশ্যের আর এক দিক অনিচ্ছাসত্ত্বেও জীবন-স্বীকৃতি। আর্নল্ড বেনেটের উপন্যাসে ('Anna of the Five Towns') আছে তারই প্রকাশ। জীবন সম্পর্কে ন্যাচারালিস্টরা প্রধানতঃ নিরাশ হলেও মাঝে মাঝে প্রকারান্তরে জীবনের সংস্কার কামনাও করেছেন। থিওডোর ড্রেইসার এর 'An

American Tragedy'-র ক্লাইড গ্রিফিথ্‌স্ সেই চরিত্র যার মধ্য দিয়ে পরিবেশ সংস্কারের সম্ভাবনা-লেখক প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কিন্তু যেহেতু তিনি ন্যাচারালিস্ট অতএব স্পষ্টভাষায় কিছুই বলেন নি। না বললেও লেখকের অনুক্ত সতর্কবাণী তাঁর অকথিত আদর্শকেই সংকেতিত করে, ঘোষণা করে জগৎ-সম্পর্কে তাঁর ঘৃণা। যে নিষ্ঠুরতা জীবনে ও সমাজে সত্য সেই নিষ্ঠুরতার জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ঘৃণা করতে পারেন লেখক, যেমন করেছেন মোপাসাঁ, কিন্তু ভোগ-সুখের কামনা, অপরের উপর প্রভুত্ব বিস্তারের কামনা সমালোচ্য হলেও মানুষ সম্পর্কে কোন আশার কথা না শোনালে লেখক একদেশদর্শী হতে বাধ্য। অর্থ-নৈতিক শোষণ, ব্যবসায়ীদের 'যোগ্যতমের উদ্বর্তনের (Survival of the fittest) তত্ত্বে বিশ্বাস, ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার ক্রমপ্রসার, উৎকট যান্ত্রিকতা ও ধনতন্ত্রের অবাধ বিকাশ, উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে ফ্রান্স ও আমেরিকার ব্যক্তিজীবনে যে সংকট সৃষ্টি করে তুলেছিল 'ন্যাচারালিজম' ছিল তার অন্যতম প্রকাশ মাধ্যম। ফ্লোব্যার, গোঁকুর ভ্রাতৃদ্বয়, জোলা, মোপাসাঁ, জর্জ মুর, থিওডোর ড্রেইসার, স্টেইনব্যাক, নোরিস এই মতবাদেরই প্রধান শিল্পীগোষ্ঠী। কিন্তু এঁরা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার কুফল নানাভাবে বিচার করলেও যেহেতু তাঁদের নায়ক-নায়িকারা এই সমাজে বহিরাগত ব্যক্তি নয়, পরিবেশ-প্রভাবিত, অতএব সমাজে প্রচলিত প্রথার দুয়ারে আত্মনিবেদন না করে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারে এ-সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া চলে না। সেই সত্য প্রকাশের দায়িত্ব ন্যাচারালিস্টরা গ্রহণ করলেন না। করেছেন 'সোশ্যালিস্ট রিয়ালিস্ট'রা। তাছাড়া বিজ্ঞানের মধ্যে একই সঙ্গে যখন ডঃ জেকিল ও মিঃ হাইড বসবাস করছেন তখন বিজ্ঞান শুধু নঞর্থক বোধেরই জন্ম দিতে পারে না। বিজ্ঞানের যে কুফল সমাজ ভোগ করছে তার জন্য দায়িত্ব বিজ্ঞানের নয়, বিজ্ঞানকে যারা সেবা-দাসে পরিণত করতে গিয়ে মানুষকে ক্রমে যন্ত্রের দাসে পরিণত করেছে দায়িত্ব সেই ধনতন্ত্রীদের।

পাশ্চাত্ত্য মহাদেশগুলি যেখানে ধনতন্ত্রের সুফল ও কুফল, সুখ ও যন্ত্রনা, সঞ্চয়ের উল্লাস ও বঞ্চনার জ্বালা একই সঙ্গে ভোগ করছে সেখানে আমরা বাঙালীরা ভোগ করেছি সমস্ত রকমের পরোক্ষ ফল। পাশ্চাত্ত্যে লোভের পরিণাম দু'দুটি বিশ্বযুদ্ধ আর আমাদের প্রাপ্তি ঘটেছে বিদেশী-শক্তির শোষণ, ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ, পুরাতন মূল্যবোধের বিপর্যয়, শুধু দুটি অন্নের আশায় দরিদ্র নারী-পুরুষের চূড়ান্ত

অবমাননা। ধনতন্ত্রের পরোক্ষ ফলভোগী বিজাতীয় শক্তি-শাসিত বাঙালী জীবনের এই পরম প্রাপ্তির ছবি ফুটিয়ে তুললেন আরও অনেকের সঙ্গে শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সোমনাথ লাহিড়ী প্রমুখ। শৈলজার 'কয়লা কুঠি'র গল্পগুলি খনির শ্রমিক-জীবনের প্রেম, বঞ্চনা, মালিকের ইন্দ্রিয়লালসা ও আত্মিক যন্ত্রণাহীনতার চমৎকার দলিল। শৈলজার কয়লা-খনির জীবন নিয়ে লেখা গল্পগুলিতে জোলা-র 'Germinal' বা 'L' Assommoir-এর বিস্তার ও বিশ্লেষণ-দক্ষতা না থাকলেও এই শ্রেণীর মানুষের জীবনের বিশেষ দিকগুলি তাঁর দৃষ্টিপ্রদীপে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। লেখকের ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণনার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করেছে। প্রেমেন্দ্রের 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' অপগত-যৌবনা পতিতা জীবনের দুঃসহ এক বাস্তব চিত্র। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'টোপ', 'হাড়', পয়সাওয়ালা মানুষের খেয়াল, বিলাস ও ভোগকামনার কাছে বিত্তহীন, ক্ষুৎপীড়িত মানুষের নিরর্থক হাহাকারের নির্মম আলেখ্য। বিভূতিভূষণের 'অশনি সংকেত' পঞ্চাশের মন্বন্তরের পটে লেখা দুর্ভিক্ষ-কাতর জীবনের নিখুঁত চিত্র। সোমনাথ লাহিড়ীর '১৯৪৩', 'উনিশ-শো চুয়াল্লিশ' এই মন্বন্তরেরই পটে লেখা গল্প। এই লেখকেরা সকলেই যে সমান নিরাসক্ত দৃষ্টি ব্যবহার করেছেন তা নয়। প্রেমেন্দ্রের 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' এবং সোমনাথের '১৯৪৩' এমন দুটি গল্প যেখানে লেখকেরা উদাসীন ভগবান না হলে অত নির্মম বর্ণনা দেওয়া সম্ভব হত না। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও বিভূতিভূষণ মূলতঃ রোমান্টিক মনের অধিকারী, যদিও জীবনকে কখনও কখনও (উল্লিখিত গল্প-উপন্যাসে) ন্যাচারালিস্টের দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ্য করছেন। পাশ্চাত্য ন্যাচারালিস্টরাও কেউই তো নির্দিষ্ট ফর্মুলা মানেন নি। তবে তথ্যানুসন্ধিৎসা, উত্তেজক ও বিদ্রূপমূলক কাহিনী রচনার দিকে সকলেরই আগ্রহ ছিল। কিন্তু উভয়েই ন্যাচারালিস্ট হলেও জোলা-র পাশে হেমিংওয়েকে রোমান্টিক মনে হওয়া বিচিত্র নয়। আমাদের নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'উপনিবেশ' উপন্যাসখানিও পরিবেশ-নিয়ন্ত্রিত আদিম লালসাতুর জীবনের 'ন্যাচারালিস্টিক' উপন্যাস বলে মনে হয়, অথচ তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসে তিনি অ-পূর্ব এক রোমান্টিক শিল্পীমনের অধিকারী। স্বীকৃত ন্যাচারালিস্টরাও তুচ্ছ ও অবজ্ঞাত জীবনের মধ্যে নেমে এসে অনেকক্ষেত্রে শিল্প-সাহিত্যের জগতে বিপ্লব ঘটিয়ে দিলেও কেউই বোধ হয় সমস্ত জীবন 'ন্যাচারালিস্ট' থাকতে পারেন নি। স্বয়ং

জোলাই ছিলেন তাঁর নিজের তত্ত্বের প্রতিবাদ। বোধ হয় এই কারণেই সমালোচক বলেছেন,—'The purely naturalistic work has never been written and if written, probably could never be read'[৩]।

উগ্র বস্তুপ্রিয়তা, সরল বর্ণনপদ্ধতি, নৈরাশ্য, মানুষের মনুষ্যত্বের অন্তরালস্থ জান্তব ধর্মের উন্মোচন একখানি রচনার মধ্যে এতগুলি বৈশিষ্ট্য নিশ্চয়ই খুঁজে পাওয়া যায় না এবং গেলেও সে রচনার পাঠ্যগুণ থাকে না। তা ছাড়া যদি লেখকেরা প্রতিমুহূর্তে পাঠকদের সচেতন করে দেন যে, মানুষের প্রতিটি ভোগ ও কর্ম পূর্বনির্দিষ্ট, ইচ্ছার স্বাধীনতা বলে কিছু নেই, তা'হলে ইবসেনের অসওয়াল্ডের মত অসহায় ও নিরপেক্ষভাবে পূর্বপুরুষের কৃতকর্মের যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় মাত্র। অসওয়াল্ডের পরিণতি অঙ্কনে ইবসেন বংশগতিকে (Heredity) প্রাধান্য দিয়েছেন ন্যাচারালিস্টিক পদ্ধতিতে। কিন্তু এর ফলে পাত্র-পাত্রীর নৈরাশ্য ও আত্মিক যন্ত্রণা পাঠকের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছে। অতএব প্রশ্ন হতে পারে, বাস্তব জীবন-সমস্যার রূপ দিতে গিয়ে নৈরাশ্যকেই পাঠকের একমাত্র প্রাপ্তি করে তোলা লেখকের উচিত কি না? ন্যাচারালিস্টদের পক্ষে বলা যায়, তাঁরা যে ছবি সত্যমূর্তিতে ফুটিয়ে তুলেছেন তার দ্বারা পরোক্ষে সমাজের হিতসাধন হলেও হতে পারে, কারণ বাস্তবের সঠিক বিবৃতি দিচ্ছেন তাঁরা, নিজেদের ইচ্ছা বাইরে থেকে চাপিয়ে দিচ্ছেন না। কিন্তু 'ন্যাচারালিস্ট'রা যে নিরপেক্ষতার মহিমা দাবী করেছেন তাইকি যথার্থ? শিল্পী যখন কোন প্রাত্যক্ষিক সত্যের অনুকারক নন, প্রথমে 'নির্বাচন' এবং অতঃপর 'রূপায়ণ' তবে শিল্পের জন্ম হয়, সুতরাং কোন শিল্পীই কোন অবস্থায় পুরোপুরি নিরপেক্ষ থাকতে পারেন না। ন্যাচারালিস্টরা বিজ্ঞানের নিরপেক্ষতা সাহিত্যে আমদানি করতে চেয়েছেন, কিন্তু বিজ্ঞানের জগতেও গবেষককে নির্ধারিত লক্ষ্যে উপস্থিত হওয়ার জন্য অনেক প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব সত্য বলে ধরে নিতে হয়, বর্জন করতেও হয় অপ্রাসঙ্গিক তথ্য। অতএব বিজ্ঞানীকেও নির্বাচন ক'রে তবে গবেষণায় অগ্রসর হতে হয়। সুতরাং নিরপেক্ষ সত্য নিয়ে বিজ্ঞান হয় না, সাহিত্যও হয় না। তাছাড়া যিনি 'সায়েন্টিফিক ন্যাচালিজ্‌মে'র প্রবক্তা ছিলেন সেই জোলাও লেখকের 'পার্সোন্যালিটি'র অতিশয় গুরুত্ব স্বীকার করে টেইনকে সমালোচনা করেছিলেন। অবশ্য টমাস সারজেন্ট পেরি নামে জনৈক মার্কিন সমালোচক লিখেছেন—জোলা তাঁর

পাঠকদের একটি বিশৃঙ্খল কক্ষে নিয়ে গিয়েছেন, সেখানে ছাদের নীচে কি ঘটছে দেখাবার জন্যে। লেখকের নিজস্ব (পার্সোন্যালিটি) হারিয়ে গিয়েছে যথাযথতার তাগিদে। 'Papa Hamlet'-এর লেখক হোলৎস ও প্রকৃষ্ট অর্থে 'ন্যাচারালিস্ট' হওয়ার সাধনা করেছিলেন এবং জোলাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু খুব কম লেখকই যথার্থ 'ন্যাচারালিস্ট' ছিলেন। থাকা সম্ভবও ছিল না বোধ হয়। তাই দেখি টেইন ও পল বুরগেট ঝুঁকেছিলেন ধর্মের দিকে, ইবসেন-হাপ্‌ট্‌ম্যান প্রতীকতা ও মিস্টিসিজমের দিকে, আর স্ট্রিণ্ডবার্গ হলেন নয়া রোমান্টিকতার পোষক। কিন্তু 'extremist movement' হিসেবে ন্যাচারালিজ্‌ম্ স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে না পারলেও শ্রমজীবীর জীবন রূপায়ণে ছলনাভরা নীতিজ্ঞানের সমালোচনায়, জীবন ও শিল্পের মধ্যবর্তী অবকাশ দূরীকরণে যে-সাফল্য ন্যাচারালিস্টরা লাভ করেছিলেন, সাহিত্যের জগতে স্মরণীয় হবেন তাঁরা সেইকারণেই। তবে বিশ শতকের চল্লিশের দশকের পরেও আমেরিকায় ন্যাচারালিজ্‌ম্ টিঁকে গিয়েছে মার্ক্সবাদী সাহিত্যের প্রতিবাদ হিসেবে।[৫] আর বর্তমান বাঙলা সাহিত্যে শিথিল যৌনাচারের সাড়ম্বর বর্ণনা দেখা যাচ্ছে যে অপসংস্কৃতির বাহন হিসেবে তার পিছনেও আছে 'Socialist realism' সম্পর্কে একালের প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকদের বৈরাগ্য। আজকের বাঙলা সাহিত্যে প্রধানতঃ পাচ্ছি, হয় বিবেকহীন দেহবন্ধ মানুষের উগ্র বিকৃত যৌনক্ষুধার বর্ণনা, নয়ত নিজ বাসভূমে পরবাসী থাকার ফলে যন্ত্রণাবিদ্ধ চেতনার অধিকারী মানুষের বর্ণনাবিশিষ্ট বিদেশীদের অনুকরণে লেখা 'অ্যাবসার্ড' দর্শনের সাহিত্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় 'ন্যাচারালিজম্' ও 'অ্যাবসার্ড'দর্শনের বিকাশ সভ্যতার 'ডেক্যাডেন্‌স্' সূচিত করে। শুধু সভ্যতার নয়, এই 'ডেক্যাডেন্‌স্' সাহিত্যেরও। বাঙলা সাহিত্যে, আশঙ্কা জাগে, সাহিত্যিকেরা শিথিল যৌনাচারের সনিষ্ঠ বর্ণনার দ্বারা সাহিত্যজগতের 'ডেক্যাডেন্‌স্'ই সূচিত করছেন। অথচ কিছুকাল আগেই তো প্রগতিশীল লেখকেরা, যাঁরা গোর্কি-শোলোকভ পড়েছিলেন, তাঁরা ভেবেছিলেন বাঙলা-সাহিত্যে Socialist realism-এর ধারা নিয়ে আসবেন। কিন্তু যে-সমস্ত কারণে লেখকেরা সঙ্ঘবদ্ধ থাকতে পারেন নি, তার অন্যতম হচ্ছে তাঁদেরই কিছু লোকের 'art for art's sake মতবাদের প্রতি আনুগত্য। বাঙালী লেখকদের এই পরিণতির কারণ শ্রীযুক্ত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'শ্রমিক ও বিপ্লবী জনসাধারণের নূতন সংস্কৃতি গড়ে তোলায় কাজে এগোতে এগোতেও

বজায় রাখতে চেয়েছি বুর্জোয়া জগতের সঙ্গে ভাবগত আত্মীয়তা'। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও কিছু নিষ্ঠাবান লেখক 'শ্রমিক ও বিপ্লবী জনসাধারণের সংস্কৃতি গড়ে তোলার কাজে' কিঞ্চিৎ সাফল্য-লাভের দ্বারা উত্তরকালের লেখকদের আদর্শ হিসেবে অনুসৃত হলেও বাঙলা সাহিত্যের মূলধারা বর্তমানে সেখান থেকে সরে এসেছে নানা কারণে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকেরা যে-পথ অনুসরণ করেছিলেন তা মাক্সিম গোর্কি-কথিত 'Socialist realism'-এর পথ। এই পথের পথিকেরা বর্তমানে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদীদের নিজস্ব পত্র-পত্রিকার ছায়াতলে, কারণ আজকের সাহিত্যের আনন্দের ভোজে এরা গণ্য হন ব্রাত্যরূপে।

গ ॥ সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ

'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা' বা 'সোস্যালিস্ট রিয়ালিজ্‌ম্' কথাটা সাহিত্যের জগতে প্রথম ব্যবহার করেছিলেন মাক্সিম গোর্কি। গোর্কি 'বাস্তবতা' বা রিয়ালিজ্‌ম্-কে ভাগ করেছিলেন দুইভাগে: (ক) Critical realism (খ) Socialist realism। 'Critical realism'-এর দৃষ্টান্ত তিনি সন্ধান করেছিলেন বালজাক-স্তাঁদাল প্রমুখের রচনায়। এই সাহিত্যিকেরা, গোর্কির মতে, যদিও ধনতান্ত্রিক কাঠামোর প্রতি শ্রদ্ধাহীন, তথাপি তাঁদের উদ্দেশ্য সমাজের স্থিতাবস্থা বজায় রাখা। যে-ব্যবস্থার সমালোচক তাঁরা, সেই ব্যবস্থা উৎসাদিত হয়ে নতুন ব্যবস্থা সমাজে প্রবর্তিত হোক, এই কামনা ছিল না তাঁদের। এমন কি সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের কথা যদি তাঁরা বলেনও তবু সে-পরিবর্তন নির্যাতিত জনসাধারণের কাছ থেকে আসাই অনিবার্য, এমন সম্ভাবনার দিকে কোন ইঙ্গিত দেন নি। অর্থাৎ নীতির দিক থেকে তাঁরা বিশেষ সামাজিক অবস্থার সমালোচক মাত্র, এর অধিক কিছু নন। Critical realistরা মানবপ্রেমিক, নিপীড়িতের পক্ষসমর্থক কিন্তু তাঁদের মানবপ্রেমের ভিত্তি যত বাস্তবই হোক, ইতিহাসের প্রগতির সত্যতার ভিত্তির উপর স্থাপিত ছিল না। যদি তাঁরা ইতিহাসের সাধারণ নিয়ম সম্পর্কে সচেতন হতেন তাহলে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যাঁরা সর্বাধিক নিষ্পেষিত ও অসহায় তাঁদের জাগরণের সম্ভাবনা শিল্পীদের

দৃষ্টি অতিক্রম করে যেত না। তাঁরা বাস্তব ঘটনার রূপকার, দুঃখ-দুর্দশা বা অনাচারের আলেখ্যরচয়িতা। এবং এই পর্যন্তই।

গোর্কি, বালজাক প্রমুখ বাস্তববাদীদের এই ধরণের সমাজচেতনার দিকে লক্ষ্য রেখে এঁদের সকলকেই সাধারণভাবে 'Critical realists' নামে চিহ্নিত করেছিলেন। কিন্তু তিনি যে আর এক ধরণের বাস্তবতার কথা উল্লেখ করলেন এবং যে ধারার শিল্পী ছিলেন নিজেও তা-হচ্ছে 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা' বা Socialist realism। নামেই এর যে একটি প্রাথমিক পরিচয় মেলে তা হচ্ছে, সমাজবাদ প্রচারই এই বাস্তবতা-প্রধান সাহিত্যের লক্ষ্য। গোর্কি বলেছেন, সাহিত্যের জগতে এই ধরণের 'বাস্তবতা'র সম্ভাবনা তিনি কল্পনা করতে পেরেছিলেন এঙ্গেলস্-এর একটি মন্তব্য থেকে—জীবন হচ্ছে অবিচ্ছিন্ন এক নিরন্তর গতি ও বিবর্তন। জীবনে কোন স্থির-সত্য নেই, সাহিত্যেও তেমনি অপরিবর্তনীয় স্থির-বাস্তব কিছু নেই। ইতিহাস নিত্য বিবর্তনশীল, মানবজীবন এবং সাহিত্যও তাই। দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের অগ্রগতি। নবীন ও প্রাচীন প্রথার দ্বন্দ্ব এবং দ্বন্দ্বের অবসানে নবীনের প্রতিষ্ঠা; ইতিহাসের স্বাভাবিক নিয়ম যদি এই হয়, তাহ'লে পৃথিবীতে চিরন্তন সত্য বলে কিছু নেই। এমন কিছু নেই যা ধ্রুব, যার কোনই পরিবর্তন সম্ভব নয়। 'বাস্তব'কে এই দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ্য করার জন্যই গোর্কি বললেন, Socialist realism-এর লক্ষ্য হচ্ছে, প্রাচীন পৃথিবীর ('old world') টিকে থাকার ও তার ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তারের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা এবং সেই প্রভাবকে সমূলে উৎপাটিত করা। 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা'র মূল ভূমিকা হবে সাহিত্যের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং বিপ্লবী সম্ভাবনার উন্নতি সাধন'।[১] এই মন্তব্যে স্পষ্টতঃই গোর্কি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ক্ষেত্রে সাহিত্যিককে সুস্পষ্ট ভূমিকা পালন করতে পরামর্শ দিচ্ছেন। সুতরাং সাহিত্যকে শুধুমাত্র শিল্প হিসেবে সফল হলেই চলবে, কলাকৈবল্যবাদীদের এই চরম উক্তি পুরোপুরি খণ্ডন করতে চাইলেন তিনি। শুধু তাই নয়, বাস্তবের নিরপেক্ষ যথাযথ উপস্থাপনই শিল্প-সাহিত্য, এই 'ন্যাচারালিস্টিক' বিশ্বাসও তিরস্কৃত হ'ল তাঁর দ্বারা। অতএব গোর্কি যাকে বলেছেন 'সোস্যালিস্ট রিয়ালিজ্‌ম্' তা যেমন অচল বস্তুর প্রতিচ্ছবি নয়, তেমনি নিছক কলাবিলাসও নয়। গোর্কি-কথিত 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা'য় সর্বাধিক গুরুত্ব লাভ করেছে ইতিহাস-চেতনা। 'বাস্তব', গোর্কির কাছে, একটি গতিশীল সত্য।

ইতিহাসের গতি যেমন অতীত থেকে বর্তমানের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতের দিকে, তেমনি গোর্কি মনে করতেন, সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদীর জীবন-সম্পর্কিত দৃষ্টিও ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত হবে। 'Critical realist'-দের মত সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদীরা ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার শুধুমাত্র সমালোচক ন'ন, তাঁদের প্রসারিত দৃষ্টির সম্মুখে জন্ম নেয় সেই নতুন ভবিষ্যৎ যেখানে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত। 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদী' যেহেতু ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা এবং তাঁর সেই দৃষ্টিও ইতিহাস-নিয়ন্ত্রিত অতএব তিনি সাহিত্যে শ্রেণীহীন সমাজ-প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্যতম শক্তি শ্রমিকশ্রেণীর নিরন্তর সংগ্রামের চেহারা সহানুভূতির সঙ্গে ফুটিয়ে তুলবেন এটাই কাম্য। ধনতন্ত্রকে শুধু সমালোচনা করা নয়, এই ব্যবস্থার অবসানে শ্রমিকশ্রেণীর জয়ের সম্ভাবনা ফুটিয়ে তোলেন বলেই সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদী প্রধানতঃ আশাবাদী। 'ন্যাচারালিস্ট'দের সঙ্গে তাঁদের পার্থক্যের মূল সূত্রই এখানে। 'ন্যাচারালিস্ট'রা ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার এবং সেই ব্যবস্থার কুফলের যে নগ্ন-বর্ণনা দিয়েছেন পাঠক-মনে তার অন্যতম প্রতিক্রিয়া 'নৈরাশ্য'। 'ন্যাচারালিস্ট'রা বিজ্ঞানের বিভীষিকাময় প্রভাব লক্ষ্য করেছিলেন, লক্ষ্য করেন নি বিজ্ঞানকে যথার্থ মানব-সেবায় নিয়োজিত করার ব্যাপারে সমাজতন্ত্রের সাফল্য। সুতরাং তাঁরা নৈরাশ্যবাদী। অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদীরা আশাবাদী। কিন্তু সে আশাবাদ রোমান্টিকের নয়। ইতিহাসের বস্তুভিত্তির উপর সেই আশাবাদের প্রতিষ্ঠা। সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদী পাঠককে মুক্তির স্বপ্ন দেখাবেন। এ মুক্তি মানুষের ব্যক্তিত্বের অপমৃত্যু-জনিত লাঞ্ছনার হাত থেকে মুক্তি। কিন্তু একাজ তখনই সম্ভব যখন সভ্যতার প্রকৃত ধারক-বাহক যাঁরা সেই 'mass' কেই শক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়। গোর্কি নিজে তাই করেছেন। 'Mass' যেখানে একটি পুঞ্জীভূত শক্তি সেখানে প্রতিটি সংগ্রামই অশেষ সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতি বহন করে। অতএব সেখানে নৈরাশ্য থাকতে পারে না। লেনিন বলেছেন, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় একমাত্র ক্ষয়িষ্ণু শক্তিই নৈরাশ্য-পীড়িত। সুতরাং অধিক-সংখ্যক মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা যেখানে মূর্ত হয়ে ওঠে নৈরাশ্য সেখানে থাকে না। সমাজতান্ত্রিক-বাস্তববাদী তাই আশাবাদের প্রচারক। গোর্কির 'Song of the Falcon' গল্পের সেই বাজপাখিটার প্রচেষ্টাই প্রকৃত জীবন-সত্য যে কুণ্ডলীকৃত সর্পের জীবনে নিজের জীবনের সার্থকতা খুঁজে না পেয়ে মুমূর্ষু অবস্থাতেই দুর্বলতর শক্তি দিয়ে শত্রুকে আঘাত হেনে অবশেষে মৃত্যুর বুকে আশ্রয় নিয়েছিল। সরীসৃপের

নিরাপদ জীবনে টিকে থাকার নিশ্চিন্ততা আছে কিন্তু জীবনের স্পন্দন নেই, যেহেতু জীবন মানে ক্ষুদ্র গণ্ডীর দাসত্ব থেকে সংগ্রামের মাধ্যমে মুক্তি। 'বাজ-পাখির সংগীত' গল্পের রূপকে গোর্কি বস্তুতঃ গতি ও সংগ্রামকেই জীবন বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। কৃষিজীবীদের জীবনের সংগ্রামের চেহারা ও ধনতন্ত্রের সমালোচনা টলস্টয়ের গল্পে ফুটে উঠেছিল বলেই লেনিন একদা টলস্টয়কে প্রশংসা করেছিলেন, যদিও তিনি জানতেন টলস্টয় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মহিমা-প্রচারক ছিলেন না। কিন্তু তা না থাকলেও যে টলস্টয় মনে করতেন মানুষে-মানুষে যোগাযোগ স্থাপনই মহৎ সাহিত্যের লক্ষ্য এবং সেই সাহিত্যই শ্রেষ্ঠ ও মহান যা সাধারণ মানুষের জীবনের সন্নিকট তিনি যে বাস্তববাদী শিল্পী হিসেবে সাধারণ 'Critical realists'দের ঊর্ধ্বে উঠেছিলেন সে বিষয়ে সংশয় নেই। এবং সেই কারণেই এই মহান শিল্পীকে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন মহান বিপ্লবী লেনিন।

সাহিত্যকে সাধারণ মানুষের জীবনের কাছাকাছি আনা এবং সাধারণ মানুষের জীবনের অপারসীম সম্ভাবনাকে সাহিত্যের জগতে সত্য করে তোলা, গোর্কি যদি তাকেই 'সোস্যালিস্ট রিয়ালিস্ট'-এর প্রাথমিক কৃত্যরূপে গণ্য করেন তা'হলে গোর্কি-কথিত এই 'সোস্যালিস্ট-রিয়ালিস্ট'দের মধ্যে গণ্য হবেন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের এমন কিছু মহান স্রষ্টা যাঁদের তালিকায় রয়েছে আরাগঁ, এলুয়ার, পাবলো নেরুদা, বের্টোল্ট ব্রেশ্‌ট্‌ এবং আমাদের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুকান্তের মত ব্যক্তির নাম। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের মত দেশকালোত্তীর্ণ মহান আদর্শে বিশ্বাসী এই লেখকেরা সর্বহারা ও শ্রমজীবীর জীবনের সুপ্রচুর সম্ভাবনা অপরিসীম শ্রদ্ধার সঙ্গে রূপ দিয়েছেন তাঁদের সাহিত্যে। স্তেফান জেইগ যে কথা বলেছিলেন গোর্কি-প্রসঙ্গে, সে-কথা এঁদের সকলের প্রসঙ্গেই সমান সত্য ছিল যে; এঁদের সৃষ্ট চরিত্রগুলির মুখের ভাষা তাদেরই জীবনের বাণী। চরিত্রগুলির এই সপ্রাণ চঞ্চলতার কারণ লেখকদের সাধারণ মানুষ সম্পর্কে সহমর্মিতাবোধ ও ব্যাপক অভিজ্ঞতা। গোর্কির জীবনের বৈচিত্র্য ও বিভিন্ন ধরণের মানুষের সঙ্গে নিবিড় ঘনিষ্ঠতা তাঁকে দীক্ষিত করেছে মানব প্রেমে, বিশ্বাসী করেছিল সাধারণ মানুষের অসাধারণ সম্ভাবনায়। আর ব্রেশ্‌ট্‌? তিনি তো কৃষিজীবীদের জীবন নিয়ে নাটক লেখার সময় চলে যেতেন তাদের মধ্যে, নাট্যকাহিনীও পরিবর্তন করতেন তাদের পরা-মর্শে। জীবনের রঙ্গালয় থেকেই তিনি ঘটনা, চরিত্র নিখুঁতভাবে চয়ন করতে

চেয়েছিলেন। জীবনের সঙ্গে এই নিবিড় যোগাযোগের জন্যই বোধহয় গোর্কি ১৯০৯ সালের এক বক্তৃতায় তাঁর দেশের সাহিত্যের পদস্খলনের জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন, আর ব্রেশ্‌ট্ চেয়েছিলেন 'কম্যুনিস্টপার্টির ইশ্‌তেহার'কে কাব্যরূপ দিতে।

সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদীরা সাম্যকেই মনে করেন সমাজব্যবস্থার সঠিক পরিণতি। তাই সাহিত্যের মাধ্যমে সাম্যবাদের প্রচার করতে তাঁরা কুণ্ঠিত ন'ন। কিন্তু এর ফলে তো সাহিত্য ও রাজনীতির মধ্যেকার প্রভেদ বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদী'রা সে বিষয়ে সচেতন ছিলেন। ব্রেশ্‌ট্ প্রসঙ্গে কন্‌স্তান্তিন ফেদিন বলেছেন : 'He was never frightened of politics in art. On the contrary, he dealt with politics as a normal subject for art'[২]। কিন্তু কোন্ ধরণের 'politics'-এর স্থান সাহিত্যে ব্রেশ্‌ট্ স্বীকার করতেন? বলাই বাহুল্য একজন সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদী যিনি, এবং কম্যুনিস্ট পার্টির 'ইশ্‌তেহার'কে কাব্যরূপে দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন[৩] তিনি সাম্যবাদ ছাড়া অন্য রাজনীতির প্রচারকে নিশ্চয়ই সাহিত্যে কামনা করতেন না। যাঁরা ধনতন্ত্রের নির্মম সমালোচক ও ও সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা কামনা করেন, 'সাম্য'ই তাঁদের একমাত্র পথ। তাই 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদী'রা সাহিত্যকে ব্যবহার করতে চাইলেন সাম্যবাদ প্রচারের উপায় হিসেবে। সাহিত্যের সঙ্গে জনজীবনের রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক সমস্যাকে এইভাবে বিজড়িত করে দিয়ে লেনিন ১৯০৫-এর ১৩ই নভেম্বর তারিখে বললেন, 'Literature must become a component of organised, planned and integrated Social Democratic Party work.'[৪] কিন্তু রাজনীতিকে সাহিত্যের সঙ্গে এইভাবে সম্পর্কিত করে দিলে সাহিত্যের সাহিত্যগুণ সম্পর্কে সন্দেহ জাগা অস্বাভাবিক নয়। এই সন্দেহের সমাধান করেছেন মাও ৎসে-তুং তাঁর 'ইয়েনান ফোরামে'র বক্তৃতায় : 'works of art which lack artistic quality have no force, however progressive they are politically'.[৫] রাজনীতির দিক থেকে প্রগতিপন্থী হলেও যে-শিল্পে শৈল্পিকগুণের অসদ্ভাব মাও ৎসে-তুং তার গুরুত্ব স্বীকার করেন নি। রাজনীতি বিশেষ করে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনীতির প্রকাশ সাহিত্যে কামনা করলেও লেনিন বা মাও ৎসে-তুং-এর মত সাহিত্যরসিক রাজনীতিবিদেরা এ

বিষয়ে সচেতন ছিলেন যে, সাহিত্যের জগতের নিয়মের সঙ্গে রাজনৈতিক জগতের বা প্রাত্যহিক সংসারের নিয়মের পার্থক্য আছে। এঁদের এই চেতনা ছিল বলেই মাও ৎসে-তুং বলেছিলেন : 'What we demand is the unity of politics and art, the unity of content and form'[৬]। আর লেনিন সাইবেরিয়ায় সঙ্গী হিসেবে মনোনীত করেছিলেন পুশকিন, লেরমানতভ ও নেক্রাসভের বই এবং তাঁর বিপ্লবের তরুণ সাথীদের পরিচিত হতে অনুরোধ করেছিলেন স্বদেশীয় রোমান্টিক সাহিত্যিকদের রচনার সঙ্গে। সুতরাং সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদী-সাহিত্যে রাজনীতির স্বার্থে আর্টের দাবী ক্ষুণ্ণ করা হয়, এই অভিযোগ যথার্থ নয়। কল্পনা-স্পর্শমুক্ত জীবনের দলিল হিসেবে সাহিত্যকে গণ্য করতে চান নি সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদীরা।

গোর্কি বলেছেন, জীবনযুদ্ধে মানুষ আত্মরক্ষার তাগিদে দুটি প্রধান সৃজনধর্মী শক্তির চর্চা করেছিল—কল্পনা ও জ্ঞান। কল্পনা ছাড়া সাহিত্য হয় না, বিজ্ঞানও হয় না। লেনিনও সেই কথা বলেছিলেন—কল্পনা ছাড়া উচ্চতর গণিতের কোন কিছুর জন্যই সম্ভব হত না। সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদী হিসেবে গোর্কি প্রমুখ যে সত্য উপলব্ধি করেছিলেন সেই সত্য গোর্কির পূর্বেই গত শতকের চল্লিশের দশকে বেলিন্‌স্কিও প্রশ্নের আকারে স্বীকার করেছিলেন 'can the scientist do without an imagination'[৭]? বেলিন্‌স্কি বিজ্ঞান ও সাহিত্যের আপাত-বৈপরীত্য অস্বীকৃতির ব্যাপারেই যে শুধু সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদীদের পূর্বসূরী ছিলেন তা নয়; সাহিত্যিকের মূল লক্ষ্য যে জনসেবায় ও জনস্বার্থে সাহিত্যের ব্যবহার তা গোর্কির পূর্বেই বলেছিলেন তিনি : 'To deny art the right of serving public interests means debasing it, not raising it, for that would mean depriving it of its most vital force i.e., idea, making it an object of sybaritic pleasure, the plaything of lazy idlers'.[৮] বৃহত্তর জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার মর্যাদা বিস্মৃত হওয়ার অর্থই হচ্ছে শিল্পকে কিছু অলস মস্তিষ্কের আমোদের খোরাকে পরিণত করা। বেলিন্‌স্কি এই ধারণা যখন প্রকাশ করেন তার প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে লিও টলস্টয় তাঁর 'What is Art?' প্রবন্ধ গ্রন্থে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তিগুলি ধনীদের আমোদ ও বিলাসের উপকরণ বলে বর্জন করে 'খ্রীষ্টমাস ক্যারোল' ও 'টমকাকার কুটীরের'

মত গল্প কাহিনীকে সর্বোচ্চ আসন দিয়েছিলেন। সুতরাং গোর্কির 'Socialist realism' তত্ত্ব সৃষ্টির পূর্বেই ভূমি প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন বেলিন্‌স্কি-টলস্টয় প্রমুখ দার্শনিক ও সাহিত্যিকেরা। কিন্তু টলস্টয় Socialist realist ছিলেন না। গোর্কির বিচার অনুসারে তিনি Critical realist। অতএব বলতে হয় Socialist realist ও Critical realist-দের পার্থক্য মৌলিক নয়। একই মূল-সম্ভূত দুটি পৃথক আদর্শমাত্র। বোধ হয় সেই কারণেই মার্ক্সবাদী সমালোচক আর্নস্ত ফিশার বলেছেন,—Critical realism ও Socialist realism-এর প্রভেদ নির্ণয়ের চেষ্টা অতিসরলীকরণের নমুনা এবং যথার্থ Socialist realism এক অর্থে Critical realism। ফিশার 'Socialist realism' শব্দটি খুব সমর্থনযোগ্য মনে করেন নি, যেহেতু সমাজতান্ত্রিক-বাস্তববাদী-সাহিত্যকে প্রচারধর্মী সাহিত্য ছাড়া অনেকে অন্য কিছু ভাবেন না। তাঁর এই ধারণার সত্যতা হার্বার্ট রীডের মন্তব্যে ধরা পড়ে। রীড বলেছেন, 'In effect, then, socialist realism is but one more attempt to impose an intellectual or dogmatic purpose on art'.[৯] কার্ল রোডেক ও বুখারিনের মন্তব্য বিচার করে রীড পৌঁছেছিলেন এই সিদ্ধান্তে। এই জাতীয় অভিমতের অস্তিত্ব সম্পর্কে সতর্ক ছিলেন বলে ফিশার বলেছেন 'the term 'Socialist art' seems to me to be better'.[১০]

ফিশার মনে করেন, গোর্কি-প্রমুখ শিল্পীরা 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ' বলতে যা বুঝিয়েছেন তা আসলে কোন বিশেষ 'স্টাইল' বা 'রীতি' নয়, 'attitude' বা দৃষ্টিভঙ্গিমাত্র। সমাজের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক বিষয়ে একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিই সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদীদের সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য। শ্রমজীবী-শ্রেণীর উন্নতি ও জয়ে বিশ্বাস, অতীত ও বর্তমানের ইতিহাস পর্যালোচনা করে মানুষের ভবিষ্যৎ মুক্ত-জীবনের সম্ভাবনা সম্পর্কে নিশ্চিত আস্থা থাকাই সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদীদের এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির স্মরণীয় বৈশিষ্ট্য। লক্ষ্য করা প্রয়োজন, সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদীর দৃষ্টি যদিও আগামী ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত, তবু তিনি অতীত ও বর্তমান সম্পর্কে সচেতন। দেশের ও দেশীয় সাহিত্যের অতীত সম্পর্কে বিশ্বাস সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদীদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বোধ হয় সেই কারণে লেনিন সাদরে বরণ করে নিয়েছিলেন পুশকিনের রোমান্টিক গল্পকাহিনী আর মাও৺সে-তুং বলেছিলেন, যদি আমাদের সাহিত্যের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য না

থাকত তাহ'লে 'we could not carry on the revolutionary movement and win victory.'[১১] অতীতের সাহিত্যের প্রতি এই শ্রদ্ধা থেকেই সম্ভবতঃ ব্রেশ্‌ট্‌ এবং তাঁর পদাঙ্ক অনুসারীরা দেশের প্রাচীন গল্পকাহিনীর যুগোচিত ভাষ্য রচনা ক'রে তাকেই নতুন অর্থ-তাৎপর্যে মণ্ডিত করে তুলেছিলেন।

কিন্তু একালের মানুষের কাছে প্রাচীন বিষয়বস্তুকে পৃথক দ্যোতনায় আবেদন-সমৃদ্ধ করে তোলার জন্য প্রয়োজন রূপরীতির ভাবনা। ব্রেশ্‌ট্‌ রূপরীতির কথা ভাবতেন গভীরভাবে, যদিও মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদীর কাছে রূপচিন্তার ঊর্ধ্বে বিষয়-ভাবনার স্থান। নতুন রূপ আবিষ্কারের দিকে ব্রেশ্‌ট্‌-এর আগ্রহের কারণ হিসেবে ব্রেশ্‌ট্‌ বলেছেন 'how can artists portray it all with the old means of art ?'[১২] রূপের প্রতি অতিসচেতনতা ছিল কলাকৈবল্যবাদী-দের, বিষয়বস্তুর মহিমা স্বীকার করতেন না তাঁরা; এবং বাস্তববাদীরা বিষয়-মাহাত্ম্যে বিশ্বাসী, রূপের ভূমিকা তাঁদের কাছে গৌণ। কিন্তু যেহেতু সমাজ-তান্ত্রিক বাস্তববাদী মনে করেন অধিক সংখ্যক মানুষকে সংগ্রামে প্রাণিত ক'রে তুলে ভবিষ্যতের সম্ভাবনা বিষয়ে নিশ্চিন্ত করে তোলাই সাহিত্যিকের কাজ, অতএব শুধু বিষয়-নির্বাচনেই তাঁর দায়িত্ব শেষ হয়না, বক্তব্যকে সার্থক Communicate করার জন্য ভাবতে হয় প্রয়োজনীয় রূপরীতির কথা। যদি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একথা সত্য হয় 'পিতার মতো যিনি দেশের মানুষকে সন্তানের মতো জীবনাদর্শ বুঝিয়ে শিখিয়ে পড়িয়ে মানুষ করার ব্রত নিয়েছেন' তিনিই প্রকৃত লেখক এবং 'লেখক-শিল্পী জাতির কাছে পিতার মতো গুরুর মতো সম্মান পান'[১৩] তাহ'লে শুধুমাত্র বিষয়গত নিষ্ঠাই মহৎ শিল্পীর বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। কারণ সাহিত্য থেকে আনন্দলাভের অধিকার থেকে পাঠককে কোন লেখক বঞ্চিত করতে পারেন না।[১৪] সেই আনন্দ দানের জন্যই শিল্পী-সাহিত্যিককে বিষয় ছাড়াও ভাবতে হয় রূপরচনার কৌশলের কথা। সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদী হিসেবে ব্রেশ্‌ট্‌ এই সত্য স্বীকার করতেন। তাঁর প্রতিটি নাটকই ছিল তাই নিত্যনূতন পরীক্ষামূলক।

পরিশেষে, পঞ্চাশের দশকে ব্রেশ্‌ট্‌ সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদীর কাছ থেকে কাম্য যে দশটি সূত্র দিয়েছিলেন তা দিয়ে এই প্রসঙ্গের উপসংহার টানা যেতে পারে :—(১) 'বাস্তববাদী'-সাহিত্য জনসাধারণের প্রকৃত মঙ্গলের যা বিরুদ্ধশক্তি

তার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করবে; (২) ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ বাস্তব-সত্যের পরিস্ফুটন হবে বাস্তববাদীর লক্ষ্য; (৩) শিল্পীর অন্তরে থাকবে প্রগতি ও ইতিহাস চেতনা; (৪) মানুষের মধ্যেকার বৈষম্যের স্বরূপ ও সেই বৈষম্যের সঠিক কারণ সম্পর্কে শিল্পী থাকবেন সজ্ঞান; (৫) মানুষের পরস্পরের সম্পর্ক-পরিবর্তনের নিত্য ও নৈমিত্তিক কারণগুলি সম্পর্কে শিল্পী হবেন সতর্ক; (৬) মানুষের অভিপ্রায় ও তার কারণ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টি থাকবে সজাগ; (৭) তিনি হবেন মানুষের বন্ধু এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রধান সহায়; (৮) শুধু বিষয়বস্তুর ব্যাপারে নয়, জনসাধারণের চাহিদা সম্পর্কেও শিল্পীর বাস্তবসম্মত দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন; (৯) জনগণের শিক্ষা, তাদের শ্রেণীগত পরিচয় এবং শ্রেণী-দ্বন্দ্বের কারণ সম্পর্কে শিল্পী হবেন বৈজ্ঞানিক-দৃষ্টির অধিকারী; (১০) সর্বোপরি শ্রমজীবী এবং শ্রমজীবীর বন্ধু হিসেবে রয়েছেন যে বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের তরফ থেকে বাস্তবকে বিশ্লেষণ করবেন শিল্পী।...শ্রমজীবীদের সঙ্গে সাহিত্যিকের সম্পর্কের দিকে ব্রেশ্‌ট্ যে সংক্ষিপ্ত ও জোরালো আলো নিক্ষেপ করেছিলেন তা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি উক্তিতে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে: 'শ্রমিকশ্রেণীর বন্ধু আছেন, শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ, সংগ্রাম ও চেতনা ষোল আনা নিজের করে নিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর একজন হয়ে পড়ুন। দেখবেন কারখানার মারফতে ছাড়া এভাবেও শ্রমিক হওয়া যায়—শ্রমিকশ্রেণীর একজন হওয়ার যুক্তিতে।'[১৫] শ্রমিক-স্বার্থে লেখকের আত্মনিয়োগ করাকেই সমাজতান্ত্রিক বাস্তব-বাদী হিসেবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সমর্থন জানিয়েছেন। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লগ্ন সমাগত হলেও পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বত্র সমাজতন্ত্র কায়েম হয় নি। অতএব সম্মুখের দিকে তাকাতে হচ্ছে লেখকদের, দূর করতে হচ্ছে ভবিষ্যতের উপরকার স্বচ্ছ আবরণ, ফুটিয়ে তুলতে হচ্ছে মানুষের পূর্ণতা-লাভের পথের সংকেত। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এখনও সর্বাধিক প্রভাবশালী যে-শক্তি সেই ধনতন্ত্রীরা তাদের স্বার্থচিন্তায় মগ্ন থেকে মানুষে মানুষে সৃষ্টি করে চলেছে অসাম্যের দুর্লঙ্ঘ্য বাধা আর বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণা। তাই আত্মিক দিক থেকে অকালমৃত ধনতান্ত্রিক দেশের নিঃসঙ্গ মানুষগুলির বিচ্ছিন্নতাজাত যন্ত্রণার স্মারকচিহ্ন হয়ে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকেই সাহিত্যের জগতে গড়ে উঠল কতকগুলি আন্দোলন—ডাডাবাদ-অধিবাস্তববাদ-অস্তিত্ববাদ ও অ্যাবসার্ডবাদ।

* * * *

কিন্তু আশায় গড়া ভাববাদ ও সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের পাশাপাশি নৈরাশ্য ও নিঃসঙ্গতার স্মারক চিহ্ন বহন করে যে ডাডাবাদ-অধিবাস্তববাদ প্রভৃতি আন্দোলন সাহিত্যের জগতে বিকশিত হয়েছিল তার পশ্চাৎপট ও স্বরূপ আলোচনার পূর্বে সাহিত্য-সমালোচনা প্রসঙ্গে সমগ্রভাবে বাস্তববাদীদের বক্তব্য ও ভাববাদীদের সঙ্গে তাঁদের ধারণার পার্থক্যের একটি সাধারণ পরিচয় নেওয়া যেতে পারে।

সাহিত্যে ভাববাদী দর্শনের গুরু প্লেটো সাহিত্য-বিচার প্রসঙ্গে নীতির প্রশ্নকেই তুলে ধরেছিলেন সর্বোচ্চে। বিশেষ ধরণের সাহিত্যকর্মের বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষোভের কারণ সেই সমস্ত সাহিত্য থেকে নৈতিক চরিত্র শোধনের কোন উপকরণ না-পাওয়া। জীবনের সুষ্ঠু গঠনে নীতির অনিবার্যতা-বোধ প্লেটো-র সাহিত্য-বিচার পদ্ধতিকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছিল যে তিনি সাহিত্য থেকে আনন্দ পাওয়ার মত সাধারণ সত্যকে মোটেও গ্রাহ্য করেন নি। প্লেটো-র পর অ্যারিষ্টটল সাহিত্যের ভূমিকা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে আনন্দকে প্রাধান্য দিলেন। এই আনন্দ নিছক একটি বাহ্য ব্যাপার নয়। অ্যারিষ্টটল-ব্যাখ্যাত 'আনন্দ' মানসিক ভারসাম্য সৃষ্টির সঙ্গে জড়িত। ভীতি ও করুণা একত্রে উদ্রিক্ত হওয়ার পর মনে যে বিশেষ একটি স্থিতাবস্থা বা প্রশান্তি বিরাজ করে তারই এক নাম আনন্দ। সুতরাং অ্যারিষ্টটল জাগতিক নীতি-নিয়ম সুরক্ষার প্রয়োজনাত্মক মূল্য সাহিত্যে মানলেন না। অর্থাৎ তিনি সরে এলেন প্লেটো-র জগৎ থেকে। পাঠকের মনোজগতে সাহিত্যের প্রভাব বিশ্লেষণের মত সূক্ষ্মতার পরিচয় দিয়েছিলেন অ্যারিষ্টটল। তাছাড়া সাহিত্যের বাহ্যরূপগত সৌকুমার্যের গুরুত্বও স্বীকার করে নিলেন সাহিত্য থেকে আনন্দলাভের কারণ ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে। অতএব অ্যারিষ্টটল সাহিত্যবিচারে সাহিত্যের রূপ বা 'ফর্ম'-এর গুরুত্ব এবং পাঠকের মনের মধ্যে সাহিত্যের প্রভাবের মূল্য, এই দু'দিক থেকে অগ্রসর হলেন। অর্থাৎ তিনি যেমন 'রূপনিষ্ঠ' সমালোচকদের গুরু তেমনি সাহিত্যে 'রসাস্বাদন' পদ্ধতিরও আদিপ্রবক্তা। প্লেটো-র উত্তরসূরী হিসেবে যেমন আমরা ভিক্টোরীয় যুগের আর্নল্ড ও রাস্কিনকে খুঁজে পাই (যদিও নীতিশিক্ষা দেয় না বলে প্লেটো-র কাছে সাহিত্য ছিল বর্জনীয় আর নীতিশিক্ষা দেয় বলেই রাস্কিনের কাছে সাহিত্য বরণীয়) তেমনি অ্যারিষ্টটলের সঙ্গে Empathy তত্ত্বের প্রচারকদের মিল খুঁজে পাওয়া যেতে পারে, (যেহেতু সাহিত্য-আস্বাদনে

রসিকের মনোজগতের ভূমিকা Empathy মতবাদীদের প্রধান আলোচ্য বিষয়) মিল পাওয়া যেতে পারে সাহিত্যে মনঃসমীক্ষণতত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা যাঁরা তাঁদের সঙ্গেও। শুধু তাই নয়, সাহিত্যের বাহ্যরূপ বা ফর্মের দিকে ঝোঁক দিয়েছিলেন যে কলাকৈবল্যবাদীরা, তাঁরাও আত্মিক দিক থেকে অ্যারিষ্টটলের সঙ্গে সম্পর্কিত। আবার অ্যারিষ্টটল ট্রাজেডি-কমেডি-এপিক প্রভৃতি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা সম্পর্কে যে আলোচনা করেন তাতেও সাহিত্যবিচারে শ্রেণীনির্ণয়ের মত বিশ্লেষণধর্মী সমালোচনার তিনিই যে পথিকৃৎ তাও স্বীকার করতে হয়। কিন্তু অ্যারিষ্টটল পৃথক পৃথকভাবে সাহিত্যের রূপ ও রস (বলা যেতে পারে) সম্পর্কে আলোকপাত করলেও পরবর্তীকালে Synthetic Criticism এবং Impressionistic Criticism বা Interpretation-এর মধ্যে যে সূক্ষ্মতা খুঁজে পাওয়া যায় অ্যারিষ্টটলের আলোচনায় সংগত কারণেই তা অনুপস্থিত। সাহিত্যবিচারে পাঠকের সৃজনধর্মী ব্যক্তিত্বেরও যে একটা মূল্য আছে এবং শ্রেষ্ঠ-সমালোচক স্রষ্টার সমানুভূতির অধিকারী অথবা 'none but an artist can be a competent critic' এই সমস্ত ধারণার বিকাশ হয়েছিল কলাকৈবল্যবাদীদের দ্বারা অর্থাৎ উনিশ শতকের শেষার্দ্ধে। শিল্পী ও সমালোচকের রুচি ও মেজাজগত পার্থক্য-নির্ণয়ের সুদীর্ঘকালীন প্রয়াস তিরস্কৃত হ'ল কলাকৈবল্যবাদীদের দ্বারা। এই মতবাদীরা সাহিত্যবিচারে বিষয়ের উর্ধ্বে রূপকে বসিয়েছেন, লেখক ও পাঠকের ভাবগত পার্থক্য অস্বীকার করেছেন। সমালোচক ও স্রষ্টার মধ্যে মুখ্যতঃ যে-কারণে বিভেদ কল্পনা করা হয়, তার পিছনে রয়েছে এই যুক্তি যে একজনের কাজ সৃষ্টি এবং অপরজনের কাজ সেই সৃষ্টির বিশ্লেষণ। অর্থাৎ স্রষ্টার দরবারে সমালোচকের কাজ রহস্য আবিষ্কারকের। কেউ কেউ অবশ্য বলেন, সমালোচকের দায়িত্ব হচ্ছে পাঠকের কাছে সাহিত্যকে বোধগম্য করার ব্যাপারে সহায়তা করা, অর্থাৎ দোভাষীর কাজ করা। রবীন্দ্রনাথ যিনি সবরকমের শ্রেণীনির্ণয়ের প্রয়াস বা মনোবিশ্লেষণের প্রচেষ্টাকে নিন্দা করেছেন, তিনি দু'জাতের সমালোচকের কথা বলেছিলেন। একদল, তাঁর মতে, 'ব্যবসাদার বিচারক' যাঁরা সাহিত্যের বহিরঙ্গ-স্বরূপ বিশ্লেষণ করেন এবং অন্যদল 'সরস্বতীর সন্তান,' লেখকের ঘরের লোক। এই দ্বিতীয় দল সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'স্বভাবে এবং শিক্ষায় তাঁহারা সর্বকালীন বিচারকের পদ গ্রহণ করিবার যোগ্য যেহেতু

ফাঁক ও ফাঁকি বর্জন করিয়া ধ্রুব চিরন্তনকে এক মুহূর্তে আবিষ্কার করিতে পারেন এবং সাহিত্যের নিত্যবস্তুর সহিত পরিচয় লাভ করিয়া নিত্যত্বের লক্ষণগুলি তাঁহারা জ্ঞাতসারে এবং অলক্ষ্যে অন্তঃকরণের সহিত মিলাইয়া লইয়াছেন' (সাহিত্য-সমালোচনা : ১৩১০)। অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যবিচারে সাহিত্য-পাঠকের রুচির স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা স্বীকার করে নিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি সাহিত্য-বিচারের ক্ষেত্রে সমালোচকের Impression এবং Interpretation-এর মূল্য স্বীকার করতেন। তবে সাহিত্য-পাঠকের গুরুত্ব বোধ হয় সর্বাধিক স্বীকার করেছিলেন অস্তিত্ববাদী সার্ত্র, যিনি মনে করতেন লেখকের কাজ প্রকাশ করা আর পাঠকের কাজ সৃষ্টি করা। আর এর বিপরীত কথাটাই বলেছেন বাস্তববাদী টলস্টয় যার ধারণা ছিল 'artist's work cannot be interpreted' এবং সমালোচকেরা সেই তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিভাধর ব্যক্তি যাঁরা প্রথম-শ্রেণীর স্রষ্টাদের সমালোচনা করার মত দুঃসাহসী, উদ্ধত ও অবিনয়ী। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত টলস্টয়েরই, সমস্ত বাস্তববাদীদের নয়।

বাস্তববাদীরা সাহিত্য-সৃষ্টির মত সাহিত্য বিচারের ক্ষেত্রেও ভাববাদীদের জগৎ থেকে সরে এসেছেন বেশ কিছুটা দূরে। তাঁরা সাহিত্যসৃষ্টির পরিবেশ বাদ দিয়ে সাহিত্যবিচারের পক্ষপাতী ন'ন। লেখক, তাঁর পরিবেশ, তাঁর সৃষ্টি সব ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে যুক্ত, এই বিশ্বাস তাঁদের মনে বদ্ধমূল। টেইনের 'race', 'milieu' এবং 'moment' কে সাহিত্য-বিচারে বাস্তববাদীদের অনেকে শ্রদ্ধার সঙ্গে কাজে লাগিয়াছেন। সন্ত ব্যভ বিশ্বাস করতেন, যেমন বীজ তেমনি বৃক্ষ। এই বিশ্বাস তিনি সাহিত্য-বিচারেও কাজে লাগিয়েছেন। মার্কিন-বাস্তববাদী হাওয়েল্‌স্ বলেছেন, সমালোচককে বুঝতে হবে সাহিত্য কোন স্থাবর ব্যাপার নয়, তার একটি প্রগতির ধারা আছে। সমাজ, ধর্মনীতি ও অর্থনীতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের পরিবর্তন হয়, হাওয়েলস বলেছেন, এই সত্য সর্বদা স্মরণে রাখতে হবে। সমালোচনা শুধু পাঠকের ভালোলাগা-মন্দলাগা নয়। তাঁর বিশ্বাস, সাহিত্যের সমালোচনা তখনই সঠিক হয় যখন সমালোচক ঐতিহাসিকের তথ্য-নিষ্ঠা ও বৈজ্ঞানিকের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ-দক্ষতা যথাযথ ব্যবহার করতে পারেন। ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি থাকলে তবেই তুলনামূলক সমালোচনা-পদ্ধতির দ্বারা কোন সাহিত্যকর্মের সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব এবং সেই মূল্যায়নও নিরপেক্ষ হয়। হাওয়েলস, হেনরি জেম্‌স্ এই জাতীয় সমালোচনা-পদ্ধতিরই সমর্থক

ছিলেন। আর সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদীরা সাহিত্যবিচারে সাহিত্যিকের পরিবেশ ও সাহিত্য সৃষ্টির কাল সম্পর্কে সচেতনতা প্রকাশ করাকেই যথেষ্ট বললেন না। তাঁদের বক্তব্য হচ্ছে, কোন সাহিত্যের মধ্যে সাহিত্যিক সচেতন বা অসচেতনভাবে তাঁর শ্রেণীচরিত্রের পরিচয় দেন। সমালোচককে সেই সত্য সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, সাহিত্য বিচারের সময় প্রথমে গুরুত্ব দিতে হবে বিষয়বস্তুর উপর এবং অতঃপর রূপ-সৃষ্টির উপর। বিষয়ের বিশ্লেষণই, মার্ক্সবাদী সমালোচকের কাছে বড় কথা নয়। তিনি মনে করেন বিষয়ের সামাজিক গুরুত্বের মূল্য বিচারই সমালোচকের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। রূপের বিচার আসবে তার পরে। কিন্তু বিষয়ের তুলনায় রূপের ভূমিকা গৌণ হলেও রূপের মূল্যও অনস্বীকার্য। যদিও মার্ক্সবাদী সাহিত্যের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবাদের সফল রূপায়ণ-কামনা করেন তথাপি, এও জানেন যে শুধুই প্রচারধর্মিতা সাহিত্যের পক্ষে ক্ষতিকর। সাহিত্যকে সাহিত্য-হিসেবে সার্থক হতে হবে। মার্ক্সবাদীরা এই মতের বিকল্প মানেন না। আবার মার্ক্সবাদীর দৃষ্টি সম্মুখে প্রসারিত হলেও অতীতের গুরুত্ব তাঁর কাছে অপরিসীম। তাই মার্ক্সবাদী মনে করেন, সমালোচককে অতীতের মধ্য থেকে নতুন তথ্য ও পথের ঠিকানা খুঁজে বার করতে হবে। আনাতোলি লুনাচারস্কি বলেছেন, মার্ক্সবাদী-সমালোচক দু'ভাবে শিল্পীর কাছে শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করতে পারেন—প্রথমতঃ, শিল্পীর সাধারণ দোষ-ত্রুটি চিহ্নিত করে তাঁকে শুদ্ধ হওয়ার পথের নির্দেশ দিয়ে এবং দ্বিতীয়তঃ, সমাজ সম্পর্কে শিল্পীর বক্তব্য প্রকাশের দোষ-ত্রুটি দেখিয়ে দিয়ে।... সুতরাং মার্ক্সবাদীর কাছে সাহিত্যিক যেমন সমাজের নিষ্ক্রিয় দর্শক ন'ন, তেমনি সমালোচকও সাহিত্যের নিরপেক্ষ নিষ্ক্রিয় বিচারক ন'ন। সাহিত্যের রসিক হিসেবে তিনি মহান সৃষ্টিকর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকেন এবং পুনশ্চ সেই আদর্শের দ্বারা তরুণ শিল্পীদের পথের নির্দেশ দেন। মার্ক্সবাদী-সাহিত্যিক শিল্পের ক্ষেত্রে নতুন বিষয়বস্তু ও সেই বিষয়বস্তু প্রকাশের উপযোগী রূপের সমর্থক। আর মার্ক্সবাদী সাহিত্য-সমালোচক শিল্পী এবং তাঁর শ্রেণী-পরিচয় সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক-শোভন বিশ্লেষণ-ধর্মিতার অধিকারী হবেন এটাই কাম্য।

৫ ॥ বিচ্ছিন্নতা ও নিঃসঙ্গতা

ক ॥ পটভূমি

গত শতকের পশ্চিম মহাদেশে আগুস্ত কোঁতের 'ধ্রুববাদ', কার্লমার্ক্স-এর 'দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ', চার্লস ডারউইনের 'বিবর্তনবাদ' সুদীর্ঘকালীন ভাববাদী-দর্শনের ঐতিহ্যের উপর তিনটি প্রচণ্ড আঘাত। স্বর্গভ্রষ্ট মানুষ অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেন এবার অনিবার্য বাস্তব সত্যের মুখোমুখি হল। একদিকে বিজ্ঞানের আশীর্বাদে মানুষের ভোগসুখের উপকরণ বৃদ্ধি পেতে লাগল, কলকারখানা-নির্ভর শিল্পের বিকাশের ফলে প্রকৃতির অন্ধদাসত্বের হাত থেকে ঘটল মুক্তিলাভ, অন্যদিকে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সুফলের সারাংশ-ভোগী বিত্তবানদের সঙ্গে কারখানার শ্রমজীবীদের শোষক-শোষিত সম্পর্কের ফলে তাদের ভিতরকার দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক হল সুনিশ্চিত। শুধু কি তাই? গির্জা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষপুটে সযত্ন-লালিত সাধারণ মানুষের সম্মুখে জীবজগতের বিবর্তনের রোমাঞ্চকর রহস্যের আবরণ উন্মোচিত হয়ে যাওয়ায় পরম করুণাময় ঈশ্বর ইহলোক থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন। শতকের শেষ দিকে (১৮৮৩) নীৎসের জরথুষ্ট্র বললেন, 'For the old Gods came to an end long ago. And verily it was a good and joyful end of Gods.' ঈশ্বরহীন মনুষ্য-নির্মিত এই সুখ-দুঃখের পৃথিবী যেখানে মানুষের সর্বময় কর্তৃত্বই নানাভাবে প্রতিষ্ঠিত সেখানে প্রবঞ্চিত ও বঞ্চনাকারীর নিত্যসংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে সমাজ ক্রমাগ্রসরশীল এবং স্বল্প-সংখ্যক লুব্ধ ধনতান্ত্রিকের অভিপ্রায়ে অধিকসংখ্যক পণ্য উৎপাদনকারী যন্ত্র ও রক্তচক্রের আবর্তনের নিয়মে নিয়ন্ত্রিত; সর্বোপরি পরিবেশের সঙ্গে নিজের এবং নিজের এক সত্তার সঙ্গে অন্য সত্তার বিচ্ছিন্নতায় যন্ত্রণাকাতর। এই-ভাবে শোষণ, বিচ্ছিন্নতা ও সংগ্রাম ঈশ্বরহীন মনুষ্য-শাসিত এক নতুন দুনিয়ার ইতিহাস গড়ে তুলতে লাগল। বিদায় নিল পুরাতন নীতিবোধ। সুন্দর ও কুৎসিৎ, মহান ও দুষ্টের প্রভেদ গেল ঘুচে। মহাকালের পটভূমিতে মানুষের

কোন মূল্যই নেই, তার সমস্ত প্রয়াসই ব্যর্থ হতে বাধ্য, এই ধরণের নৈরাশ্যবোধ পীড়িত করতে লাগল ধনতন্ত্রশাসিত চিন্তাবিদ্দের। পশ্চিম মহাদেশের ধনতান্ত্রিক-স্বভাব, তাদের নিজেদের ভিতরকার প্রভেদকে উগ্র করে তুলল, বাণিজ্যের হাটে লিপ্ত করল পারস্পরিক সংগ্রামে, এবং বিভিন্ন দূরাঞ্চলের উপনিবেশে তাদের বিকি-কিনির হাট বসিয়ে পর-পীড়ন ও ব্যক্তিগত ভাণ্ডারের সমৃদ্ধিলাভের কামনায় করে তুলল ভয়ংকর। বর্তমান শতকের প্রথমেই এই দুর্দমনীয় লোভ ও পরপীড়নের ভয়াবহ পরিণতির প্রকাশ ঘটে গেল বিশ্বযুদ্ধে। কিন্তু যুদ্ধের কারণ হিসেবে ধনতন্ত্রের বিকাশ ও শ্রেণী-সংগ্রামের তাৎপর্য সন্ধান না করে একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী জানালেন, যুদ্ধ হচ্ছে মানুষের পাশব-প্রবৃত্তির ভয়ঙ্করতম পরিণতি। অর্থাৎ তাঁদের মতে, সামাজিক বা অর্থ নৈতিক কারণে যুদ্ধ হয় না, যুদ্ধ হয় প্রবৃত্তির অন্ধ-দাসত্বের ফলে। যেন সচেতন সভ্য মানুষের অন্তরের গভীরে গুহাহিত পাশবিকতা অনুকূল পরিবেশে আত্মপ্রকাশ করে যুদ্ধের মাধ্যমে। এই জাতীয় ব্যাখ্যায় দুষ্কৃতকারীর দায়িত্ব যেমন লাঘব হয়ে যায় কিয়দংশে, তেমনি যুদ্ধবিগ্রহের কারণ হিসেবে এমন কিছুকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয় যার উপর মানুষের বুদ্ধি বা সচেতন সত্তার কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। মানব-মনকে সচেতন, অচেতন ও অবচেতনের স্তরে বিভক্ত করে দিয়েছিলেন যে মনস্তত্ত্ববিদেরা তাঁদের প্রদর্শিত পথই এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের এই ধরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণে উৎসাহিত করে তুলল। সামাজিক পরিবেশ ও বাস্তবজীবন থেকে মানবমনকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে বিশ্লেষণের এই ফ্রয়েডীয় পন্থা বিশ শতকের প্রথম ভাগের যুদ্ধভীত, নৈরাশ্য-পীড়িত কিছু বুদ্ধিজীবীর মধ্যে সবকিছুকেই অস্বীকার করার একধরণের প্রবণতা উগ্র করে তুলল। এই পটভূমিতে শিল্প-সাহিত্যের জগতে জন্ম নিল ডাডাবাদ, অধিবাস্তববাদ এবং আরও কিছু পরে অস্তিত্ববাদ (অবশ্য এর ঐতিহ্য সুপ্রাচীন) ও অ্যাবসার্ড-বাদ। যদিও শিল্প-সাহিত্যের জগতের এই সমস্ত আন্দোলনের প্রত্যেকটিরই পৃথক স্বভাব ও বিকাশ ছিল তবু প্রতিটি আন্দোলনের শরিকেরা সকলেই অল্পবিস্তর-পরিমাণে ব্যক্তি-মানুষের অস্তিত্ব, পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রামলিপ্ত মানবজীবনের সার্থকতা, এবং প্রকৃত জীবনসত্যের স্বরূপ নিয়ে বিব্রত হতে লাগলেন। কোঁত, মার্ক্স, ডারউইন এবং ফ্রয়েড ছাড়াও এই শতকের গোড়ার দিকে বিজ্ঞানী আইনস্টাইন সাহিত্যের জগতের এই সমস্ত আন্দোলনকে প্রভাবিত করলেন নানাভাবে। যদিও সাধারণভাবে সাহিত্য ও

বিজ্ঞানের ক্ষেত্র স্বতন্ত্র, তথাপি যেহেতু সাহিত্যিক বৈজ্ঞানিক-পৃথিবীরই বাসিন্দা; অতএব সামাজিক, অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক জগতের সব কিছুই যে সাহিত্যিককে প্রভাবিত করতে পারে এ বিষয়ে সন্দেহ কোথায় ? তা-ই গত শতকের যথাস্থিত-বাদীদের উপর ডারউইনের প্রভাব, ডাডাবাদী ও অধিবাস্তববাদীদের উপর ফ্রয়েড-এর প্রভাবের সঙ্গে মার্ক্সীয় দর্শনের প্রভাব, অস্তিত্ববাদী ও অ্যাবসার্ড-বাদীদের উপর মার্ক্সীয় দর্শন এবং আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বের প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানের প্রভাব (অ্যাবসার্ড-বাদীদের ক্ষেত্রে) নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই সমস্ত আন্দোলনের সীমা বা সংকীর্ণতা যাই থাক, সাহিত্য যে ইহজাগতিক সম্পর্কশূন্য ভাববিলাস মাত্র নয়, সাহিত্যিক যে কল্পলোকবাসী জাগতিক দায়দায়িত্বহীন ব্যক্তি ন'ন, এই সত্য যেন স্পষ্ট হয়ে উঠল বর্তমান শতকের সাহিত্য-জগতের এই সমস্ত আন্দোলনে।

খ ॥ ডাডাবাদ ও অধিবাস্তববাদ

সাহিত্যে বাস্তবের ভূমিকা নিয়ে বিভিন্ন দেশে যখন আন্দোলন গড়ে উঠছে, রুশ-দেশীয় শিল্পী-সাহিত্যিকদের হাতে (বিশেষভাবে গোর্কি) জন্ম নিচ্ছে নতুন শব্দ 'Socialist Realism' তখন তার প্রায়-সমকালেই ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সংকটের পটভূমিতে ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণতত্ত্বের ভিত্তির উপর ফ্রান্সে গড়ে উঠল নতুন আন্দোলন 'স্যুর-রিয়ালিজ্‌ম্‌' বা অধিবাস্তববাদ, যার পুরোভাগে সাহিত্যে এলেন আঁদ্রে ব্রেতোঁ, জঁ। ককত্যু এবং চিত্রে মাক্স আর্নস্ত ও সালভাদোর দালির মত শিল্পী। (অনেকে অবশ্য এই নামগুলির সঙ্গে যুক্ত করতে চান টি. এস. এলিয়ট ও এজ্‌রা পাউণ্ডের নাম। তাঁদের আমরা জানি 'ইমেজিস্ট' হিসেবে। জেম্‌স্‌ জয়েস্‌-এর নাম যিনি চেতনাপ্রবাহধর্মী উপন্যাসের লেখক এবং কাফ্‌কা-র নাম যিনি অ্যাবসার্ডিস্ট নামেও চিহ্নিত হতে পারেন)। এঁদের মধ্যে আঁদ্রে ব্রেতোঁ যিনি অধিবাস্তববাদের দু'খানি দলিলের রচয়িতা, ১৯২৪ পর্যন্ত তিনি ছিলেন ডাডাবাদীদেরই অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ও এই আন্দোলনের শরিক। ব্রেতোঁ যে-ডাডাবাদের মুগ্ধ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সেই ডাডাবাদের জন্মভূমি জুরিখ ছিল ফ্রয়েডপন্থী মনস্তত্ত্ববিদদের অধিষ্ঠানভূমি। জুরিখে ট্রিসটান ৎসারা, আমেরিকায়

মার্সেল ডুকাম্প, ফ্রান্সিস পিকাবিয়া ও পারী-তে 'Litterature' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা একদল শিল্পী, যাঁদের সকলেরই জন্ম ঊনিশ শতকের শেষ দশকে, পশ্চিম মহাদেশের বিভিন্ন ভূখণ্ডে 'ডাডাবাদ'কে শিল্প-জগতের একটি আন্দোলন হিসেবে ধীরে ধীরে পুষ্ট করে তুললেন। জীবনের যাবতীয় মূল্যবোধকে অস্বীকার করে, সাহিত্যের সনাতন পন্থাকে আঘাত হেনে, মানবমনের অবচেতন-স্তরের গুরুত্বকে সর্বোচ্চে স্থান দিয়ে এবং কার্য-কারণের ন্যায়শাস্ত্রানুমোদিত সম্পর্কের নিরর্থকতাকে সরবে ঘোষণা করে ডাডাবাদীরা মেনে নিলেন অন্তর্লোকের স্বৈরাচার, কাব্যভাষায় অনিয়ন্ত্রিত স্বতঃস্ফূর্ততা, যথেচ্ছ শব্দ-নির্বাচনে কবির স্বাধীনতা। যেহেতু মানুষের সমস্ত ভাবনা সুসংলগ্ন নয়, অতএব কাব্যে সুগঠিত বাক্য-ব্যবহার, ডাডাবাদীদের মতে, একধরণের কৃত্রিমতা। তাঁরা মনে করতেন, মহৎ সাহিত্যিক বলে পরিচিত যাঁরা, তাঁরা সকলেই পরানুকারী ও কুম্ভীলক। যেহেতু মানুষ ছন্দোবদ্ধ পদে চিন্তা করে না, তার প্রতিটি ভাবনা অখণ্ড একটি প্রবাহে আসে না, অতএব এই সমস্ত ভাবনা-চিন্তাকে যে সমস্ত সাহিত্যিক নিয়মিত পঙক্তিতে বিন্যস্ত ক'রে সালংকৃত মূর্তিতে উপস্থাপিত করেন তাঁরা কাব্য সম্পর্কে প্রাচীন ধারণার দ্বারা পরিচালিত হয়ে অপরের প্রদর্শিত পথে নিশ্চিন্তে পদচারণা করেন। ডাডাবাদীরা কবি-সাহিত্যিকদের এই কাজকে মনে করেন একধরণের মিথ্যাচার। বস্তুতঃ ডাডাবাদীরা অচেতন ও অবচেতন মনের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠায় এতদূর অগ্রসর হয়েছিলেন যে, কাব্য-কবিতা ছিল তাঁদের কাছে 'automatic writing'। একটি ভাবনা এল মনে, অমনি তা আশ্রয় করল একটি প্রতীককে। ব্যস! কবিতার জন্ম হ'ল। রূপরচনায় প্রযত্ন মানেই হচ্ছে, এঁদের কাছে, সজাগ ও সতর্ক মনের একাধিপত্য স্বীকার করে নেওয়া। কিন্তু ডাডাবাদীর বিশ্বাস ও ভরসাস্থল হচ্ছে মনের সেই অজ্ঞাত অনালোকিত প্রদেশ, মাঝে মাঝে স্বপ্নলোকের গভীর গোপনে ঘটে যার অবাধ আধিপত্য। এই মন সুসংলগ্ন ভাব-প্রকাশের জন্য ব্যাকুল নয়, যেহেতু তাকে কারুর কাছেই কৈফিয়ৎ দিতে হয় না। সুতরাং কাব্যরচনার একটি সহজ পথ দেখিয়ে দিলেন ট্রিসট্রান ৎসারা: 'Take a newspaper, take scissors, choose an article, cut it out, then cut out each word, put them all in a bag, shake ...... ?'[১] কিন্তু প্রশ্ন জাগে, যেখানে কোন একটি বিশেষ রচনা পছন্দ করার প্রসঙ্গ আসে, সেখানে কবির কাজটা কি চেতন-মন নিঃসম্পর্কিত

যথেচ্ছাচার হতে পারে? তা ছাড়া কবিতাকে ওঁরা যতই সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত ও প্রয়াস-প্রযত্নহীন ব্যাপার বলে মনে করুন না কেন, ডাডাবাদের অন্যতম শরিক পল এলুয়ার কিন্তু প্রচলিত কাব্যভাষার বাচালতা বর্জন করতে চাইলেও কবিতায় তাত্ত্বিক-বিশুদ্ধির জন্য বলেছেন 'Let us reduce it, let us transform it into a charming true language.'[২] এঁদেরই অন্যতম আঁদ্রে জিদও ভাষায় পুরাতন পদ্ধতির অলংকার বর্জন করতে চেয়েও তীক্ষ্ণ ও সহজ ধরণের শব্দ-বিন্যাস ও বাক্য গঠনের জন্য ঔৎসুক্য দেখিয়েছিলেন।[৩] বস্তুতঃ ডাডাবাদীরা লেখকের ব্যক্তিমনের অনিয়ন্ত্রিত বিকাশে এতই আস্থাশীল ছিলেন যে, যে-কোন রকমের পূর্বানুবর্তন তাঁদের কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। আসলে ডাডাবাদ ছিল কোন কিছু না-মানার আন্দোলন। কিন্তু বিশ্বনিন্দকের দৃষ্টি নিয়ে জীবন ও সাহিত্যকে দেখে এই হতাশা-পীড়িত শিল্পী-সাহিত্যিকেরা অবশ্যই দীর্ঘজীবী কোন আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেন নি। এক ধরণের অন্তর্মুখিতার স্বৈরাচার ব্যাধির মত গ্রাস করেছিল এঁদের। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলতে হবে, শিল্প-সাহিত্যের জগতে নতুন আন্দোলনগুলির ভূমিকা রচনা করেছিলেন এই ডাডাবাদীরাই।

১৯১৫-১৬ খ্রীষ্টাব্দে ডাডাবাদের জন্ম এবং পরবর্তী আন্দোলন 'স্যুর-রিয়া লিজ্‌ম্' বা অধিবাস্তববাদ সংক্রান্ত আঁদ্রে ব্রেতোঁ-প্রকাশিত প্রথম দলিলের প্রকাশকাল ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দ। সুতরাং ঐতিহ্য ও প্রাচীনধারা সম্পর্কে নএর্থক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যে-ডাডাবাদ শিল্প-সাহিত্যের জগতে আত্মপ্রকাশ করেছিল তা স্বাভাবিক কারণেই সুচিরজীবী হতে পারে নি। এ কথা সত্য যে, শিল্প-সাহিত্য পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব বা নির্দেশের সাহায্যে সুবিকশিত হতে পারে না, কিন্তু তাই বলে যে-কোন রকম অনিয়ন্ত্রিত আত্ম-প্রকাশ, তা সে মগ্ন-চৈতন্যের খাতিরেও, শিল্পরূপে গণ্য হতে পারে কি? 'তাৎক্ষণিক কবিতা' কথাটায় চমক আছে নিঃসন্দেহে। কবিতায় 'ইমেজ'-এর মূল্য অনস্বীকার্য। কিন্তু কবিতা রচনায় শিল্পীমনের সচেতন সক্রিয়তার কোন মূল্য নেই, একথা পল ভালেরিও, ডাডাবাদীদের মুখপত্র Litterature'-এর অন্যতম লেখক হওয়া সত্ত্বেও পরবর্তীকালে স্বীকার করেন নি। বস্তুজগৎ থেকে উপাদান ও উপমা সংগ্রহ করেও কবি-সাহিত্যিক যেভাবে তাকে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত করে তোলেন, দূরসম্পর্কিত সত্যকে মনের সহায়তায় অভিন্ন একটি 'ইমেজে' রূপায়িত করেন সেই দিকে লক্ষ্য রেখে ভালেরি তাঁর 'Poetry and

abstract thought' প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন 'The Poetic universe,… offers extensive analogies with what we can postulate of the dream world.' কিন্তু তাই বলে কাব্যের জগৎ দিবাস্বপ্নের জগৎ নয়। কবিতার মাধ্যম ভাষা এবং সেই ভাষার সহায়তায় কবিতা পাঠকের অন্তরে সঞ্চারিত হয়। অতএব কবিতা বস্তুটিই হচ্ছে ভালেরি-র মতে 'art of language' বা ভাষাশিল্প। এই ভাষা প্রাত্যহিক ভাষারীতির অনুরূপ নয়, কারণ খুব অল্পের মধ্যে পাঠক-মনে গভীর ও ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির ক্ষমতা আছে কবিতার। অতএব ভাষার মধ্যে ভাষাতীতের ব্যঞ্জনা সৃষ্টির জন্য কবির মনে চলে 'গুপ্ত রূপান্তরণ-প্রক্রিয়া'। এই রূপান্তরণ-প্রক্রিয়ায় মানবমনের গোপনতম স্তরের প্রভাবই সর্বাধিক, ডাডাবাদীদের সিদ্ধান্ত হল এই রকম। কিন্তু ১৯২৫-এ সুর্-রিয়ালিজ্‌মের প্রথম দলিলে আঁদ্রে ব্রেতোঁ লিখলেন, স্বপ্ন ও বাস্তবের বৈপরীত্যের পরিবর্তে এদের মিলনজাত একটি বিশুদ্ধ বাস্তবের সম্ভাব্যতায় তিনি বিশ্বাসী। ব্রেতোঁ তাঁর ডাডাবাদী বন্ধুদের কাছ থেকে যে কতটা পৃথক্ হয়ে এসেছিলেন সুর্-রিয়ালিজ্‌মের দ্বিতীয় দলিলে তা স্পষ্ট হয়ে উঠল। ব্রেতোঁ বললেন, শব্দগত স্বয়ংক্রিয়তায় সুর্-রিয়ালিস্ট বিশ্বাসী ন'ন। কবিতার সুগঠিত মূর্তিতে এবং সেই কারণে যৎসামান্য হলেও প্রয়োজনীয় সঠিক নির্দেশে আস্থা আছে তাঁদের। বিশুদ্ধ কবিতার দোহাই মেনে অনিয়ন্ত্রিত এবং অসংযত ভাব-প্রকাশের কোন অভিলাষ সুর-রিয়ালিস্টের নেই। বস্তুতঃ অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের, চেতন ও অবচেতনের মধ্যবর্তী সীমারেখা ভেঙে দিতে চেয়েছিলেন সুর্-রিয়ালিস্টরা এবং সেই কারণে শুধু অবচেতনের দোহাই মেনে যথেচ্ছাচারে তাঁদের আসক্তি ছিল না। শুধু তাই নয়, তাঁরা সাহিত্যকে সমাজদেহের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন সম্পর্কে যুক্ত করে মার্ক্সীয় দ্বান্দ্বিকতাকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করলেন এবং সাহিত্যের মাধ্যমে সমাজ-পরিবর্তনের কামনাও জানালেন। ডাডাবাদী যেখানে নৈরাশ্যতাড়িত হয়ে সব কিছু অস্বীকারের পথ নিয়েছিলেন সেখানে অধিবাস্তববাদী বা সুর্-রিয়ালিস্ট যেমন স্বপ্ন ও বাস্তব উভয়ের সত্যতা স্বীকার করে রিয়ালিজ্‌মের নতুন অর্থ-তাৎপর্য সৃষ্টি করলেন তেমনি 'to change life'-কে সাহিত্যের উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করে ডাডাবাদীদের জগৎ থেকে মার্ক্সবাদীদের জগতের দিকে স্পষ্ট উন্মুখতা দেখালেন। তাই দেখি সুর্-রিয়ালিস্ট আন্দোলনের অন্যতম অংশীদার আরাগঁ ক্রমে সাম্যবাদে সম্পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করেন এবং এলুয়ার মানুষ ও প্রকৃতি

সম্পর্কে তাঁর ঔৎসুক্য প্রকাশ করে ভাববাদ-নির্ভর সাম্যবাদের প্রচারকে পরিণত হন।

সুর্-রিয়ালিস্টগণ সাহিত্য ও শিল্পের জগতে স্বপ্ন ও কর্মজগতের বাস্তবতা স্বীকার করে 'বাস্তব' শব্দের ব্যাপকতা সৃষ্টি করেছিলেন। তেমনি গদ্য ও পদ্যের সনাতন বিভাজন-পদ্ধতি দিলেন ভেঙে এবং সাহিত্যের সাধারণ রূপেও ঘটালেন নতুনত্ব। যেহেতু ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ-তত্ত্বে এঁদের ভিত্তি ছিল, তাই দেখি আর্নস্ত ও দালির হাতে প্রাচীন আদর্শের শিল্প মূর্তি বিপর্যস্ত হয়ে যাচ্ছে। দালি সাপ, ছাগল, আগুন, মদ ও রুটিকে ব্যবহার করেছেন প্রতীকরূপে, জুতোর প্রতীকে সংকেতিত করেছেন যৌনতাকে। অতি পরিচিত বস্তুর এই ধরণের প্রতীক-মূল্য সৃষ্টি করার ফলে প্রাচীন পদ্ধতির শিল্পবিচার বিপর্যস্ত হতে বাধ্য। নাটকেও দেখি জাঁ কক্‌তুা আঘাত করছেন প্রাচীন নাট্যতত্ত্বকে। অসংগতি ও অসমঞ্জসের চূড়ান্ত ব্যবহার করেছেন কক্‌তুা তাঁর 'Orphe´e' (১৯২৬), 'Antigone' (১৯২২) এবং 'The Infernal Machine' (১৯৩৪) নাটকে। প্রথমোক্ত নাটখানিতে আনন্দদায়ক ও ভয়ঙ্কর উভয়বিধ ঘটনার সন্নিবেশ হয়েছে যেমন, তেমনি চরিত্রগুলি মাধ্যাকর্ষণের ও যুক্তিতর্কের সাধারণ নিয়মকেও গিয়েছে অস্বীকার করে। গ্রীক পুরাণ থেকে সংগৃহীত-কাহিনী অবলম্বনে লেখা শেষোক্ত নাটক দু'খানিতে কক্‌তুা প্রাচীন কাহিনীগুলি সম্পর্কে আমাদের প্রচলিত ধারণা একেবারে বিপর্যস্ত করে দিয়েছেন সুর-রিয়ালিস্টিক পদ্ধতি ও নতুন জাতের ভাষা প্রয়োগ করে। কোরাসকে কাহিনীর সীমান্তে না রেখে একেবারে ভিতরে আকর্ষণ করে নিয়েছেন অদ্ভুত দক্ষতায়। এই সুর-রিয়ালিস্টিক পদ্ধতি চোখে পড়ে ফ্রাঙ্কো বেলজিয়ান নাট্যকার ফার্নান্দ ক্রোমলিঙ্কের নাটকে। স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবের, হাস্যকরের সঙ্গে ট্রাজিকের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন তিনি। এই সুর-রিয়ালিস্টিক পদ্ধতিই চোখে পড়ে অ্যাবসার্ডিস্ট নাট্যকার ইওনেস্কোর 'How to get rid of it' নাটকে। মৃতদেহের জ্যামিতিক প্রগতিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্তি, অ্যামিডি-র আকাশমার্গে উড্ডয়ন এ-সবই স্বপ্নলোকের সত্য। কিন্তু কৌশলী নাট্যকার এমনভাবে নাটকের ভিতর এই স্বপ্ন-জগতের সত্যকে বাস্তব-জগতের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন যে, পাঠকের কাছে মনে হয় এ এক নতুন জগৎ। ইওনেস্কোর 'Rhinoceros' নাটকেও একে একে সকলের গণ্ডারত্ব-প্রাপ্তি অবশ্যই স্বপ্নের সত্য, বাস্তব সত্য

নয়। বাঙালী-নাট্যকার বাদল সরকারের 'বল্লভপুরের রূপকথা'তে দেখি রঘুদা এই জাতীয় একটি স্বপ্নলোকের চরিত্র। বস্তুতঃ অ্যাবসার্ডিস্ট বলে পরিচিত নাট্যকারেরা প্রচলিত নাটকের ছকে নয়, স্বপ্ন ও বাস্তবের অদ্ভুত মিশ্রণ ঘটিয়ে তাঁদের পূর্বসূরী সুর্‌-রিয়ালিস্টদের ঐতিহ্যই স্বীকার করে নিয়েছিলেন। মানুষের সজ্ঞান-মন অপেক্ষা অসজ্ঞান বা অচেতন মনের পরিমাণই অধিক, হিমশৈলের মত মনের এক নবমাংশ মাত্রই বাইরে প্রকাশিত হয়—এই মনস্তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত সুর্‌-রিয়ালিস্টরা তাঁদের শিল্প-সাহিত্যে যে ভাবে অঙ্গীকার করেছিলেন, পরবর্তী 'অ্যাবসার্ডিস্ট'রাও সেই একই পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন। আর উপন্যাসের জগতে যাঁরা চেতনা-প্রবাহধর্মী উপন্যাসের রচয়িতা বলে পরিচিত সেই 'ইউলিসিস'-রচয়িতা জেম্‌স্ জয়েস, 'শ্রীযুক্তা ডোলোয়ে' ও 'তীর্থযাত্রা'র (Pilgrimage) লেখিকা ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্, যদিও ফ্রয়েড অপেক্ষা উইলিয়ম জেম্‌সের 'Principles of psychology'র দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন তবু উপন্যাসে পাঠক ও চরিত্রের মধ্যে বিভেদ ঘুচিয়ে দিয়ে এবং চরিত্রের গভীরে পাঠককে আকর্ষণ করে উপন্যাসের জগতে যে নতুনত্ব সৃষ্টি করলেন তার সঙ্গে সুর্‌-রিয়ালিস্টিক পদ্ধতির দূরত্ব খুব বেশী নয়। তবে আঁদ্রে ব্রেতোঁ ইন্দ্রিয়ের পথে আগত-জ্ঞানকে অচেতনের সঙ্গে সমান মর্যাদায় স্বীকার করে ও সমাজ-পরিবর্তনের জন্য সমকাল ও পরিবেশের গুরুত্ব যেভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তা কিন্তু অ্যাবসার্ডিস্ট বা চেতনাপ্রবাহে বিশ্বাসীদের লেখায় চোখে পড়েনি। ব্রেঁতো-র সমাজ-পরিবর্তন কামনার দিকে লক্ষ্য রেখে হার্বার্ট রীড এই মন্তব্য করতে উৎসাহী হয়েছিলেন: 'Surréalisme, in the form expounded by the animator of the movement, Andre Breton, has been profoundly influenced by the dialectical materialism of Marx.'[8] মার্ক্সীয় 'Logic of totality'তত্ত্ব (যে তত্ত্ব মার্ক্স হেগেলের কাছ থেকে লাভ করেছিলেন) সুর্‌-রিয়ালিস্টরা নাকি মার্ক্সীয় পন্থাতেই হেগেলের 'মিস্টিসিজ্‌ম্' বাদ দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের শিল্প-সাহিত্য চিন্তায়। কিন্তু আমরা প্রথমেই বলেছি ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সংকট ছিল ডাডাবাদ ও অধিবাস্তববাদের জন্ম-কারণ এবং সমকালেই রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ সাহিত্যের জগতে গুরুত্ব লাভ করছিল; যার সঙ্গে

ডাডাবাদের বৈপরীত্যই ছিল প্রধান। অতএব রীডের মন্তব্য কতটুকু সমর্থন-যোগ্য? রীড যাই বলুন না কেন এবং ডাডাবাদের সঙ্গে কোন কোন দিক থেকে সম্পর্কযুক্ত অধিবাস্তববাদী আন্দোলনের কয়েকজন শরিক পরবর্তীকালে সাম্যবাদী হিসেবে পরিচিত হলেও সন্দেহ নেই যে, ডাডাবাদ ও অধিবাস্তববাদের ভিত্তি 'সোশ্যালিজ্‌ম্' নয়, 'অন্তর্গত চিন্ময় সত্য'; এবং মার্ক্স অপেক্ষা ফ্রয়েড-এর দিকেই তাঁদের টানটা ছিল বেশী। তবে অধিবাস্তববাদীরা যে ডাডাবাদীদের নৈরাশ্যপীড়িত দৃষ্টিভঙ্গি বর্জন করতে পেরেছিলেন, সমাজ-পরিবর্তন কামনা করেছিলেন, চেতন ও অবচেতন গুরুত্ব স্বীকার করে 'বাস্তব' শব্দটির অর্থ-তাৎপর্য ব্যাপক করে তুলেছিলেন সে বিষয়ে সংশয় নেই। তা-ছাড়া, পুরোপুরি সমগোত্রভুক্ত না হলেও সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদীদের মূল বক্তব্যের সঙ্গে অধিবাস্তববাদীদের বক্তব্যের কোন কোন অংশে মিলটুকুও অস্বীকার করা যায় না এবং মনে হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের নৈরাশ্যের পাশে রুশদেশের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের উজ্জ্বল আলোকরেখা এঁদের মোহিত এবং আকৃষ্ট করেছিল। বাঙলা সাহিত্যের পক্ষে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে, যে-বছর আঁদ্রে ব্রেতোঁ-র সুর্‌-রিয়ালিজ্‌মের প্রথম দলিল প্রকাশিত হয় সেই বছরই (১৩৩০ বা ১৯২৪) কল্লোল পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কল্লোলের লেখকেরাও 'হেথা হতে যাও পুরাতন' শ্লোগানের দ্বারা রবীন্দ্র-ঐতিহ্য অস্বীকার করে চলতে চেয়েছিলেন। এঁদেরই অন্যতম জীবনানন্দ ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে (অর্থাৎ যে বছর রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়) তাঁদের তখনকার অবস্থার কথা লিখেছেন এইভাবে,—'রবীন্দ্রনাথের কবিতার চর্চা আধুনিক বাঙালী কবির তেমন মন যোগাত না; অন্তত যারা আধুনিক বিশিষ্ট বাঙালী কবি, রবীন্দ্রনাথকে তারা বিস্পষ্ট সম্ভ্রমে প্রণাম জানিয়ে মালার্মে ও পল ভালেরি, র‍্যাঁসার ও ইয়েট্‌স্ ও এলিয়ট-এর সদর্থক বা নঞর্থক মনন বিচিত্রতার কাছে গিয়ে দাঁড়াল'; যদিও তিনি সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্বীকার করেছেন 'আধুনিকদের একটা উৎকৃষ্ট পক্ষ — সজাগভাবে বিস্রস্ত হতে দিলেও, অবচেতনায় তাঁরই কাব্যে বরাবর অনুভাবিত হয়ে এসেছে।'[৫] 'অবচেতনায়' রবীন্দ্র-কাব্যকে স্বীকৃতি দিলেও নবীনদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের খোলাখুলি মত বিনিময়ের জন্য জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে দু'দিন সভা বসেছিল। তার পরিণতির চেহারা নবীনদের তরফের অন্যতম অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের

'কল্লোল যুগ'-এ যথাযথ বিবৃত হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নবীনদের সম্পর্কে বক্তব্য শুধু এই সভাতে নয়, বিভিন্ন প্রবন্ধে ও বক্তৃতায় ধরা পড়ল। রবীন্দ্রনাথ সেই প্রসঙ্গে পাশ্চাত্ত্যের কোন কিছু না-মানার আন্দোলনকে সমালোচনা করলেন এবং এই আন্দোলনের বঙ্গদেশীয় সংস্করণের নেতা যাঁরা তাঁদেরও বললেন—কোন কিছু না-মানার চাইতে, কোন কিছু মানাই কষ্টকর। এবং 'কিছু মানি না' বলে মহৎ সৃষ্টিও সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কল্লোলগোষ্ঠীর বাঁধন-ভাঙা নবীনদের যে দ্বন্দ্ব তা কিন্তু রোম্যান্টিকের সঙ্গে ডাডাবাদীর দ্বন্দ্ব বললে ভুল হবে। আসলে না-মানতে গিয়ে এদেশের তরুণেরা এমন অস্বাস্থ্যকর কিছু মানতে চেয়েছিলেন যা রবীন্দ্রনাথের মতে বিলেতী পাকশালায় প্রস্তুত 'রিয়ালিটির কারিপাউডার'। ডাডাবাদের 'না-মানাটুকু' নিয়েছিলেন আমাদের দেশের লেখকেরা, এবং ফ্রয়েডীয় যৌন-মনস্তত্ত্ব গল্পে-কবিতায়-উপন্যাসে (বুদ্ধদেব-অচিন্ত্য প্রমুখ) ব্যবহার করেছিলেন যথাসাধ্য। কিন্তু যে-আন্দোলন পাশ্চাত্ত্যে অচিরকালে সমাপ্ত হয়ে গেল তার তরঙ্গাভিঘাত অন্য দেশে আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে কতদিন? দার্শনিক ভিত্তিভূমিও এঁদের সুদৃঢ় ছিল না। মনে হয়, ডাডাবাদের পরবর্তী আন্দোলন অর্থাৎ 'সুর্-রিয়ালিজ্ম্'ই রবীন্দ্রানুজ কবি-সাহিত্যিকদের প্রভাবিত করেছিল বেশী। এঁদের মধ্যে আবার কবি জীবনানন্দ দাশ তাঁর কবিতায় এই প্রভাবকে স্বীকার করেছিলেন সর্বাধিক। তার প্রমাণ আছে 'বনলতা সেন' ও 'মহাপৃথিবী'র অনেক কবিতার চিত্রকল্পের মধ্যে। ব্রেতোঁ বা মাক্স আর্নস্ত প্রকৃত ও অপ্রকৃত, ধ্যান ও কর্মের যে সম্মিলনকে বলেছিলেন 'সুপার-রিয়াল' বা 'অধিবাস্তব' তারই প্রকাশ দেখি জীবনানন্দ-কর্তৃক 'ঘোড়া', 'হাঁস', 'ইঁদুর' ও 'পেঁচা'কে প্রতীকরূপে ব্যবহারের মধ্যে। কখনও দেখি শ্রাবস্তীর কারুকার্যের সঙ্গে জীবনানন্দের শেফালিকা বোসের হাসি একাকার হয়ে যায়; কখনও দেখি তাঁর চোখের সামনে ভূমধ্যসাগরের কিনারের একটি প্রাসাদে ভেসে ওঠে একখানি 'নগ্ন নির্জন হাত'; অথবা, কবি 'দুই স্তর অন্ধকারের ভিতর ধূসর মেঘের মত' প্রবেশ করেন 'সেই মুখের ভিতর'। অন্যত্র ভিন্ন প্রসঙ্গে কবি তাঁর অনুভবকে প্রকাশ করেছে এইভাবে—'আমার হৃদয় পৃথিবী ছিঁড়ে উড়ে গেল,/নীল হাওয়ার সমুদ্রে স্ফীত মাতাল বেলুনের মতো গেল উড়ে'। এই রকম অজস্র আপাত অসংগতের ব্যবহার জীবনানন্দের কবিতায় প্রতীক-

ধর্মকে ব্যাপ্তি দিয়েছে, এবং স্বপ্ন ও বাস্তবের সীমা লঙ্ঘন করে কোন কবি যে কাব্যের জগতে বাস্তবের তর্জনী-সংকেতকে অনায়াসে অস্বীকার করতে পারেন সেই সত্য উদ্ঘাটিত করেছে। ১৩৪৫-এর একটি প্রবন্ধে ('কবিতার কথা') জীবনানন্দ লিখছেন, 'আমি বলতে চাই না যে, কাব্যের সঙ্গে জীবনের কোনো সম্বন্ধ নেই; সম্বন্ধ রয়েছে—কিন্তু প্রসিদ্ধ প্রকট-ভাবে নেই।' এবং 'সাধারণত বাস্তব বলতে আমরা যা বুঝি তার সম্পূর্ণ পুনর্গঠন তবুও কাব্যের ভিতর থাকে না: আমরা এক নতুন প্রদেশে প্রবেশ করেছি।......সৃষ্টির ভিতর মাঝে মাঝে এমন শব্দ শোনা যায়, এমন বর্ণ দেখা যায়, এমন আঘ্রাণ পাওয়া যায়, এমন মানুষের বা এমন অমানবীয় সংঘাত লাভ করা যায়—কিংবা প্রসূত বেদনার সঙ্গে পরিচয় হয়, যে মনে হয় এই সমস্ত জিনিসই অনেকদিন থেকে প্রতিফলিত হয়ে কোথায় যেন ছিল; এবং ভঙ্গুর হয়ে নয়, সংহত হয়ে, আরো অনেকদিন পর্যন্ত, হয়তো মানুষের সভ্যতার শেষ জাফরান রৌদ্রালোক পর্যন্ত, কোথাও যেন রয়ে যাবে।' কাব্যজন্মের এই ব্যাখ্যা অনেকটাই সুর্-রিয়ালিস্টদের ব্যাখ্যার ধার ঘেঁষে যায়। এখানে কাব্যরচনার ক্ষেত্রে বাস্তবকে মেনেও এমন এক গভীর অন্তর্লোকের অস্তিত্বের কথা বলেছেন তিনি যেখান থেকে নেমে আসে স্বপ্ন। এই স্বপ্ন-বাস্তবের মিলিত জগৎই পাশ্চাত্যের সুর-রিয়ালিস্টের জগৎ।

গ ॥ অস্তিত্ববাদ

স্বপ্ন ও কর্মজগৎকে নিয়ে সুর্-রিয়ালিস্ট-এর এই যে জগৎ সেখানে আপাত-সত্যের ঊর্ধ্বে রয়েছে ভিন্ন ধরণের সত্যের অস্তিত্ব। সুর্-রিয়ালিস্টদের কাছে, যা দেখেছি, যা পাচ্ছি, যা করছি তা যেমন সত্য; তেমনি যা ভাবছি, যা চাইছি, যা স্বপ্নে দেখছি তা-ও তেমনি সত্য। কিন্তু মনে হয়, সত্যের এই অর্থ-ব্যাপকতা অনেক সময় জীবনকে ভরিয়ে তোলে উৎকণ্ঠায়; ক্লান্তির ভারে ন্যুব্জ করে দেয় বেঁচে থাকার সুন্দর মুহূর্তগুলিকে। আবার এই উৎকণ্ঠা যেহেতু মনের, এই ক্লান্তিও যেহেতু মনের, তাই মনের গভীরে তার গোপন সঞ্চার ধীরে ধীরে মনের মধ্যে 'শূন্যতা'র বীজ বপন করে। এই 'শূন্যতা'র বোধ থেকেই কি

জীবনানন্দের 'আট বছর আগের দিন' কবিতার সেই মানুষটি যার 'বধূ শুয়ে ছিল পাশে—শিশুটিও ছিল,/প্রেম ছিল, আশা ছিল' তা সত্ত্বেও নিশ্চিন্ত নিদ্রার জন্য 'লাশকাটা ঘরে'র টেবিলে শুয়ে সমস্ত ক্লান্তির মোচন ঘটাতে গেল ? মর্মের গভীরে গোপনচারী এই শূন্যতাবোধের ক্রিয়া এত অধিক যে, এক সময় মনে হয় 'আমি তারে পারিনা এড়াতে,/সে আমার হাত রাখে হাতে ;/সব কাজ তুচ্ছ হয়,—পণ্ড মনে হয়,/সব চিন্তা—প্রার্থনার সকল সময়/শূন্য মনে হয়,/শূন্য মনে হয়'।[১] এই জাতীয় অন্তর্লীন শূন্যতাবোধ-হেতু মনের গোপনে রক্তাক্ত হওয়ার দুর্বিসহ যন্ত্রণা কোল্‌রিজের 'Dejection: An Ode' (১৮০২) কবিতায় প্রকাশ পেয়েছিল এইভাবে—'A grief without a pang, void, dark, and drear/A stifled, drowsy, unimpassioned grief,/which finds no natural outlet, no relief,/In word, or sigh, or tear.' ব্যক্তিমানুষের মনোলোকের এই শূন্যতাবোধ এবং সঙ্গে সঙ্গে জীবনের সুনির্দিষ্ট পরিধি অতিক্রমণের দুর্নিবার বাসনাই (তা সে আত্মহননের পথে সম্ভব হলেও) পাশ্চাত্ত্যে বিশেষ দার্শনিকতত্ত্বে রূপ নিচ্ছিল উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে। অবশ্য পরিপার্শ্বের সঙ্গে ব্যক্তির দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক-জাত শূন্যতাবোধ আরও অনেক আগে সাহিত্যে রূপ নিয়েছিল, অন্ততঃ ষোড়শ-সপ্তদশ শতক থেকে।

শেক্‌স্‌পীয়রের 'রাজা লীয়রে'র অন্তরে তোষামোদ-প্রিয়তার মিথ্যা যবনিকা ছিন্ন করে কনিষ্ঠা কন্যা কর্ডেলিয়ার নিঃস্বার্থ অনুরাগ যখন সত্যরূপে প্রতীত হ'ল তখনই লীয়র প্রকৃত সত্যের জগতে উপস্থিত হয়েছিলেন, যদিও তখন তিনি উন্মাদ। এবং উন্মাদ লীয়রের জগৎ আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের পরিচিত জগৎ নয়। এই পরিচিত জগতের ভাষায় টলস্টয়ের সেই উন্মাদ[২] মানুষটি জীবনের সমস্যার কি আনন্দজনক সমাধান খুঁজে পেল যখন তার হৃদয়ের গভীরে গুমরে ওঠা যন্ত্রণার হাত থেকে নিস্তার লাভ করল গির্জার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা ভিখারীদের মধ্যে নিজের সমস্ত অর্থ নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে ? সেই দিন সেই মুহূর্তে অদ্ভুত এক মুক্তি ও স্বাধীনতার আনন্দে আপ্লুত হ'ল তার মন।[৩] মৃত্যুর দ্বারা সীমাচিহ্নিত আমাদের এই জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত মানুষকে যে ভীতি ও যন্ত্রণায় কাতর করে রাখে তার হাত থেকে ব্যক্তিমানুষ নিরুদ্বেগ মুক্তি কামনা করে। কিন্তু যে জগতে 'যক্ষ্মার রোগীর মত ধুঁকে মরে মানুষের মন ! / জীবনের চেয়ে সুস্থ মানুষের নিভৃত মরণ' অথবা 'দেহ ঝরে-ঝ'রে যায় মন / তার আগে'[৪]

সেই জগতে সত্যসন্ধানী মানুষের নিভৃত চিন্তন একই সঙ্গে এই প্রশ্ন ও বিস্ময়ে কম্পিত হয় 'তবু কেন এমন একাকী? / তবু আমি এমন একাকী?' এই 'একাকী'-ত্বের মর্মান্তিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে পারে না বাইরের কোন শক্তি*, কারণ এই যন্ত্রণার জন্মভূমি ব্যক্তিমানসের গভীর লোক। এই 'একাকী'-ত্বের যন্ত্রণা থেকেই কি একদিন দেহ-পসারিণী জননীর সন্তান Cinci* মর্মান্তিক আঘাত করে বসল তারই সমবয়স্ক একটি কিশোরকে? অথবা, রবার্ট মুশিলের (১৮৮০-১৯৪২) 'মুশ্ ব্রাগার' নিম্নশ্রেণীর পতিতার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য জুগুপ্সা-ব্যঞ্জক হত্যার পথ ধরেছিল এবং মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার পর ঊর্ধ্ববাহু হয়ে বিচারালয়েই ঘোষণা করেছিল 'আমি তৃপ্ত'? অথবা, বিপরীত দিক থেকে সার্ত্র-র 'The Room' গল্পের পিয়ের ও তার পত্নী ইভ আরও গভীরভাবে নিঃসঙ্গতার সঙ্গসুখে বিভোর হয়ে অন্য সকলের মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্পর্কেই সন্দেহ প্রকাশ করে আপনাদের জীবনের সঠিক অর্থ পরস্পরের মধ্যে সন্ধান করতে বসল?

যেদিন নীৎসের জরথুষ্ট্র ঘোষণা করেছিলেন, পুরাতন ঈশ্বর মৃত;' এবং বিজ্ঞানের নিত্যনতুন আবিষ্কারের ফলে উদ্ভাসিত হয়েছিল অভিজ্ঞতা-বহির্ভূত বহু সত্য, মানুষ নিজের পায়ের তলার মাটি হারিয়ে নিজেকে এক জন্ম-মৃত্যু-পরিবেশ ও অতীতের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ইচ্ছাশক্তি-বহির্ভূত প্রাণীরূপে খুঁজে পেয়েছিল, সেদিন থেকে আপনার অস্তিত্বের প্রশ্নেই বিব্রত হতে লাগল সে। যে সমাধানহীন যন্ত্রণায় কোন্ রজ নৈরাশ্য-পীড়িত হয়ে পড়েছিলেন, ব্যক্তিমানুষের সেই নিতান্ত নিভৃত বেদনাবোধের মধ্যে তার আপন অস্তিত্ব-ভাবনা যে কত প্রবল ছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেল একশ্রেণীর দার্শনিকের নতুন জীবন-জিজ্ঞাসায়। দার্শনিক কিয়ের্কেগার্ডের (১৮১৩-১৮৫৫) সাহায্যে, ব্যক্তিমানুষের গুরুত্বকে তিরস্কার করে এতদিন পর্যন্ত যে ঈশ্বরপ্রেম ও দার্শনিকতত্ত্ব গড়ে উঠেছিল, তার বিরুদ্ধে গড়ে উঠল নতুন দর্শন 'অস্তিত্ববাদ।' যদিও কিয়ের্কেগার্ড নিজেও ছিলেন ঈশ্বরবাদের পৃষ্ঠপোষক, তবু ব্যক্তিসম্পর্কহীন প্রচলিত নীতি-নিয়মের অস্বীকৃতি এবং ব্যক্তিমনের জিজ্ঞাসা ও সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরতার দ্বারা অস্তিত্ববাদের গোড়াপত্তন করলেন দর্শনের জগতে।

কিয়ের্কেগার্ড-এর পর ঈশ্বরের অনস্তিত্বে বিশ্বাসী, অতিমানবে আস্থাশীল, শোপেনহাওয়ার-এর ভাবশিষ্য নীৎসে পশ্চিমী-সভ্যতার সম্মুখ থেকে পুরাতন নীতি

ও মূল্যবোধের আবরণ খসেপড়ায় উদ্ভূত নতুন পরিস্থিতিতে এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হলেন, কোন কিছুরই অপরিবর্তনীয় চিরস্থায়ী রূপ বা মূল্য নেই এবং মানুষকে মানতে হবে যে, সমস্ত জীবনই ক্রমাগ্রসরশীল ও বিবর্তনীয় ; অতএব বিশুদ্ধ চূড়ান্ত রূপ নেই কোন বস্তুর। যেহেতু এই জগতে ঈশ্বর অনুপস্থিত এবং মানুষের জীবন নিষ্ঠুরতা, মিথ্যাচার, বৈপরীত্য এবং প্ররোচনায় গড়া, অতএব এই জীবনকে সুসহ করার জন্য ভিন্ন জগতের ভাবনায় তুষ্টি নয়, এই জগতের উপরেই সুন্দরের একটি মোহময় যবনিকার ব্যবস্থা করতে হবে। শিল্প ও সাহিত্যই এই যবনিকা। নীৎসের নন্দনতত্ত্বে মায়া বা মোহবিস্তারই শিল্পের মূল লক্ষ্য। সাহিত্য অবাস্তবের এক অলৌকিক বিভা গড়ে তোলে পাঠকের সম্মুখে। কিন্তু তাই বলে নীৎসের পাঠক এত বিমূঢ় ন'ন যে, শিল্পের জীবন যে 'ইল্যুশন' মাত্র তা তিনি বোঝেন না। তাঁর 'The Birth of Tragedy' গ্রন্থে Hans Sachs-এর কয়েকটি পঙক্তি উদ্ধার করেছেন নীৎসে, যার ব্যঞ্জনা হচ্ছে—কবির কাজ হবে স্বপ্নের জগৎকে অর্থময় ও সুসংলগ্ন করে তোলা এবং স্বপ্নে প্রতিভাসিত সত্যকে বিগ্রহ দান করা। কিন্তু এই স্বপ্নের জগতে বিচরণ-মুহূর্তেও আমরা সচেতন থাকব যে, এ শুধুই স্বপ্নই, ঘটমান বাস্তব জীবন নয়। ...এ জগতের বাইরে সুখ ও সৌন্দর্যের একটি পৃথক জগতের অস্তিত্বই যখন নেই তখন অনির্দেশের জন্য মিথ্যা আকুতি নয়, বাস্তবকেই অলৌকিক সৌন্দর্যে মধুময় করে ক্ষণেকের জন্য হলেও সুসহ করে তুলতে হবে শিল্পের মাধ্যমে। বাস্তব যেহেতু দুঃখময় অতএব শিল্পে সেই বাস্তবের পুনরুজ্জীবন আপত্তিকর। গ্রীক নাটকের মধ্যে নীৎসে এ্যাপোলোনীয় এবং ডাইনোসীয় (তথা স্বপ্ন ও প্রমত্ততার) দ্বিধার অবসানে জাত এক শিল্পমূর্তি লক্ষ্য করে স্রষ্টা ও জাতি হিসেবে গ্রীকদের মধ্যে ঈর্ষ্যণীয় উপাদান খুঁজে পেয়েছিলেন। মোটকথা, যথার্থশিল্পের ভূমিকা অলৌকিক মায়ার জগৎ রচনা করা, এই ছিল অস্তিত্ববাদী নীৎসের ধারণা। এই ধারণা থেকেই তিনি শ্লেগেল-এর কোরাস সম্পর্কিত ধারণাকে (কোরাস হচ্ছে আদর্শ দর্শক) অপণ্ডিত-শোভন অসংস্কৃত ধারণা বলে ঘোষণা করলেন। তাঁর মতে, কোরাস হচ্ছে দর্শক ও নাটকের চরিত্রের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য বাধার প্রাচীর, পাঠকের অস্তিত্ব ও নাটকের মায়ার জগতের মধ্যে বিভেদ-ঘোষণাকারী। শ্লেগেল -এর তত্ত্ব যদি গ্রহণীয় হয় তাহলে মানতে হবে, শিল্পের জগৎ ও বাস্তব জগতের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। কিন্তু নীৎসের বক্তব্য হল, 'Art is not an

imitation of nature but its metaphysical supplement raised up beside it in order overcome it.'[৮] শিল্পের মাধ্যমে মায়ার জগৎ রচনা সম্পর্কে নীৎসের বক্তব্যের গুরুত্ব কিছুটা হ্রাস পেয়েছিল ষোল বছর পরে প্রকাশিত 'Twilight of the Idols' (১৮৮৮) গ্রন্থে, যদিও শিল্প সম্পর্কে তাঁর মৌলিক ধারণার কোন পরিবর্তন ঘটে নি। ঈশ্বরহীন পার্থিব-জীবনকে সহনীয় করে তোলার দায়িত্ব আছে এবং সেটা সম্ভব হয় এ্যাপোলোনীয় স্বপ্নালুতার দ্বারা নয়, ডাইনোসীয় প্রমত্ততার দ্বারা। এই প্রমত্ততা জন্ম দেয় একধরণের মানসিক উল্লাস। এই উল্লাসের মধ্যে মানুষ শুধু প্রাচীন দুঃখ বিস্মরণের অব্যর্থ ভেষজের সন্ধান পায় না, সন্ধান পায় সম্ভাব্য যন্ত্রণার হাত থেকে নিস্তারের উপায়। অস্তিত্ববাদী নীৎসে জীবন ও শিল্পকে এমন এক সম্পর্কে সংযুক্ত করলেন যার ফলে বাস্তববাদীদের বাস্তব-জীবনের সঠিক চিত্র-রূপায়ণে মনোযোগ নিন্দিত হ'ল এবং রূপসচেতন সর্বভারমুমুক্ষু কলাকৈবল্যবাদীও কোন প্রশ্রয় পেলেন না।

অতঃপর বর্তমান শতকের প্রথমার্দ্ধেই ঘটে গেল দু'দুটি বিশ্বযুদ্ধ। সমগ্র বিশ্ব বিজ্ঞানের ধ্বংসাত্মক চেহারা লক্ষ্য করল সোৎকণ্ঠ বিস্ময়ে। গত শতকে বিজ্ঞানী ম্যাক্সওয়েল (১৮৩১-১৮৭৯) নিউটনীয় বিজ্ঞানকে বর্জন করে প্রাকৃতিক জগৎ সম্পর্কে একটি নতুন সূত্রের সন্ধান দিয়েছিলেন তাঁর 'ফিল্ড থিওরি'তে। —প্রতিটি অণু-পরমাণুর মধ্য থেকে স্বাভাবিক ও নির্দিষ্টহারে বিকীরিত তড়িৎ-চৌম্বকীয় তরঙ্গের উপর নির্ভরশীল প্রাকৃতিক পদার্থে গড়ে উঠেছে এই জগৎ। ম্যাক্সওয়েল-এর এই তত্ত্বে মাধ্যম হিসেবে নির্ভার 'ইথার'-এর অস্তিত্ব কল্পনা করা হয়েছিল। কিন্তু 'ফিল্ড থিওরি' আধুনিক পদার্থ-বিদ্যার জগতে বিরাট পদক্ষেপ হলেও বিশ শতকে আইনস্টাইন-এর আপেক্ষিক-তত্ত্ব ও প্লাঙ্ক-এর কোয়ান্টাম-তত্ত্ব বিজ্ঞানের জগতে নতুনতর বিস্ময় উন্মোচিত করে দিল। অন্যদিকে পেনিসিলিন ও সালফা-ঘটিত ওষুধ দুরারোগ্য ব্যাধির যন্ত্রণা দিল অনায়াসে দূর করে। ধীরে ধীরে সমস্ত বিশ্বজগৎ মানুষের কাছে তার অজ্ঞাত রহস্যের দ্বার উন্মোচিত করে দিতে লাগল এবং দূর দূরান্তের মানুষ হয়ে দাঁড়াল নিকটতম প্রতিবেশীর মত। কিন্তু বিজ্ঞানের এই সমস্ত অভিনব আবিষ্কারে কি আসে যায় সাধারণ মানুষের? পরমাণু বিজ্ঞানের জগতে কে তিনি আইনস্টাইন জানতে চায় না সাধারণ মানুষ। ভীতিবিহ্বল মানুষ শুধু বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করেছে হিরোসিমা ও

নাগাসাকির মর্মান্তিক পরিণতি, মনের মধ্যে তার সঞ্চারিত হয়েছে তীব্র নৈরাশ্য ও অসহায়ত্ব-বোধ, অনুভব করেছে সে স্বল্পসংখ্যক প্রাচুর্যভারক্রান্ত মানুষের ভোজনশালার চতুর্দিকে অসংখ্য ক্ষুধার্ত মানুষের বেদনাদায়ক উপস্থিতি। বিজ্ঞানের বিস্ময়কর সমুন্নতি সাধারণের মনের গভীরে জাগিয়ে তুলল ব্যক্তিগত অস্তিত্ব-রক্ষার প্রশ্ন। এল. এস. ডি বা মারিজুয়ানা ক্ষণেকের জন্য সম্ভব হলেও কতক্ষণ মানুষকে ভুলিয়ে রাখতে পারে তার দিন যাপনের আর প্রাণধারণের গ্লানি? বিজ্ঞানী হাইজেনবার্গ ঠিকই বলেছেন, এই উপগ্রহের মানবসভ্যতার ইতিহাসে এই প্রথম মানুষ আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে, এই পৃথিবীতে সে কতটা নিজেতে সীমাবদ্ধ ও অসহায়, তার না আছে মিত্র, না আছে শত্রু। ....এই যন্ত্রণা দায়ক পরিস্থিতিতে পীড়িত মানুষ উপলব্ধি করে 'Between the hammers lives on/our heart; as between the teeth the tongue'[৯] অথবা, 'অর্থ নয়, কীর্তি নয়, স্বচ্ছলতা নয়—/আরো এক বিপন্ন বিস্ময়/আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে খেলা করে;/আমাদের ক্লান্ত করে/ক্লান্ত—ক্লান্ত করে'।[১০] এই বিপন্ন বিস্ময়ের ক্লান্তিকরতা থেকে মুক্তি কোথায়? যখন মানুষ প্রতিনিয়ত নিজের সঙ্গে পরিপার্শ্বের এবং নিজের কর্মের সঙ্গে নিজের ইচ্ছার বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণা থেকে ভুগছে, কোন এক যান্ত্রিক নিয়মের অন্ধদাসত্বের ফলে নিজেও পণ্য উৎপাদনের যন্ত্রে পরিণত হচ্ছে, কোন কিছু ইচ্ছা করার স্বাধীনতাও হারিয়ে ফেলছে তখন হাসার্ল (১৮৫৯-১৯৩৮) ও হাইডেগার (১৮৮৯-)-এর ভাবশিষ্য জাঁ পল সার্ত্র তাঁর সাহিত্যকর্মে ও দার্শনিক প্রবন্ধে ভাগ্য, বংশানুগতি, ফ্রয়েডীয় 'অবচেতনের' অনিবার্য প্রভাব সব কিছু অস্বীকার করে ব্যক্তি-মানুষের স্বাতন্ত্র্য ও অস্তিত্বের সার্থকতা ও মূল্য ঘোষণা করলেন এই বলে—মানুষ নিজেই নিজের কর্তা, নিজের জীবনকে সে নিজে যতটুকু গঠিত করে তোলে তার জীবন ততটুকুই। তাঁর গোয়েট্জ্[১১]-এর মুখে অস্তিত্ববাদীর বাণীই উদ্ঘোষিত হ'ল—'The silence is God. The absence is God, God is the loneliness of man. There was no one but myself; I alone decided on evil; and I alone invented God........If God exists, man is nothing; if man exists'....[১২] অতঃপর গোয়েট্জ্ জানিয়েছে 'God does not exist'। কিন্তু যেহেতু ঈশ্বরের অস্তিত্বে এবং অনস্তিত্বে মানুষের অনস্তিত্বে ও অস্তিত্ব

নির্ভরশীল, অতএব ঈশ্বরই যখন নেই তখন এটাই একমাত্র সত্য যে, মানুষ আছে। দুঃখ যত তীব্রই হোক, অস্তিত্ব যত বিপন্নই হোক, যত সস্তাই হোক যে এই পৃথিবীতে আমরা এসেছি 'Only for once. Once and no more. ···And never, Again'[১০] তবু এ কথাও তো ঠিক যে, এ জীবন বর্জনীয় নয়।

মিথ্যাচার, নিষ্ঠুরতা, প্ররোচনা ও প্রবঞ্চনায় ভরা ঈশ্বরহীন পৃথিবীর ঊর্ধ্বে গ্লানিহীন, দৈন্যহীন এক স্বর্গীয় জগৎ গড়ে উঠবে শিল্প-সাহিত্যের মাধ্যমে, এই ছিল নীৎসের ধারণা। সুতরাং জীবন-বিচ্ছিন্ন ভাবালুতা অথবা আত্ম-হননেচ্ছার দিকে আকর্ষণ ছিল না নীৎসের। তাঁর মতে, প্রতিটি মানবই এক অতিমানবের অগ্রদূত এবং সৌন্দর্যের আস্তরণে আবৃত মানব-জীবনের সত্যমূর্তি রূপায়ণই শিল্পীর লক্ষ্য। নীৎসের পর জার্মান-অধিকৃত ফরাসী দেশের মুক্তিকামী নাগরিক সার্ত্র যেহেতু মনে করতেন, শিল্পীর দায়িত্ব হচ্ছে ব্যক্তিগত ভাবে সমকালীন সমস্যা সম্পর্কে সজাগ থাকা, শিল্পসৃষ্টির উদ্দেশ্যই হচ্ছে জগতের সঙ্গে আমাদের সঠিক সম্পর্কের সত্যতা উদ্ঘাটিত করা, বাহ্য-প্রকৃতির বৈপরীত্য ও বিশৃঙ্খলা দূর ক'রে মনের ঐক্য আরোপ ক'রে তাকে শিল্পসম্মত ক'রে তোলা অতএব জীবন-সত্যের বস্তু বিশ্লেষণ ছাড়া সার্ত্র-র সাহিত্যিকের কর্তব্য কি? কিন্তু মানবজীবনে কী সেই প্রকৃত 'সত্য' যা কিনা সাহিত্যের বিষয়বস্তুরূপে গণ্য হতে পারে? প্রপঞ্চবাদী হুসার্ল এর ভাবশিষ্য সার্ত্র (যদিও সার্ত্র 'Transcendental Ego'তে আস্থাশীল ছিলেন না) ফ্রয়েডীয় অবচেতনে সম্পূর্ণ অনাস্থা প্রকাশ ক'রে সেই বস্তুকেই আমাদের জীবনের 'সত্য' বলে ঘোষণা করেছিলেন যা আমাদের চেতনলোকে স্পষ্ট ও গ্রাহ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু বস্তুজগতের সঙ্গে আমাদের চেতনার সম্পর্ক হচ্ছে দ্বন্দ্বমূলক। বস্তু ছাড়া যদিও বিচ্ছিন্নভাবে চেতনার অস্তিত্ব সম্ভব, চেতনা ছাড়া বস্তুর অস্তিত্ব সম্ভব নয়, অর্থাৎ চেতনলোকই বস্তুজগতের অস্তিত্বের প্রধান সাক্ষ্যদাতা। সার্ত্র, দুই জাতীয় চেতনার কথা বলেছেন; একটি হচ্ছে 'প্রাক্-আত্মবাচক চৈতন্য' যার সহায়তায় কোন বস্তু সম্পর্কে আমাদের সরল জ্ঞান জন্মে, এবং অপরটি হচ্ছে 'আত্মবাচক চৈতন্য' যার সাহায্যে কোন বস্তু সম্পর্কে আমাদের সচেতনতা বিষয়ে আমরা সজ্ঞান হই। কিন্তু এই 'আত্মবাচক চৈতন্য' কদাপি যে-বস্তু সম্পর্কে আমরা সচেতন সেই বস্তুর সঙ্গে একাকার হতে পারে না। আমরা

শুধুমাত্র আমাদের চেতনায় যা এসেছিল সেই বিষয় সম্পর্কে সজ্ঞান হতে পারি। কিন্তু বস্তু ও চেতনার এই স্বরূপ ও সম্পর্ক পরিবর্তিত হয়ে যায় অপরের অস্তিত্বের ফলে। একই সঙ্গে কোন ব্যক্তি দর্শক হিসেবে 'অহং' এবং অপরের কাছে নিছক বস্তুরূপে গণ্য হতে পারেন। বিষয়ী ও বিষয়ের কোন অপরিবর্তনীয় স্বরূপ নেই। বরং একের স্বাধীনতা অপরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিমিত, যদিও স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্মেই মানুষের প্রকৃত অস্তিত্বের সার্থকতা, চেতনলোকের গুরুত্বের স্বীকৃতি, জীবনের সত্যতার প্রতিষ্ঠা। শিল্পীর দায়িত্ব এই জীবন-সত্যের সন্ধান ও রূপায়ণ। তাঁকে প্রয়োজনে প্রাত্যহিক সত্যকে আবৃত করতে হবে তথাকথিত মিথ্যার আবরণে। এইভাবে শিল্পকে গড়ে তোলার জন্য শিল্পীকে সচেতন স্বাধীন ব্যক্তির ভূমিকা পালন করতে গিয়ে প্রায়-ঈশ্বরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়। যদিও সার্ত্র উপন্যাসের পৃষ্ঠায় লেখকের সর্বময়তার বিরুদ্ধে সরব হয়ে মোরিয়াকের সমালোচনা করে বলেছিলেন—একথা বলার সময় এসেছে আজ যে, ঔপন্যাসিক ঈশ্বর নন; কিন্তু সার্ত্র-র স্বাধীন ইচ্ছা-শক্তি সম্পন্ন ঔপন্যাসিক যিনি নিজের ইচ্ছানুযায়ী বিষয়বস্তু নির্বাচন করেন তিনিও কি এক অর্থে ঈশ্বর-সদৃশ ন'ন? শুধু তাই নয়, তাঁর 'The Age of Reason'-এ ম্যাথুর চিন্তা ও সংকল্পের কি তাঁরই স্রষ্টার অস্তিত্ব অনুভব করা যায় না? ডব্লু. জে. হারভে তাঁর একটি প্রবন্ধে এই বিষয়ে ঠিকই বলেছেন, তাত্ত্বিক হিসেবে সার্ত্র শিল্পীর সর্বময়তার সমালোচনা করলেও কার্যতঃ নিজের সৃষ্টির ক্ষেত্রে সেই তত্ত্বকে নিজেই খণ্ডন করেছেন।

সাহিত্যের একদিকে লেখক, অন্যদিকে পাঠক, একজন দাতা, অপরজন গ্রহীতা। মাধ্যম ভাষা। সাহিত্যিক যে ভাষার মাধ্যমে তাঁর অভিজ্ঞতা, আবেগ বা অনুভূতি প্রকাশ করেন, পাঠকের কাছে তা হচ্ছে তাঁর ভাবের উদ্দীপক বস্তুমাত্র। এই ভাষা-মাধ্যমের উদ্দীপনাই পাঠককে সাহায্য করে লেখকের বক্তব্যের গভীরে প্রবেশ করতে। লেখক ও পাঠকের মধ্যে দাতা ও গ্রহীতার যে সম্পর্ক আছে, সেখানে দাতা লেখক যদিও সর্বত্র নিজের প্রজ্ঞা, ইচ্ছা ও পরিকল্পনার মুখোমুখি হয়ে থাকেন[১১] তবু যে-সাহিত্য তিনি রচনা করেন তা তিনি নিজের জন্য করেন না। সার্ত্র-র অভিমত হচ্ছে, সাহিত্যিকের লক্ষ্য পাঠক-সমাজ এবং লেখক ও পাঠকের সমবায় সম্বন্ধেই লেখকের মনোজগতের সত্য বাস্তব-রূপ লাভ করে। শিল্পের জগতে শিল্পীর সর্বময় প্রভুত্ব মানেন না

সার্ত্র্‌। লেখকের 'অটোনোমি' অস্বীকার করে সার্ত্র্‌ মেনে নিলেন পাঠক বা রসিকেরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। বললেন, এ কথা সত্য নয় যে, কোন সাহিত্যিক নিজের জন্য কোন কিছু লেখেন……অপরের দ্বারা এবং অপরের জন্য ছাড়া কোন শিল্প বা সাহিত্যই নেই। সার্ত্র্‌-র নন্দনতত্ত্বে রসিকের এই গুরুত্বই সার্ত্র্‌-র অসাধারণ বৈশিষ্ট্য যা তাঁর পূর্বসূরী অস্তিত্ববাদী নীৎসেও ভাবেন নি। রসিক-সমাজের উপর এই জাতীয় গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন ভারতীয় রসবাদীরাও। তাঁদের মতে, রসিক ছাড়া রসের অস্তিত্ব নেই এবং রস পাঠকের অন্তরেই অভিব্যক্তি লাভ করে থাকে। পাশ্চাত্ত্য নন্দনতত্ত্বের জগতে স্বয়ং অ্যারিস্টটলও যে 'ক্যাথারসিস' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন ট্রাজেডি প্রসঙ্গে, সেখানে তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন দর্শক বা পাঠকের উপরেই। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও ভারতীয় রসবাদীরা কবিকে জানতেন বিশ্বস্রষ্টারূপে, দ্বিতীয় ঈশ্বররূপে, যিনি নিজের জগৎকে ইচ্ছামত রূপান্তরিত করার অধিকারী; এবং অ্যারিষ্টটলও রচয়িতার গুরুত্ব স্বীকার করেছিলেন নানা প্রসঙ্গে। কিন্তু সার্ত্র্‌ বিষয়-নির্বাচন ও শিল্প রূপায়ণে লেখকের স্বাধীনতা স্বীকার করলেও তাঁর 'সর্বময় প্রভুত্ব' মেনে নেন নি, এমন কি লেখক ও পাঠক উভয়ের দায়িত্ব স্বীকার করেও সৃষ্টির মূল-ভার অর্পণ করেছিলেন লেখক নয়, পাঠকের উপরেই। তাঁর মতে, লেখকের দায়িত্ব 'প্রকাশ' করা আর পাঠকের দায়িত্ব 'সৃষ্টি' করা। যে ডস্টয়েভস্কি 'ক্রাইম এ্যাণ্ড পানিশমেন্টে'র রাসকলনিকভ চরিত্রের জন্মদাতা তিনি শুধু রাসকলনিকভ-কে তাঁর কল্পলোক থেকে বাইরের জগতের মানুষের কাছে প্রকাশ করেছিলেন মাত্র, কিন্তু রাসকলনিকভের প্রকৃত অস্তিত্ব স্রষ্টা পাঠকের হৃদয়ে। সার্ত্র্‌-র এই সিদ্ধান্ত প্রমাণ করে যে তিনি মনে করতেন, পাঠকের মনোলোকই সাহিত্যের প্রকৃত জন্মভূমি। অর্থাৎ সার্ত্র্‌-র মতে, ভাষায় সমর্পিত হওয়ার পর লেখকের ব্যক্তিগত অনুভূতি ক্রমে বিশুদ্ধ একটি বস্তু (en-soi)-তে পরিণত হয়, যা বিভিন্ন দর্শক বা পাঠকের মনের আলোকে উজ্জ্বল হয়ে বিভিন্ন রূপে প্রতিভাত হতে পারে। সুতরাং এই সিদ্ধান্তই অনিবার্য যে, অস্তিত্ববাদী সার্ত্র্‌ সাহিত্যের কোন 'অ্যাবসোলিউট ভ্যালু' মানেন না, ব্যক্তির চেতনলোককেই মনে করেন বস্তুর গুণাগুণ নির্ণয়ের প্রকৃত অধিকারী। একই সাহিত্যকর্ম বিভিন্ন পাঠকের কাছে বিভিন্ন তাৎপর্য নিয়ে সার্থক হয়ে ওঠে, কারণ পাঠকের

ব্যক্তিগত অভিরুচি, বাসনা, সহানুভূতি ও অভিজ্ঞতার দর্পণেই সাহিত্যের রূপ প্রতিবিম্বিত হয়। সাহিত্যিকের ভূমিকা যেখানে অনুপ্রেরিত ব্যক্তির অনুরূপ এবং তাঁর অন্তর্গত চিন্ময়-সত্যের প্রকাশই তাঁর লক্ষ্য সেখানে পাঠক সাহিত্যের প্রতিটি শব্দের ভিতর থেকে তাঁর সমগ্র ব্যক্তিত্বের সহায়তায় এক নতুন জগৎ মনের ভিতর সৃষ্টি করে তোলেন। সাহিত্যকর্ম পাঠকের সম্মুখে বস্তুরূপে সমর্পিত হওয়ার পর পাঠকের চিন্মানে থেকে তা নবজন্ম লাভ করে। অর্থাৎ সাহিত্যরূপে জন্মের পূর্বে যা ছিল বস্তুজগতের উপাদান, সাহিত্যিকের হৃদয়ে এসে তা হ'ল তাঁর ভাবলোকের সত্য, অতঃপর সাহিত্যিক সাহিত্যকর্মরূপে যখন তাকে রূপায়িত করলেন, তা পরিণত হ'ল নিছক বস্তুতে, এবং অবশেষে পাঠকের হৃদয়ে নতুন ভাবমূর্তিতে তার ঘটল নবজন্ম। সুতরাং শব্দ বা ভাষার মধ্যবর্তিতায় সাহিত্যিক তাঁর অনুভূতিকে সমর্পণ করেন পাঠকের স্বাধীন বিচারশক্তির কাছে। আবার যেহেতু সার্ত্র-র কাছে পাঠকই প্রকৃত সাহিত্যস্রষ্টা, অতএব সাহিত্যের চরিত্রের সার্থকতা পাঠকের সঙ্গে ঐক্যে, তাই লেখক যখন নিজের সৃষ্টি আস্বাদ করতে অগ্রসর হন তখন লেখক হিসেবে যে-অনুভূতির অধিকারী ছিলেন তিনি, সেই অনুভূতি আর থাকে না তাঁর, ফলে আর সকলের মতই তিনি তখন সাহিত্য-বিচারকমাত্র! সাহিত্যের জন্মদাতা-বিধাতা লেখক ন'ন। লেখক 'appreciates the effect of a touch, of an epigram, of a well placed adjective, but it is the very effect they will have on others. He can judge it, not feel it'. মোট কথা, সার্ত্র-র ব্যাখ্যানুযায়ী সাহিত্যিক ও পাঠকের সহযোগিতায় যে-সাহিত্যজগৎ সম্পূর্ণতা লাভ করে সেখানে যদ্যপি লেখক নির্বাসিত ন'ন তথাপি সাহিত্যের প্রকৃত অস্তিত্ব পাঠকের স্বীকৃতিতে। একটি উপমার আশ্রয়ে তিনি জানিয়েছেন—যদিও একটি আনন্দদায়ক প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে আমি বুঝি যে, আমি এই দৃশ্যের রচয়িতা নই, তবু আমি জানি আমার চোখের সামনে গাছ-পাতা-ঘাস-মাটির ঐক্যমূর্তির সৌন্দর্য সম্ভব ছিল না আমি ছাড়া। ঠিক তেমনি পাঠকের স্বীকৃতি ছাড়া সম্ভব নয় সাহিত্যের অস্তিত্ব, যত আগ্রহেই লেখক তাকে প্রকাশ করুন না কেন।

নীৎসে সাহিত্যের ভিতর ইহজগতেই এমন অলৌকিক সৌন্দর্য ও আনন্দের সন্ধান পেয়েছিলেন যেখানে ঈশ্বর-বিযুক্ত পৃথিবীর অশান্ত মানুষ বিশ্রাম লাভ করতে

পারে। অতএব সাহিত্য ছিল না তাঁর কাছে বাস্তবের 'অনুকরণ' মাত্র। পরাধীন ফ্রান্সের স্বাধীনতা-কামী সাহিত্যিক-দার্শনিক সার্ত্রও সাহিত্যের মধ্যে বিশৃঙ্খল জগতের সুবিন্যস্ত শৃঙ্খলিত মূর্তি কামনা করেছিলেন। আবার সার্ত্র যদিও সাহিত্যিকের সমকাল-চেতনার মর্যাদা স্বীকার করেছিলেন, তবু শিল্পের চূড়ান্ত মূল্য যেহেতু নির্ণীত হয় পাঠকের হৃদয়ে এবং স্বাধীন সৃষ্টিশক্তির অধিকারী পাঠকের সৃজন-কৌশলের উপরেই সাহিত্যের অস্তিত্ব ও মূল্য নির্ভর করে অতএব তাঁর কাছেও সাহিত্য তথা শিল্প নিছক অনুকরণধর্মী নয়। অস্তিত্ববাদী দার্শনিক সার্ত্র যেমন নিমিত্তবাদে আস্থাশীল ছিলেন না, তেমনি নন্দনতত্ত্বেও তিনি শিল্পের চরম মূল্য, শিল্পী-বিধাতার কাছে নয়, রসিকের কাছে সন্ধান করেছিলেন। শিল্পীর ব্যক্তিমানুষের স্বাধীন ইচ্ছার মত, তাঁর কাছে, রসিকের স্বাধীন ইচ্ছাও কম মূল্যবান নয়। সর্বোপরি সাহিত্যিকের জগৎ, তিনি আশা করেন, এমন এক জগৎ হবে যে-জগৎ প্রাত্যহিক সংসারের সমস্ত মানুষের কাছে মনে হবে, এ তার মোটেও অপরিচিত নয়—'The function of the writer is to act in such a way that nobody can be ignorant of the world and that nobody may say that he is innocent of what it is all about ?'[১৫]

নীৎসে ও সার্ত্র, এই দুই অস্তিত্ববাদী দার্শনিকের সাহিত্য সম্পর্কে বক্তব্য এবার সূত্রাকারে সাজানো যেতে পারে :—

(ক) যদিও লেখক সমকাল-সচেতন, তবুও তাঁর সাহিত্যে তিনি গড়ে তুলবেন এক মায়ার জগৎ, চির-পরিচয়ের মাঝে নব-পরিচয়ের জগৎ।

(খ) সাহিত্য বাস্তবের হুবহু অনুকরণ নয়।

(গ) বিষয়-নির্বাচনে স্বাধীন ইচ্ছা-বিশিষ্ট সাহিত্যিক ঈশ্বরের মতোই স্বাধীন, যদিও তাঁর সর্বজ্ঞতা ও সর্বময়তা স্বীকার্য নয়।

(ঘ) সাহিত্যিক সাহিত্যকর্মকে দৃষ্টিগোচর করান, কিন্তু সাহিত্যের প্রকৃত স্রষ্টা হচ্ছেন পাঠক। পাঠকের চেতনলোকেই সাহিত্যের প্রকৃত অস্তিত্ব।

(ঙ) সাহিত্যের রচয়িতা হিসেবে লেখকের স্বাধীনতা যতটা, সাহিত্যের আস্বাদক ও বিশ্লেষক হিসেবে পাঠকের স্বাধীনতা তার চেয়ে বেশী ছাড়া কম নয়।

(চ) সাহিত্যিকের শেষ লক্ষ্য কলাকৈবল্যবাদীদের সুরম্য আশ্রয়লোক নয়। নীৎসে ও সার্ত্র প্রবঞ্চনা, মিথ্যাচার ও অর্থহীনতায় গড়া এই জীবনে অর্থপূর্ণ

সামগ্রিক ঐক্য সন্ধান করেছিলেন শিল্প-সাহিত্যের মায়ার জগতে। এই মায়া (ইল্যুশন)-সৃষ্টির প্রধান শিল্পরূপ হিসেবে নীৎসে গ্রহণ করেছিলেন ট্র্যাজেডিকে। যেহেতু অস্তিত্ববাদী দার্শনিক ঘটমান জগতের সত্যে নয়, বিষয়ীগত বাস্তবতায় ছিলেন আস্থাশীল, সুতরাং তাঁদের কাছে সত্যের অর্থই হচ্ছে অন্তর্গত সত্য। কিন্তু 'অস্তিত্ববাদী' মানুষের আয়ত্তাতীত অলৌকিক সার্বভৌম কোন সত্তায় আস্থাহীন, অতএব তাঁদের 'বিষয়ীগত বাস্তবতা' রহস্যময় স্বর্গলোকের সংকেত-জ্ঞাপক নয়। তা ছাড়া নীৎসে যে-গ্রীক নাটক সম্পর্কে এত সপ্রশংস সেই গ্রীক নাটকও জাগতিক নিয়মনীতির বিরুদ্ধাচরণ করে নি, বরং জাগতিক ন্যায়-নীতি-অনুসারী এই সত্যই প্রতিষ্ঠিত করেছে যে, কোন অন্যায়কর্মই অপুরস্কৃত থাকে না। বস্তুতঃ এই জগৎ অভাব ও দৈন্যে ভরা বলেই নীৎসে সেই অভাব ও দৈন্য বিস্মৃত হওয়ার জন্য সাহিত্যের মাধ্যমে অলৌকিক মায়ার জগৎ রচনার কথা বলেছিলেন। জগৎ অপূর্ণতায় ভুগছে বলে মরলোকেই ভবিষ্যতের সুখ-স্বপ্নে বিভোর থাকতে হবে, নীৎসের অভিমত তা ছিল না। এই জগতের দুঃখকে 'ইল্যুশনে'র আবরণে আবৃত করে সুসহ করে তুলতে হবে এই ছিল নীৎসের বক্তব্য।[১০] অথচ তিনি বিশুদ্ধ আনন্দ, কলাকৈবল্য প্রভৃতি শব্দে আগ্রহী হতেন বলে মনে হয় না। নীৎসে এই প্রত্যয়ে দৃঢ় ছিলেন যে, জগৎ একটাই আছে এবং সেই জগৎ মিথ্যাচার, অর্থহীনতা, প্ররোচনা এবং বিপরীতের সমবায়ে গঠিত, কিন্তু তা-ই বলে জগদতীত স্বর্গলোকের কল্পনা সঠিক নয় এবং সেই জগতের আশ্রয়ও কাম্য নয়। নীৎসে, পূর্বেই বলেছি, শোপেনহাওয়ারের ভাবশিষ্য এবং জীবন ও জগৎ সম্পর্কে প্রচলিত অর্থে 'নৈরাশ্যবাদী' অথচ 'সুপারম্যানে'র অগ্রদূত প্রতিটি মানুষের অপরিসীম সম্ভাবনায় বিশ্বাসী। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে ভারতীয় দার্শনিকেরাও বহু নৈরাশ্যের কথা শুনিয়েছেন, বলেছেন জগৎ মিথ্যা, কিন্তু যেহেতু ঈশ্বরের অনস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন না, তাই জগৎ মিথ্যার সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন 'ব্রহ্ম সত্য' কথাটি। ভারতীয় আলংকারিকেরাও সাহিত্যকে উপমিত করেছেন জগৎ-স্রষ্টার সঙ্গে এবং যে রস-সৃষ্টিতে কাব্য-নাটকের চূড়ান্ত সিদ্ধি সেই 'রস'ও এঁদের কাছে ব্রহ্মাস্বাদ-তুল্য। কিন্তু দুঃখপীড়িত জগতে কাব্য-কবিতা অলৌকিক রসসৃজনে সার্থক হলেও কবি বস্তু-জগৎকে সহনীয় করে তোলার জন্যই ইহজগতের উপর মায়ার অন্তরাল রচনা করবেন, এই বিশ্বাস তাঁদের ছিল না। মোট কথা, সাহিত্যের জগৎকে 'মায়ার জগৎ' বলে নীৎসে

ভারতীয় আলংকারিকদের কাছাকাছি এলেও এঁদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য ছিল মৌলিক। অস্তিত্ববাদী দর্শনের জন্মের পিছনে একালের বস্তুবিজ্ঞানের সফল বিজয়-অভিযান এবং দীর্ঘকালীন ঈশ্বর-বিশ্বাসের অপমৃত্যু ছিল কারণ হিসেবে বর্তমান। কিন্তু ভারতীয় আলংকারিকদের ক্ষেত্রে সেই জাতীয় বাস্তব কারণের ছিল নিতান্তই অভাব। তাছাড়া, এ জগৎকে সুসহ করার জন্যই শিল্পের এই মায়া যবনিকার প্রয়োজনীয়তা, এ রকমের বাস্তবজীবন-ভিত্তিক সাহিত্যবোধও ছিল না তাঁদের। গ্রীক ট্রাজেডি সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল নীৎসে ট্রাজেডির মধ্যে 'ইলুশন' সৃষ্টির চেষ্টা খুঁজে পেয়েছিলেন। কিন্তু ভারতীয় আলংকারিকেরা 'করুণ রসে'র মহিমা কীর্তন করলেও নাটকে 'ট্রাজেডি'র অস্তিত্ব স্বীকার করেন নি। নীৎসে ও সার্ত্র-র মত অস্তিত্ববাদীদের সঙ্গে ভারতীয় আলংকারিকদের সাদৃশ্য এইখানে যে, (ক) এঁদের সকলের মতেই কাব্য-সাহিত্যের জগৎ অলৌকিক মায়ার জগৎ; এবং (খ) সাহিত্যের জগতে পাঠক বা রসিকের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী।...যদিও অ্যারিস্টটলও 'ট্রাজেডি' আলোচনা প্রসঙ্গে দর্শকের ভূমিকার গুরুত্ব স্বীকার করেছিলেন, তবু তাঁর 'ট্রাজিক প্লেজার'-এর অসাধারণত্ব ব্যাখ্যা যত চমকপ্রদই হোক না কেন, পাঠক বা দর্শকের হৃদয়ে রসাভিব্যক্তির যে সূক্ষ্ম-প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করেছিলেন অভিনবগুপ্তাচার্য, সমগ্র পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যদর্শনে তার কোন তুলনাই নেই। পাঠকের সত্যোপলব্ধির জগতেই সাহিত্যের প্রকৃত জন্ম, অস্তিত্ববাদী সার্ত্র-র এই বিশ্বাসের মূলে ছিল তাঁর 'বিষয়ীগত বাস্তবতা'য় আস্থা। সার্ত্র ছিলেন পাঠকের মনের সৃজনধর্মের উপর শ্রদ্ধাশীল। শিল্পের জগতে স্রষ্টার ভূমিকা সম্পর্কে হেগেলীয় শ্রদ্ধা তাঁর ছিল না। হেগেল, শিল্পীকে মনে করতেন এমন একজন মানুষ, যিনি একই সঙ্গে 'মহানচিত্ত' ও 'বিশাল হৃদয়ে'র অধিকারী। অবশ্য ঐক্যহীন, অশান্ত, খণ্ডীভূত জগতের বৈচিত্র্যের মধ্য থেকে সার্ত্র-র 'শিল্পী' কল্পনার সহায়তায় অখণ্ড শিল্পমূর্তি গড়ে তোলেন, 'implicit meaning of the world' উদ্ঘাটিত করেন, পাঠকের সৃজনশক্তি উদ্রিক্ত করেন। সুতরাং তিনিও একেবারে নগণ্য নন। কিন্তু সাহিত্যিকের ভূমিকা নগণ্য না বললেও সার্ত্র সাহিত্যিকের শ্রেষ্ঠত্ব কিছুটা খণ্ডিত করেছেন ঠিকই। আবার যে-পাঠকের চিৎশক্তির উপর তাঁর এত আস্থা সেই পাঠককেও যে পুনঃপুনঃ কাব্য-পাঠের দ্বারা নিজেকে প্রস্তুত করতে হয় সেই দিকেও (ভারতীয় আলংকারিকের ভাষায় 'তন্ময়ীভবন যোগ্যতা') কোন আলোকপাত করেন নি।

সাহিত্য-বিচারে সমালোচকের বা পাঠকের স্বতন্ত্র স্বাধীন বিচারক্ষমতার উপর গুরুত্ব আরোপ এবং নিজের সৃষ্টির রসাস্বাদনে লেখকের বা ভক্তে সমালোচক ব্যক্তিত্বের জাগরণে বিশ্বাস, সাত্র্-র নন্দনতত্ত্বে দুটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অস্তিত্ববাদীদের সম্পর্ক ভিন্ন গবেষণার বিষয়, তবু সাত্র্-র মতের সদৃশ রবীন্দ্রনাথের একটি মন্তব্য এখানে উদ্ধার করা যেতে পারে : 'কাব্যের একটা গুণ এই যে, কবির সৃজনশক্তি পাঠকের সৃজনশক্তি উদ্রেক করিয়া দেয় ; তখন স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে কেহ বা সৌন্দর্য, কেহ বা নীতি, কেহ বা তত্ত্ব সৃজন করিয়া থাকেন।...কাব্য হইতে কেহ বা ইতিহাস আকর্ষণ করেন, কেহ বা দর্শন উৎপাটন করেন, কেহ বা নীতি কেহ বা বিষয়জ্ঞান উদ্ঘাটন করিয়া থাকেন, আবার কেহ বা কাব্য হইতে কাব্য ছাড়া আর কিছুই বাহির করিতে পারেন না—যিনি যাহা পাইলেন তাহাই লইয়া সন্তুষ্ট চিত্তে ঘরে ফিরিতে পারেন. কাহারও সহিত বিরোধের আবশ্যক দেখি না, বিরোধে ফলও নাই।'[১৭] অভিরুচি অনুযায়ী কাব্য থেকে ইতিহাস, নীতি বা দর্শনের মর্মার্থ সন্ধানের স্বাধীনতা আছে প্রত্যেক স্বাধীন ইচ্ছা-বিশিষ্ট পাঠকের, রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্যই সাত্র্-র 'বিষয়ীগত বাস্তবতা'-তত্ত্বের ভিত্তিতে নতুন করে ব্যাখ্যা লাভ করল।

অস্তিত্ববাদী দর্শনের মূল ভিত্তি ছিল জীবনবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। রিল্কের প্রশ্নেই অস্তিত্ববাদীর প্রত্যয় ঘোষিত হয়েছিল—শুধু একবার, মাত্র একবারের জন্য যে পৃথিবীতে এসেছি সেখানে হৃদয় যত ব্যথিতই হোক না কেন 'can it ever be cancelled ?' জীবনকে বরবাদ করতে চান নি নীৎসে বা সাত্র্ কেউই। এই জীবনবাদী দৃষ্টিকোণ থেকেই সাত্র্ বলেছেন, সাহিত্যিকের দায়িত্ব পাঠকের পরিচিত জগৎকেই তার সামনে মেলে ধরা, তবে যথাযথরূপে নয়, মনের রসায়নে নতুন বিগ্রহ দান ক'রে। নীৎসের ধারণাও এর থেকে বিশেষ পৃথক কিছু ছিল না। যে জগতের বাসিন্দা আমরা নই, সেই জগৎ চিরকালই এক ধরণের আকর্ষণ বিস্তার করে, যার মূলে থাকে রোমান্টিক ভাবপ্রবণতা। কিন্তু এহেন স্বপ্নের জগতে মানুষ প্রায়শঃই প্রবঞ্চিত হয়। তাই নীৎসে এবং সাত্র্ সাহিত্যিককে হতে বলেছেন জীবনমুখী ও ইহসচেতন। তাছাড়া এই অস্তিত্ববাদী দার্শনিকেরা জীবনের উপরিতলের বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে শিল্পে সংহত করার পক্ষপাতী, এবং যে মানুষকে মনে হয় এক একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের

বাসিন্দা এবং সদাসর্বদা আত্মসংগ্রামে লিপ্ত সেই মানুষের জীবন শিল্পীমানসের স্পর্শে নবপরিচয়ে সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে, এই ছিল তাঁদের কামনা। মোট কথা, 'অস্তিত্ববাদী' সাহিত্যে সমকালচেতনা কামনা করেন অথচ তথাকথিত বাস্তবের অনুকরণ পছন্দ করেন না। শিল্পের জগৎকে ইহলোকের নির্ভেজাল অনুকরণ মনে করেন না অথচ কল্পনার স্বেচ্ছাবিহারও সমর্থন করে না এবং সর্বোপরি লেখকের চেয়ে পাঠককে কম স্বাধীন বা সৃজনশীল মনে করেন না। কিন্তু মনে হয়, নতুন কালের শিল্পীর শিল্পরূপের নবীনত্বের দিকে 'অ্যাবসাডিস্ট্' দের যে ধরণের জাগ্রত দৃষ্টি ছিল, অস্তিত্ববাদীরা সে ব্যাপারে নিরুত্তর ছিলেন ; 'ফর্ম' সম্পর্কে তাঁদের উল্লেখযোগ্য কোন মন্তব্য চোখে পড়ে না।

ঘ ॥ 'অ্যাবসার্ড'বাদ

একত্রিশতম জন্মদিনে বিনাপরাধে অভিযুক্ত 'জোসেফ কে' জ্যোৎস্নারাত্রে নির্বাক দুই ঘাতকের হাতে যখন নিঃশব্দে প্রাণ হারালো, তখন তার মুখ দিয়ে বিস্ময় ও ঘৃণা-মিশ্রিত একটি কথাই বের হয়েছিল 'Like a dog' ?[১] বস্তুতঃ বিচার যখন প্রহসন মাত্র, স্নেহ-ভালবাসার সম্পর্কগুলি নিতান্তই আর্থিক সুযোগ সুবিধার উপর নির্ভরশীল, অনুভূতিহীন মানুষগুলি গদ্গদভাষণে আত্মপ্রতারণায় তৎপর তখন একটা কুকুর, একটা গণ্ডার[২] অথবা চেতনাহীন একটা পোকার[৩] সঙ্গে মানুষের জীবনের তফাৎ থাকে কোথায় ?

আলবেয়ার ক্যামু তাঁর ১৯৪২ সালে প্রকাশিত Le Mythe de Sisyphe (The Myth of Sisyphus) গ্রন্থে অবিশ্বাস ও সহায়-সম্বলহীনতায় গড়ে-ওঠা একালের এই জীবনের মূল্যসম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন—যুক্তি দিয়ে যে-জগতের কার্য-কারণ বিশ্লেষণ করা যায় তা যত ত্রুটিপূর্ণই হোক, আমাদেরই পরিচিত জগৎ। কিন্তু যে-জগতে মানুষ অকস্মাৎ তার সমস্ত মোহ ও আনন্দ হারিয়ে ফেলেছে, সেখানে সে নিজেকে মনে করে একজন বহিরাগত। তার এই নির্বাসনের যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি নেই, কারণ সে যেমন হারিয়েছে তার পুরাতন মাতৃভূমির স্মৃতি, তেমনি সে আশাহত ভবিষ্যৎ-জীবন সম্পর্কেও। মানুষের সঙ্গে তার জীবনের এই বিচ্ছিন্নতার বেদনা থেকে জন্ম নেয় absurdity'র

বোধ। সুতরাং সাহিত্যের জগতে 'অ্যাবসার্ড' শব্দের প্রবর্তক ক্যামু 'হাস্যকর' অর্থে শব্দটি ব্যবহার করেন নি।

কাফ্‌কা সম্পর্কে লিখিত একটি প্রবন্ধে ইওনেস্‌কো 'absurd'-এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে—যা উদ্দেশ্যহীন তাই অ্যাবসার্ড। ধর্ম, অতীন্দ্রিয়লোক ও অধিবিদ্যা-প্রদত্ত আশ্রয় থেকে চ্যুত আজকের মানুষ নিজেকে হারিয়ে ফেলায় অর্থহীন, অপ্রয়োজনীয় ও অ্যাবসার্ড হয়ে গিয়েছে তার সমস্ত প্রয়াস ও কর্ম। পুরাতন মূল্যবোধের এই বিপর্যয় এবং বিশ্বাস ও মোহের বাস্তভূমি থেকে নিবাসিত মানুষের যন্ত্রণাকাতরতা, বিজ্ঞানের নিত্য নব সকল অভিযান সত্ত্বেও মানবতা-বিরোধী ধ্বংসাত্মক তাণ্ডবনৃত্য মানুষকে ধনতান্ত্রিক সমাজবিন্যাস ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলাফল সম্পর্কে আশাহত করে দিয়েছে গত এক শতক থেকেই। তারই এক ধরণের প্রকাশ আমরা দেখেছি কিয়ের্কেগার্ড-নীৎসে-হাসার্ল-হাইডেগারের দর্শনে এবং সার্ত্র-র দর্শন ও সাহিত্যচিন্তায়। এই অস্তিত্ববাদী দার্শনিকেরা চতুর্দিকের অসামঞ্জস্য ও অর্থহীনতার মধ্যে জীবনের একটি চূড়ান্ত মূল্য সন্ধানে কেউ হয়ত প্রাচীন প্রথানুশাসন ও গির্জার প্রভাবমুক্ত ব্যক্তিমানুষের একক ধর্মবিশ্বাসে আস্থা প্রকাশ করেছেন, কেউ বা সত্তা বা Essence-কে অস্বীকার করে মানুষের অস্তিত্ব বা Existence-কেই প্রধান করে দেখিয়েছেন। অর্থাৎ প্রাচীন প্রথার ধর্মচর্চা যেমন তিরস্কৃত হ'ল, তেমনি ব্যক্তির উপর অসাধারণ কোন শক্তিমানের নিয়ন্ত্রণ অস্বীকার করে ব্যক্তিকেই তার নিজের স্রষ্টার মহিমা দান করা হ'ল। কিন্তু এর ফলে সংঘবদ্ধ মানুষের দ্বারা গঠিত সমাজের কোন শক্তির মর্যাদা যে স্বীকৃত হ'ল তা-ও নয়। সমগ্র অস্তিত্ববাদী দর্শন ব্যক্তি-কেন্দ্রিক Subjective-idealism-এর ভিত্তির উপরেই আপনার প্রতিষ্ঠার সিংহাসন স্থাপন করল। যেহেতু পুরাতন ঈশ্বরের মৃত্যু ঘটেছে, অতএব একক মানুষই তার নিজের সাম্রাজ্যের সম্রাট এবং ঈশ্বর নিজেই। কিন্তু অস্তিত্বের প্রশ্নে এককের মূল্য যত গুরুত্বপূর্ণই হোক, জীবন-যাপনের দিক থেকে একক মানুষ কতটা সম্পূর্ণ? সার্ত্র কি এই প্রশ্ন থেকেই একদা মার্ক্সবাদের সমর্থক হয়েছিলেন এবং অস্তিত্ববাদ ও মার্ক্সবাদ-এর মাঝামাঝি রফা বন্দোবস্ত করতে অগ্রসর হয়েছিলেন? এ ব্যাপারে তাঁর যুক্তি যত দুর্বোধ্য বা অস্পষ্টই হোক না-কেন, সার্ত্র, এ কথা ঠিক, তাঁর অস্তিত্ববাদী দর্শনকে মানববাদ থেকে পৃথক করে দাঁড় করান নি। বস্তুতঃ অস্তিত্ববাদী দার্শনিকেরা

অসীম শক্তিধর কোন অলৌকিকে আস্থাশীল বা সঙ্ঘবদ্ধ সামাজিক-জীবন সম্পর্কে উৎসাহী না হলেও একক ব্যক্তির অনন্ত সম্ভাবনা সম্পর্কে সুনিশ্চিত এক সুদৃঢ় প্রত্যয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। নতুবা নীৎসে মৃত ঈশ্বরের স্থলাভিষিক্ত করলেন কেন তাঁর কল্পিত 'সুপারম্যান' বা 'অতিমানব'কে? এমন কি আলব্যের ক্যামু যিনি ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের এক সাক্ষাৎকারে নীৎসের দর্শনকে স্বীকার করা অপেক্ষা সংশোধনেই আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন বেশী এবং তাঁর "The Myth of Sisyphus'-এ সত্য, শিব ও সুন্দরের পিয়াসী মানুষের জীবনে নৈরাশ্যব্যঞ্জক পরিণতিকেই ঘোষণা করেছিলেন অনিবার্য সত্য হিসাবে, (বলেছিলেন 'Everything which exalts life adds at the same time to its absurdity') সেই তিনিও 'The Myth of Sisyphus'-এই আত্মহত্যাকে চিহ্নিত করেছিলেন কাপুরুষের সিদ্ধান্ত রূপে। তাছাড়া আপন অন্তরের সত্যবোধ ভিন্ন প্রচলিত নীতি সম্পর্কে এক বিদ্রোহাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি রক্ষার গুরুত্ব মেনেছিলেন এবং 'Outsider'-এ Meursault-এর সঙ্গে ধর্মযাজকের কথোপকথনে ফুটিয়ে তুলেছিলেন জীবনাতীত জীবনেও এই জীবন সম্পর্কে মিউরসল্টের মত (অনিচ্ছাকৃত ভাবে এক দুর্ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়া) সাধারণ এক মানুষের আগ্রহকে ('A life in which I can remember this life on earth. That's all I want of it.')। তবে মিউরসল্টের এই জীবনাসক্তি জীবনের প্রচলিত ছক বা মূল্যবোধের সঙ্গে একতানবদ্ধ নয়। জীবন, মৃত্যু, যৌনাচার সবকিছুকে সে দেখেছে এক নিরাসক্তের বক্র দৃষ্টিকোণ থেকে। মৃত্যুর দিকে প্রধাবিত এই জীবনে কি তফাৎ আছে স্বাভাবিক মৃত্যুর সঙ্গে অপরকে হত্যা করে ফাঁসিকাঠকে বরণ করার মধ্যে? কি আসে যায় যদি তার প্রেয়সী মেরী তার অন্য কোন পুরুষ বন্ধুকে চুম্বন করে? এই দর্শনে বিশ্বাসী মিউরসল্ট নিঃসন্দেহে প্রচলিত ছন্দে-বাঁধা জীবনে একজন বহিরাগত ব্যক্তি; ধর্মোপদেশ, প্রেয়সী সম্পর্কে আকর্ষণ যাকে সকলের জীবনের দিকে উন্মুখ করে তুলতে পারে নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও কারু-র মতে ক্যামু'র 'The outsider is not at all a morbid book, it is a violent affirmation of health and sanity, there is no monsters, no rapes, no incest, no lynchings in it, it is the reflection on the whole, of a

happier society.' ('The Outsider'-এর ইংরেজী সংস্করণের পরিচিতি-অংশে Cyril Cannolly-র মন্তব্য : ১৯৪৬) ।

ক্যামু-র 'Outsider'-এ অধিকতর সুখী সমাজজীবনের সংকেত Cannolly খুঁজে পেলেও সার্ত্র প্রসঙ্গতঃ ক্যামুর দর্শনকে 'Philosophy of the absurd' বলেই অভিহিত করেছিলেন। এই দর্শনের জন্ম, সার্ত্র বলেছেন, মানুষের সঙ্গে পৃথিবীর সম্পর্ক-চিন্তা এবং মানুষের ইচ্ছার ব্যর্থতার ভাবনা থেকে। বস্তুতঃ নীৎসে বা সার্ত্র-র মত অস্তিত্ববাদীই হোন আর ক্যামুর মত absurdist-ই হোন এরা সকলেই সমকাল, সমাজ-জীবন ও মানুষের মূল্য সম্পর্কে সচেতন অর্থাৎ এক কথায় জীবনবাদী। জীবন সম্পর্কে বোধ এবং প্রশ্নের তফাৎ যাই হোক-না কেন। নীৎসের সমালোচক হলেও তাঁর 'The Myth of Sisyphus' এবং 'The Rebel'-এ ক্যামু নীৎসের মন্তব্য উদ্ধার করেছেন এবং এমন কথাও বলেছেন যা অনায়াসে নীৎসের কণ্ঠেও শোভা পেত। আসলে জীবনের কোন পরম মূল্য সম্পর্কে ক্যামু বা নীৎসে সংশয়াচ্ছন্ন থাকলেও এঁদের জীবনবোধ বা সাহিত্যবোধ সবই ইহলৌকিক। অতিমানব (superman) এবং বাহিরাগত (outsider) উভয়েই রক্তমাংসের সাধারণ মানুষ। শুধু 'Outsider'-এ নয়, 'The Plague' এর বার্ণার্দ রিউ (Rieux) রক্তমাংসের মানুষ, সংগ্রামী মানুষ, প্রেম-প্রীতি-দুঃখ-সুখে আন্দোলিত মানুষ। প্লেগের হাত থেকে সদ্যমুক্ত Oran-এর জনসাধারণের উল্লাস লক্ষ্য করে ব্যক্তিসুখ সম্পর্কে অচেতন মানবপ্রেমিক চিকিৎসক বার্ণার্দ রিউ এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন—এ সুখ ক্ষণস্থায়ী, ভঙ্গুর, কারণ প্লেগের জীবাণু শেষ হয় না, লুকিয়ে থাকে বিছানায়, মদের ভাঁড়ারে, বাক্সে, আসবাব পত্রে, তথা মধ্যবিত্তের সমস্ত রকম সুখের উপকরণে। একদিন তাদের প্রকাশ হবেই কালান্তক মূর্তিতে।

এই 'প্লেগ' কী যার বীজ লুকিয়ে থাকে মধ্যবিত্তের সংস্থ সঞ্চয়ের মধ্যে, সুখাভিলাষের গোপন-গভীরে ? প্লেগ এনে দেয় মানুষে-মানুষে বিচ্ছেদ, অবিশ্বাস ও বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণা। মনে হয়, এই বিচ্ছিন্নতা এবং বঞ্চনারই আর এক নাম 'প্লেগ'। 'Outsider'-এর মত 'The Plague'-ও হয়ত Cannolly স্বাস্থ্য ও প্রকৃতিস্থ দৃষ্টিভঙ্গী খুঁজে পেতেন, যদিও 'Plague'-এর শেষে সন্দেহের ঝিলিক-টুকুও চোখ এড়িয়ে যাওয়ার মত নয়।[৪] কিন্তু মানুষের জন্য রিউ-এর সংগ্রাম, এ তো শুধু তাঁর ব্যক্তিগত সুখের জন্য নয়, এর পিছনে আছে সমাজ ও সাধারণ

মানুষ সম্পর্কে ভালোবাসা। রিউ নিঃসন্দেহে বিদ্রোহী (rebel) যিনি শেষপর্যন্ত স্নেহময়ী জননী এবং প্রেয়সী পত্নীকে হারিয়েও oran-কে প্লেগ-মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। রিউ-এর জীবনদর্শন তাঁর স্রষ্টার মুখ থেকে স্পষ্ট শোনা গেল: 'instead of killing and dying in order to produce the being that we are not, we have to live and let live in order to create what we are'. আত্মহনন বা নরহত্যা কোনটাই প্রকৃত বিদ্রোহীর লক্ষণ নয়, বেঁচে থাকা এবং বাঁচতে দেওয়াই প্রকৃত সংগ্রাম। সুতরাং মৃত্যুশাসিত জীবনে ইচ্ছামৃত্যু লাভ করাও এক ধরণের ব্যক্তি-স্বাধীনতা, অস্তিত্ববাদীদের এই ধারণা। 'এ্যাবসার্ডিস্ট' ক্যামুর ছিল না। ক্যামুর মতে সেই সিসিফাস সুখী যিনি টারটারাসের ঢালু পাহাড়ের উপর একখানি পাথর গড়িয়ে তুলতে গিয়ে বারবার শুধু নিষ্ফল শ্রম করেছেন, কিন্তু ভাগ্যোদ্যম হন নি।

কোন শিল্পীই বাস্তবকে সহ্য করে না—নীৎসের এই মন্তব্যের সঙ্গে কামু যোগ করে দিলেন এই মন্তব্য ('That is true, but no artist can ignore reality')[৫]—হ্যাঁ, একথা সত্য বটে, কিন্তু এও ঠিক যে কোন শিল্পীই reality-কে অস্বীকার করেন না। শিল্পকর্ম হচ্ছে একই সঙ্গে এই জগতের ঐক্য এবং বর্জন সম্পর্কে কামনা। বর্জন কামনার কারণ এই জগতের অপূর্ণতা। শিল্পী রোমান্টিকদের নির্জন গিরিশৃঙ্গের বাসিন্দা বা নীৎসের 'একক মহিমান্বিত ঐশ্বর্যের' অধিকারী নন। তিনি ইহসচেতন, এবং জীবনের সংগতি ও ঐক্য-বিধাতা। শিল্পী জগতের উপরে মায়াযবনিকা বিস্তার করেন না, তার ভিতরকার অসংগতিকে ঐক্যমূর্তি দান করেন। শুধুমাত্র অস্বীকৃতির দ্বারা কোন শিল্প রচনা সম্ভব নয়। অর্থহীন বস্তুও যেমন কোন না-কোন তাৎপর্য সূচিত করে তেমনি কোন শিল্পই জন্ম নিতে পারে না যার কোন তাৎপর্য নেই। ইহজগতেই সুন্দরকে সৃষ্টি করা সম্ভব এবং তা করতে গেলে একই সঙ্গে বাস্তবের কিছু বর্জন এবং কিছু উপাদানকে মহিমান্বিত করতে হবে। —'Art disputes reality, but does not hide from it'.[৬] অর্থাৎ শিল্পীকে ক্যামু দেখলেন, একজন নির্জনতার সঙ্গ-সুখের অভিলাষী রূপে নয়, বিদ্রোহীর বেশে। অতঃপর উপন্যাসকে আদর্শ একটি শিল্প-রূপে গণ্য করলেন। কারণ, এক্ষেত্রে লেখক বাস্তব থেকে পলায়ন না-করে বাস্তবের উপাদানকে গ্রহণ ও বর্জনের দ্বারা অখণ্ড

ঐক্যমূর্তি দান করেন। তিনি বললেন, একালের জগতে যেখানে কোন কিছুর মধ্যেই অখণ্ড একটি প্রবাহ সন্ধান করা অসম্ভব, প্রেম নেই জেনেও যখন নিপ্রেম জীবনে এক সম্পূর্ণ সুবলয়িত প্রেমের কামনা করে মানুষ, তখন নীতি-মূলক গল্পের সারবত্তা নেই যদিও, কিন্তু পৌল-বর্জিনির মত প্রেমের উপন্যাসের আকর্ষণ অনেক বেশী। মানুষের জীবনের বৈপরীত্য এইখানে যে, পৃথিবী থেকে পলায়ন করতে না-চেয়েও (মৃত্যু কামনা না করেও) পৃথিবীকে সে বর্জন করতে চায়। আসলে না-পাওয়ার বোধ থেকেই মানুষের যন্ত্রণা এবং নির্বাসনের দুঃখবোধ। উপন্যাসের জগৎ আমাদের এই পরিচিত জগৎ, মানুষগুলোও আমাদের পরিচিত। 'Their universe is neither more beautiful nor more enlightening than ours'.[১] নীৎসে বলেছিলেন, এ জগতের ঊর্ধ্বে ওঠার জন্য মিথ্যার আশ্রয় নিতে হবে আমাদের; কিন্তু এই মিথ্যাচারের ব্যাপারে অন্যতম সেরা মিথ্যাবাদী যে, সেই শিল্পীর পন্থা অবলম্বন করতে হবে। অর্থাৎ শিল্পের জগৎ শুধু মায়ার জগৎ নয়, মিথ্যার জগৎও বটে। কিন্তু সে মিথ্যায় চাতুর্য আছে। এই হচ্ছে নীৎসীয় ধারণা। কিন্তু এই মতের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন ক্যামু। ক্যামু শিল্পীর বিষয়-নির্বাচনে স্বাধীনতা, শিল্পে সুন্দরের গুরুত্ব এবং ঐক্যহীন জীবনের শিল্পে ঐক্য-রক্ষার মূল্য স্বীকার করেও মিথ্যা-চারকে শিল্পের রাজত্ব থেকে বর্জন করতে চেয়েছিলেন। গ্রহণ ও বর্জনের দ্বারা, নিছক হুবহু অনুকরণের দ্বারা নয়, শিল্পে বাস্তবের ভূমিকা সার্থক করে তুলতে হবে। প্রচলিত অর্থে বাস্তবকে গ্রহণ করার কথা বলেন নি ক্যামু। তবে স্বয়ং নীৎসে যিনি শিল্পের জগতের অলৌকিকতা স্বীকার করতেন, তিনিও যে শিল্পের জগতে স্থায়ী escape-এর কথা বলেন নি, তার প্রমাণ আছে গ্রীক-নাটক সম্পর্কে তাঁর আকর্ষণে। গ্রীক-নাটকের প্রতিটি কর্ম তার ফলের সঙ্গে এক অনিবার্য সম্পর্কে সংযুক্ত। গ্রীক-নাটক, এই জগতের তথাকথিত পাপ-পুণ্য ও জাগতিক নীতি-তত্ত্বের বিষয়ে আমাদের সতর্ক করে রাখে। গ্রীক নাট্যতত্ত্ববিদ্গণ যে-শৈল্পিক 'ক্যাথারসিস'-এর কথা বলেছিলেন তার সঙ্গে নীৎসের 'artistic intoxication'-এর সাদৃশ্য আছে অনেকখানি। আবার গ্রীক-নাটকের সিদ্ধান্ত ইহলোক-সম্পর্ক মুক্ত ছিল না। এবং নীৎসে-এর তত্ত্বেও জগৎ থেকে স্থায়ী 'escape'-এর সমর্থন ছিল না। ক্যামুও বাস্তবতার পক্ষপাতী, কিন্তু 'Crude reality'র নয়। বাস্তবে যেখানে ঐক্য নেই, শিল্পী যেহেতু সেইখানে ফাঁককে

ভরাট' ও 'আলগাকে জমাট' করে দাঁড় করান তাই তাঁকে বাস্তবজীবনের নতুন মূর্তি দান করতে হয়। রোমান্টিকদের কল্পনা-প্রবণতায় ক্যামুর বিশেষ আস্থা ছিল না, কিন্তু অন্যদিকে তথাকথিত অনুকরণের প্রতিও ছিল তাঁর অপরিসীম বিরক্তি। বাস্তবের অনুকরণ, তাঁর মতে, 'strile repetition of creation'। কোন কিছু রচনা মানেই নির্বাচন করা। অতএব অনুকরণ নিষ্ফল। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা সম্পর্কেও ক্যামুর বিরাগ অতি স্পষ্ট। সাহিত্যে রূপ ও বিষয়ের সমান মূল্য স্বীকার করতেন তিনি। প্রচারধর্মী বিষয়-প্রধান সাহিত্যের প্রতি ছিলেন বিরক্ত, যদিও একবার বলেছেন 'Beauty, no doubt, does not make revolution. But a dav will come when revolution will have need of beauty'[৮] কিন্তু প্রচলিত নিয়মের বিরুদ্ধে, সনাতন মূল্যবোধের বিরুদ্ধে, ক্যামু-র উপন্যাস, নাটক বা গল্পের নায়কেরা 'বিদ্রোহী' হলেও 'বিপ্লবী' ছিলেন না কেউ। তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক-বাস্তবতার মূল-সূত্রে অবিশ্বাসী ও মার্ক্সীয় ইতিহাস-চেতনায় আস্থাহীন ক্যামু যে বিপ্লবের সঙ্গে সৌন্দর্যের মৈত্রী সম্পর্ক স্বীকার করেন নি, তার কারণ জাগতিক অবিচারের ঊর্ধ্বে সুবিচারের আদর্শ সৃষ্টিতে মানুষের ক্ষমতায় তাঁর বিশ্বাস এবং এই সুস্পষ্ট বোধ—'To create beauty, he must simultaneously reject reality and exalt certain of its aspects'[৯] মোটকথা, একজন অ্যাবসার্ডিস্ট্ হিসেবে ক্যামু শিল্প সাহিত্যে প্রচলিত অর্থে বাস্তবতা বা সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতায় গুরুত্ব স্বীকার করতেন না, আবার শিল্পীকে পলাতকরূপেও গণ্য করতেন না; স্বীকার করতেন বিষয় ও রূপের ঘনিষ্ঠ ঐক্য-সম্পর্ক এবং সৌন্দর্যের গুরুত্ব। কিন্তু ক্যামু বিষয় ও রূপের অভিন্নতায় বিশ্বাসী হলেও এবং তাঁর উপন্যাস বা নাটকে জীবনের 'অ্যাবসার্ডিটি'কে বিষয়ীকৃত করলেও শিল্পের ক্ষেত্রে আঙ্গিকগত বিশিষ্ট রূপ রচনার প্রচলিত প্রথা বর্জন করেন নি। যদিও জীবনের বিচ্ছিন্নতাকে মানতেন, তবু তিনি শিল্পরূপের ক্ষেত্রে অ্যাবসার্ডিস্ট্-গণ নাটকে যে-কাজ করেছেন সে ধরণের কাজ করলেন না। কার্য-কারণের ন্যায়শাস্ত্রানুমোদিত সম্পর্ক তিনি রক্ষা করেছেন বরাবর। যেমন করেছেন মার্কিন ঔপন্যাসিক আর্নেস্ট হেমিংওয়ে। জীবনের খণ্ডতা ও উদ্দেশ্য শূন্যতা সম্পর্কে হেমিংওয়ে-র সিদ্ধান্তের সঙ্গে তার উপন্যাসের পূর্ণবৃত্তরূপের কোন সাদৃশ্য নেই। 'The Sun also Rises' উপন্যাসে হেমিংওয়ে জীবনের উদ্দেশ্য-

হীনতাকে তীক্ষ্ণ গদ্যে রূপ দিয়েছেন যথাযথ, কিন্তু সমগ্র কাহিনীর বিন্যাসপদ্ধতিকে 'অ্যাবসার্ড' বলা চলে না। মার্ক টোয়েন, উইলিয়াম ফকনার প্রসঙ্গেও একই সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে হয় যে, তাঁরা তাঁদের উপন্যাসের রূপে জীবনের absurdity-কে ধরতে চেষ্টা করেন নি। কিন্তু নাটকের জগতে ইওনেস্কো, আদামভ, পিন্টার, জাঁ জেনে, অ্যালবি বা আরাবেল এবং উপন্যাসের জগতে ষাটের দশকের একদল মার্কিন ঔপন্যাসিক যুক্তি ও ভাষা প্রয়োগে সনাতন ন্যায়শাস্ত্রের বন্ধন এবং সাহিত্যের স্থির আদর্শকে একেবারেই নষ্ট করে দিয়েছেন বক্তব্য প্রকাশের তাগিদে। পুরাতন উপন্যাসের মৃত্যু হয়েছে পুরাতন ঈশ্বরের সঙ্গেই, এই যুক্তি দেখিয়েছিলেন লেস্‌লি ফিড্‌লার। একালের অন্যতম মার্কিন মহিলা ঔপন্যাকি মিস সোনটাগ বললেন, অর্থহীন জীবনের উপন্যাসে নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু বা অর্থান্বেষণ অযৌক্তিক। প্রায় অনুরূপ কথাই শোনা গেল জন অল্‌ড্রিজের মুখে। তাঁর মতে, জীবনের উপরিতলের সমস্যা নিয়ে আমাদের আর চলে না। ভাবতে হয় জীবনের অন্তর্গত বিশৃঙ্খল বৈচিত্র্যের কথা। সুতরাং নতুন শিল্পরূপও এখানে একান্ত প্রয়োজনীয়।[১০] যে 'সত্য' এবং 'বাস্তব' কে নিয়ে ঔপন্যাসিকদের প্রধান কাজ সেই সত্য ও বাস্তবও মর্মান্তিক পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে প্লাঙ্ক ও আইনস্টাইনের আবির্ভাবের পর। ব্যক্তির উপলব্ধিগত সত্যই যখন চূড়ান্ত সত্য তখন সর্বজনীন নির্বিকল্প সত্য বলে তো কিছুই নেই। আপেক্ষিক-তাত্ত্বিকের মতে 'apart from the experiences of subjects there is nothing, nothing, nothing, bare nothingness.'[১১] এই বিষয়ীকেন্দ্রিক সত্যের রূপায়ণ ঘটল 'অ্যাবসার্ড' নাটকে। এই 'অ্যাবসার্ড' নাটকের নাট্যকারেরা বর্জন করলেন ট্রাজেডির আদর্শ, যেহেতু তাঁরা মনে করেন, ট্রাজেডি সেই অতীতের নাট্যকলা যখন মানুষের বিশ্বাস ছিল 'পরম একে' ও জাগতিক নীতি-নিয়মের সুশৃঙ্খলতায়। 'অ্যাবসার্ডিস্ট'গণ তাই ট্রাজেডির বদলে বরণ করলেন উদ্ভটকে, অসমঞ্জস-কে বা 'অ্যাবসার্ড'কে। গতানুগতিক নাট্যরীতির সঙ্গে এঁদের নাট্যকলার প্রভেদ ঘটল প্রধানতঃ তিনটি বিষয়ে।[১২] : (ক) সনাতন পদ্ধতির নাটকের চরিত্রগুলি নাট্যকারের দ্বারা সুপরিকল্পিত এবং সচেতন উদ্দেশ্যাভিমুখী। কিন্তু নতুন রীতির নাটকের চরিত্রগুলি যেমন খুব পরিচিত নয়, তেমনি তাদের উদ্দেশ্যও অস্পষ্ট। (খ) প্রাচীন ধরণের নাটকের পাত্র-পাত্রীর সংলাপ সুসংগঠিত, কিন্তু 'অ্যাবসার্ড' নাটকের সংলাপ যেন অর্থহীন বাজে কথা। (গ) প্রথানুগত

নাটকের কাহিনী আদ্যন্ত সুগ্রথিত হয়ে থাকে, কিন্তু 'অ্যাবসার্ড' নাটকের সূত্রপাত যে-কোন স্থল থেকে এবং সমাপ্তিও অনির্দিষ্ট লোকে।

যদিও সমস্ত নাট্যকারেরাই একধরণের শুরু বা সমাপ্তি রচনার পদ্ধতি অনুসরণ করেন নি, তবু বোধ হয় অ্যালবি ছাড়া একই জাতের অসমাপ্তির ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছেন অন্য সকলে। বেকেট-এর 'Waiting for Godot' এবং ইওনেস্কোর 'Amédée'র পরিসমাপ্তি-অংশ এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। কিন্তু অ্যালবি র 'The Zoo Story'তে জেরীর অদ্ভুত ধরণের আত্মহত্যা এবং পিটারকে বাঁচাবার জন্য চেষ্টা সমস্ত নাটকখানির বিষয়বস্তু ও সংলাপের 'অ্যাবসার্ডিটি'র বিপর্যয় ঘটিয়ে দিয়েছে যেন। পরিস্থিতিগত অস্বাভাবিকতার প্রকাশ ঘটেছে ইওনেস্কো-র 'Amédée'তে, 'Rhinoceros'-এ এবং 'The Chairs'-এ। Amédée ও Madeleine-এর নিভৃত জীবনের রহস্যময়তা, আকাশমার্গে অ্যামিডির উড্ডয়ন অথবা ডেইজি এবং বেরেঞ্জার ছাড়া আর সকলের গণ্ডারত্ব প্রাপ্তি, 'The Chairs'-এর নামগোত্রহীন বৃদ্ধ, বৃদ্ধা ও বাগ্মী ছাড়া অদৃশ্য চরিত্রগুলির অসাধারণ সক্রিয়তা এবং বাগ্মী-র অর্থহীন শব্দ-ছাড়া অন্য কোনভাবে আত্মপ্রকাশে চূড়ান্ত অক্ষমতা-হেতু তীব্র যন্ত্রণাবোধ পরিস্থিতিগত উদ্ভট অবস্থার সূচক। চরিত্রগুলির নিজস্ব পরিচয় যে কতটা রহস্যাবৃত এবং ক্রিয়াকাণ্ডেও যুক্তি বা শৃঙ্খলার কতটা অসদ্ভাব তার নমুনা মিলবে অ্যালবি-র 'The American Dream'-এ, 'The Zoo Story'তে এবং মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'রাজরক্ত' ও সন্তোষ কুমার ঘোষের 'অজাতক' নাটকে। 'The American Dream'-এর ড্যাডি ও মোমি, 'The Zoo Story'-র জেরী ও পিটার, 'রাজরক্তে'র ছেলেটি ও মেয়েটি, 'অজাতকে'র নায়ক ও নায়িকা বিশেষ কোন ব্যক্তি নয়। এরা যুগের সৃষ্টি এবং এদের নাম যে-কোন একটা হতে পারত। কিন্তু ইওনেস্কো-র মেডিলিন, অ্যামিডি, বেরেঞ্জার, ডেইজি এবং আর সকলে অনির্দিষ্ট কেউ নয়, এঁদের নির্দিষ্ট একটা গোত্রপরিচয় আছে যেন। এঁদের আচরণে যুগচিহ্ন স্পষ্ট হলেও এদের স্বতন্ত্র একটা ব্যক্তিজীবন আছে। কিন্তু মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয়ের মুহুর্মুহু রূপ-পরিবর্তন এটাই প্রমাণ করে যে, গোটা সমাজে এরাই আছে নানা মূর্তিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। আর শেষ দৃশ্যে ছেলেটির উক্তি 'বড় দেরীতে জানলুম যে একা একা যুদ্ধ হয় না' একালের যে-কোন সচেতন সংগ্রামী যুবকের উক্তি হ'তে পারে।

এ যেন বিশেষ কারুর সিদ্ধান্ত নয়। আর বাস্তবজীবনে যারা ছিল ভাস্বর ও সর্বাণী, নাটকে তারা হল বিকাশ ও বনানী এবং তাদের অভিনয়-জীবন ও বাস্তবজীবনের ভেদ ঘুচতে লাগল অনবরত। মানুষের ব্যক্তি-পরিচয়ের এই অর্থশূন্যতাই 'অ্যাবসার্ড' নাটকের অন্যতম মৌলিক পরিচয়সূত্র। কিন্তু ইওনেস্কোর যান্ত্রিকতার দিকে ঝোঁক, পিণ্টারের অর্থহীন সংলাপ রচনায় পারদর্শিতা এবং অ্যালবি-র ভাবাবেগ-প্রবণতা প্রমাণ করে এঁরা সকলেই এক রীতি বা পদ্ধতি ব্যবহার করেন নি। তবে যে বিষয়ীকেন্দ্রিক সত্যতা ও বাস্তবতা সম্পর্কে অস্তিত্ববাদীদের আগ্রহ ছিল, সেই একই দিকে আগ্রহ 'অ্যাবসার্ডিস্ট্'দেরও সকলেরই সাধারণ গোত্রপরিচয়। হয়ত এঁদের সমকালের বিজ্ঞান থেকে এঁরা সকলেই বাস্তব সম্পর্কে এই নতুন তত্ত্ব লাভ করেছিলেন। তাছাড়া, নিজেদের দেশ ও সমাজের নিষ্ঠুরতা, প্রচলিত নীতি ও মূল্যবোধের যাথার্থ্য সম্পর্কে সংশয় জাগিয়েছিল এঁদের মনে। এবং জীবনের আপাত-অসংগতি ও সামঞ্জস্য সম্পর্কে অবিশ্বাসীও করে তুলেছিল এঁদের। বেকেটের মত ইঙ্গ-আইরিশম্যান, ইওনেস্কোর মত আধা-ফরাসী ও আধা-রুমানীয়, আদামভের মত রুশ-আর্মানীয় একদা নিজেদের দেশ থেকে নির্বাসিত হয়ে বসবাস শুরু করেছিলেন ফ্রান্সের পারী-নগরীতে। এই নির্বাসনই কি একদিন তাঁদের নিজেদের সমকালীন মানুষের নিজ বাসভূমে পরবাসী হয়ে থাকার যন্ত্রণাকে নাট্যরূপ দিতে উৎসাহী করে তুলেছিল?

Artaud অ্যাবসার্ডিস্ট্দের নাটককে 'Theatre of Cruelty' অভিধায় চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন নাট্যকারদের প্রতিটি প্রচেষ্টার পিছনে আছে উদ্দেশ্য-সচেতনতা ও সমকালীন মানুষের চিন্তার উপর আঘাত হেনে তাদের জীবনসম্পর্কে সজাগ করে দেওয়ার সক্রিয় প্রয়াস। ইওনেস্কো ব্যক্তিগতভাবে তাত্ত্বিক দিক থেকে উদ্দেশ্যমনস্কতার বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন বটে, কিন্তু অ্যালবি-র মন্তব্য অনুসরণ করলে Artaud-এর বিশ্বাসের সত্যতাই প্রমাণিত হবে। অ্যালবি তাঁর 'The American Dream'-এ মার্কিন পদ্ধতির জীবন-রসিকতাকে সমালোচনা করেছিলেন এবং 'The Zoo Story'-তে ('পিটার'-এর) বুর্জোয়া সুখভোগের অর্থশূন্যতার উপর কটাক্ষপাত করেছিলেন। এবং একবার 'Transatlantic Review' পত্রিকার মুখপাত্রের সঙ্গে এক সাক্ষাতে সোজাসুজি জানিয়েছিলেন 'the responsibility of the writer

is to be a short of demonic social critic—to present the world and people in it as he sees it and say 'Do you like it? If you don't like it change it'.[১৩] অন্য আর এক প্রসঙ্গে আরও স্পষ্ট করে বললেন তিনি—নাট্যকারদের অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে জনসাধারণকে তাদের অবস্থা সম্পর্কে সচেতন করে দেওয়া এই প্রত্যাশায় যে, হয়ত তাঁরা তাঁদের অবস্থার পরিবর্তন করতেও পারেন। অ্যালবি-র এই ধারণার সঙ্গে ক্যামু বা ইওনেস্কো-র ধারণার পার্থক্য অতি স্পষ্ট। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, সমকালীন সমাজের শূন্যগর্ভতা যাঁদের বিষয়বস্তু তাঁরা কি করে সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যনিরপেক্ষ হবেন? জীবনে বিচ্ছিন্নতা আছে বলেই তাকে সাহিত্যের বিষয়ীভূত করতে হবে এই ধরণের বাস্তবানুগত্য কি শিল্পীর উদ্দেশ্য হতে পারে? জীবনে যা সম্ভব নয় তার রূপায়ণকে শিল্পীর অসততার দৃষ্টান্ত বলে গ্রহণ করা গেলেও শিল্পের জগৎ যে প্রাত্যহিক সংসার থেকে কিছুটা পৃথক্ একটি জগৎ তাও তো মিথ্যা নয়। এই জগৎ নির্মাণের জন্য শিল্পীকে নির্দিষ্ট একটি উদ্দেশ্য সামনে রেখে অগ্রসর হতেই হয়। ভাববাদীরা সেই উদ্দেশ্যকে বলেছিলেন, বিশুদ্ধ সৌন্দর্যসৃষ্টির উদ্দেশ্য, এবং অবশেষে শিল্পের সার্থকতা সন্ধান করেছিলেন শিল্পের মধ্যেই। তাঁরা সুন্দর রূপ-নির্মাণ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে সাহিত্যসৃষ্টি স্বীকার করেন নি। আনন্দই ছিল সাহিত্য থেকে তাঁদের পরম অন্বিষ্ট। কিন্তু ইওনেস্কো নিজে সুচিরপ্রচলিত আদ্যন্ত সংগতি-বিশিষ্ট সুন্দররূপের নাটক রচয়িতা না হয়েও কলাকৈবল্যবাদীদের সিদ্ধান্তই যেন সমর্থন করলেন। লণ্ডনের 'অবজার্ভার' পত্রিকা অবলম্বন করে কেনেথ টাইনানের সঙ্গে ইওনেস্কোর মতদ্বন্দ্ব চলেছিল নাটক তথা সাহিত্যের উদ্দেশ্য নিয়ে। টাইনানের মতের বিরোধিতা করতে গিয়ে ইওনেস্কো বলেছিলেন, টাইনান শিল্পীকে দেখতে চান মানবজাতির ত্রাতার ভূমিকায়। কিন্তু জগৎবাসীর কাছে ত্রাণের বাণী শোনাতে আসেন ধার্মিকেরা, নীতি-বিজ্ঞানীরা এবং রাজনীতিবিদেরা। নাট্যকার নাটকের জন্যই নাটক লেখেন, জীবন সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য দেন, নীতিকথা প্রচার করেন না। আদর্শমূলক নাটক অর্থহীন।[১৪] ইওনেস্কো মনে করতেন, যেহেতু কোন সমাজব্যবস্থা বা রাজনৈতিক অবস্থা আমাদের জীবনযন্ত্রণা থেকে বা মৃত্যুভীতি থেকে বাঁচাতে পারে না, এবং উদ্ধার করতে পারে না কামনার হাত থেকে, সুতরাং শূন্যগর্ভ আশাবাদী শ্লোগান ও গালভরা নীতিকথায় গড়ে-ওঠা এই জীবন যেমন অর্থহীন তেমনি

অর্থহীন এই জীবনে ভাবের আদান-প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় সংলাপগুলি। অতএব সাহিত্যে জীবনের খণ্ডরূপের যথার্থ ছবি ফুটিয়ে তুলতে হবে। এবং সেই কারণেই ভেঙে ফেলতে হবে ছকে-বাঁধা সংলাপ। মানুষের জীবনে এমন অনেক সত্য আছে যা সে অপরের কাছে ব্যক্ত করতে পারে না। এই অনির্বচনীয় সত্য বা বাস্তবই সাহিত্যে রূপ নেবে। এই ধারণা থেকেই ইওনেস্কো তথা-কথিত 'অ্যাবসার্ড' নাটক রচনায় উৎসাহী হয়েছিলেন। বিরোধিতা করেছিলেন প্রচলিত পদ্ধতির। যেহেতু ইওনেস্কো কোন বিশেষ ধরণের সমাজ বা রাষ্ট্রব্যবস্থাতেই মানুষের বন্ধনমুক্ত যন্ত্রণাহীন অবস্থা খুঁজে পান নি, সেই কারণে 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা'র একজন ঘোরতর বিরোধী-রূপে চিহ্নিত করে তাঁকে অভিনন্দন জানালেন ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অনেকে। আসলে এই মানব-সভ্যতায় ধনতন্ত্রের দুই অবদান হচ্ছে—বিচ্ছিন্নতা ও নৈরাশ্য। বিচ্ছিন্নতা ও নৈরাশ্যের দর্শন ও সাহিত্যও আজকাল ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে এবং তাদের নয়া-উপনিবেশে খুবই সাদর স্বীকৃতিলাভ করছে। তার প্রমাণ—নাটকে ও উপন্যাসে 'অ্যাবসার্ড' দর্শনের প্রভাব সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে পৌঁছুতে পারে নি। সমাজতন্ত্র-বিরোধী 'অ্যাবসার্ডিস্ট' ইওনেস্কো কলাকৈবল্যবাদীদের পদ্ধতিতেই শিল্প-সাহিত্যের সামাজিক দায়িত্ব অস্বীকার করলেন। ইওনেস্কোর এই মতের প্রতিবাদে পরের সংখ্যার 'অবজার্ভার'-এ (৬ই জুলাই, ১৯৫৮) টাইনান বললেন, সাহিত্যের ক্ষেত্রে লেখকের অন্তর্গত ভাবনা ও আত্মিকযন্ত্রণার মহিমা প্রতিষ্ঠিত ক'রে ইওনেস্কো সাহিত্য-বিচারের ক্ষেত্রে বিষয়গত তাৎপর্য অস্বীকার করে গিয়েছেন। টাইনানের বিরুদ্ধে ইওনেস্কো'র প্রতিবাদ উক্ত পত্রিকায় আর প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু তাঁর প্রবন্ধ-সংকলনে টাইনানের অভিযোগের উত্তরে ইওনেস্কো লিখেছিলেন—বিষয়গত বাস্তবতার স্বার্থে তিনি রূপরচনা-কৌশলকে বিসর্জন দেন নি, যেহেতু তিনি মনে করেন সমাজ তান্ত্রিক-বাস্তবতার উপাদান-প্রধান সোভিয়েত ছবি একান্তই শিল্পগুণ-হীন। সাহিত্যের রূপ যেহেতু জীবনেরই রূপ, সুতরাং একালের পরিবর্তিত জীবন-পটভূমির গল্প-উপন্যাস ও নাটকের ভাষা এবং রীতিগত পরিবর্তনও অনিবার্য।... আত্মপক্ষ-সমর্থনে ইওনেস্কো যে সমস্ত যুক্তির অবতারণা করেছিলেন তা থেকে অন্ততঃ এই সত্য স্পষ্ট হয়, শিল্পরূপ নির্মাণে তাঁর সচেতনতা ছিল উল্লেখযোগ্য। তা ছাড়া তিনি এবং সমগ্রভাবে 'অ্যাবসার্ডিস্ট'গণ সকলেই সেই কালের মানুষের বিচ্ছিন্নতা, আত্মিক যন্ত্রণা, নৈতিক বিপর্যয় ও বিপন্ন বিস্ময়ের কাতরতাকে তাঁদের নাটকের বিষয়রূপে স্বীকার করেছেন, যে-সময়ের মানুষ তাঁরা নিজেরাও।[১৫]

সুতরাং এই যন্ত্রণার প্রত্যক্ষ-অংশীদার তাঁরা সকলেই। যেহেতু তাঁরা যুক্তি-নির্ভর ও সুসংগত এই জীবনের অন্তঃসার-শূন্যতার তাৎপর্য উপলব্ধি করেছেন অন্তর দিয়ে, সুতরাং বিদ্রূপে শাণিত করেছেন লেখনী, আপাত-অসংগতের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন একালের বিস্মিত মানুষেরই প্রশ্ন। অতএব Artaud-কথিত 'cruelty' 'অ্যাবসার্ড' নাটকের একজাতীয় মৌলিক বৈশিষ্ট্য হতে বাধ্য। জীবনের সনাতন মূল্যবোধের বিপর্যয় ঘটিয়ে ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা যেখানে বিচ্ছিন্নতা ও নিঃসঙ্গতার অভিশাপে মানুষকে প্রতিমুহূর্তে ক্লিষ্ট করে তুলছে সেখানে বাস্তবানুগ সাহিত্যেও cruelty-র প্রকাশ অনিবার্য। সেই cruelty কখনও স্পষ্ট প্রকাশিত, কখনও তির্যক তাৎপর্যে ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ। 'The Automobile Graveyard' নাটকে (প্রবাসী স্পেনীয় নাট্যকার আরাবেল-রতচি) বারবণিতা নিজের বৃত্তিতে সমর্পিতচিত্ত, কারণ সে বলে, ধর্মের নির্দেশ যেহেতু প্রতিবেশীর প্রতি সদয় হওয়া অতএব কি জন্যে সে নিজের দেহ অপরের কাছে তুলে ধরবে না? সনাতন নীতির যথার্থ্য সম্পর্কে এই বক্তব্য যেন বিদ্রূপাত্মক একটি জিজ্ঞাসামাত্র। সামাজিক ন্যায়-নীতির অন্তর্লীন বৈপরীত্য-হেতু সমস্যা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আরাবেল-এর 'The two executioners' নাটকে। মোরিস, তাঁর মাতা Franc,oise যেহেতু পিতাকে নির্যাতন করে, অতএব সে তার মায়ের সমালোচক। আবার নিগৃহীত পিতাকে রক্ষা করতে গিয়ে মায়ের ইচ্ছা ও আদেশের বিরোধিতা করাও সনাতন-নীতির পরিপন্থী। সুতরাং প্রচলিত নীতি নিয়মই ক্ষেত্র বিশেষে মানুষকে এমন বৈপরীত্যের মুখোমুখি করে দেয় যার ফলে পরিণামে সমস্ত নীতি ব্যাপারটাকেই মনে হয় 'অ্যাবসার্ড'। সুতরাং যাঁরা 'objec ive reality' প্রচারের জন্য সদা ব্যস্ত এবং সাহিত্যকে মনে করেন সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের অন্যতম প্রচার-মাধ্যম তাঁদের কাছে সমগ্রভাবে 'অ্যাবসার্ডিস্ট'দের প্রশ্ন—মানুষের অন্তর্লোকে যে সমস্যার উদ্ভব এবং যা অনেক ক্ষেত্রে সমাধানেরও অযোগ্য তাকে রূপায়িত করাও কি শিল্পীর উদ্দেশ্য নয়? বাস্তবতার পৃষ্ঠপোষকরূপে পরিচিত কবি-সাহিত্যিকেরা অসংগত ও অসমঞ্জস বাস্তবকে শিল্পমূর্তিদানকালে যে সংগতিপূর্ণ ও সুসমঞ্জস এক একখানি ছবি প্রস্তুত করেন, 'অ্যাবসার্ডিস্ট'দের অন্যতম প্রধান অভিযোগ সেই প্রয়াসের বিরুদ্ধে। তদুপরি আমাদের অন্তরের গভীরের 'chaotic multiplicity' তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করায় বাস্তবতার অর্থ-তাৎপর্যই পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে এঁদের নাটকে।

মার্টিন এসলিন লিখছেন—'অ্যাবসার্ড' নাটকের 'বাস্তবতা' মানুষের জীবনের একজাতীয় অন্তরঙ্গ বাস্তবতা। নাট্যকারেরা মানুষের বহিরঙ্গ জীবনসত্য রূপায়ণ অপেক্ষা তাদের গভীর অবচেতন-লোকের স্বরূপ-সন্ধানেই তৎপর।

মানুষের অন্তর্লোক সর্বদা জাগতিক কার্য কারণের নিত্য-সম্পর্ক অনুসারী নয়। স্ব-রাজ্যে সম্রাট প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে নানা বিপরীতের ভাবসমন্বয় ঘটে। ভিন্ন-মুখী তরঙ্গের ঘটে সংঘাত। বিচিত্রের সংঘাত ও সমন্বয়ে গড়া অন্তরের গোপন-প্রদেশ বর্তমান শতকের শিল্পী-সাহিত্যিকদের ভাবিত করেছে। তার প্রমাণ আছে স্যুর-রিয়ালিস্ট্‌দের শিল্পচর্চায়। মগ্ন-চৈতন্যের রূপকার স্যুর-রিয়ালিস্ট্‌রা নানাভাবে প্রভাবিত করেছিলেন 'অ্যাবসার্ডিস্ট্‌'দের। তা ছাড়া তাঁদের পূর্বৈতিহ্য থেকে 'অ্যাবসার্ডিস্ট্‌'রা লাভ করেছিলেন সেই সমস্ত বিদূষক বা ভাঁড়-জাতীয় চরিত্র যাঁদের আপাত-অসংগত মন্তব্যের অন্তরালে থাকত সুগভীর জীবনবোধের প্রকাশ। প্রাচীন ভারতীয় নাটকে বা শেক্‌স্‌পীয়র প্রমুখের নাটকে এই জাতীয় চরিত্রের সাক্ষাৎ মেলে সুপ্রচুর। সমাজ ও সামাজিক নীতি-নিয়মের ক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন বঙ্কিমের কমলাকান্ত চরিত্রটিও এই ধরণের চরিত্র। কমলাকান্তের যুক্তি, কমলাকান্তের তুচ্ছ বস্তুর মধ্য থেকে জীবনের বৃহত্তর সত্যের অর্থতাৎপর্য অনুসন্ধান, কমলাকান্তের জীবন-যাপন পদ্ধতি কিছুই প্রচলিত অর্থে সুসমঞ্জস বা শৃঙ্খলাবদ্ধ নয়। কিন্তু এই নেশাগ্রস্ত অর্ধোন্মাদ ব্যক্তির মুখ দিয়ে জীবন-সম্পর্কে এমন সুগভীর দার্শনিক প্রত্যয়, দেশ ও জাতির অবক্ষয়ের জন্য বেদনা-কাতরতা রূপায়িত হয়েছে যা খুব সুস্থ বা প্রকৃতিস্থ সাধারণ মানুষের কাছ থেকেও সহজলভ্য ছিল না। কমলাকান্ত চরিত্রটি প্রচলিত অর্থে 'অ্যাবসার্ড', যদিও জীবন সম্পর্কে তাঁর অনুসন্ধিৎসা ও দার্শনিকবোধ আবিষ্কার করা সম্ভব। বঙ্কিম যেমন কমলাকান্তের মত চরিত্রের দ্বারা তৎকালীন দেশ ও সমাজ-জীবনের সমালোচনায় 'অ্যাবসার্ডিস্টিক' পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন, তেমনি ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'কঙ্কাবতী'তে স্বপ্ন-কল্পনাময় পরিবেশ রচনা করে সমাজ ও মানবজীবনের একধরণের 'অ্যাবসার্ডিটি' স্পষ্ট করে তুলেছিলেন। ত্রৈলোক্যনাথের ব্যাঘ্ররূপী খেতু এবং ফ্রাঞ্জ কাফ্‌কার কীটে রূপান্তরিত 'গ্রেগোর সামসা' সাধারণ মানবজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও সাধারণের বোধ ও অনুভূতির অধিকারী বলে থেকে জীবন, সমাজ ও তাদের পরিবেশের ধনতান্ত্রিক স্বভাবের পরিচয় সম্পর্কে সচেতন, সজ্ঞান। রূপান্তরিত অবস্থায় এরা আরও প্রখরভাবে-হৃদয়ধর্মের অধিকারী। ধনতন্ত্র-শাসিত সমাজের বিবেক-বুদ্ধিহীন আত্মমগ্নতার দূরস্থিত

নিপুণ সমালোচকের ভূমিকা এঁদের। জীবনের 'অ্যাবসার্ডিটি' সম্পর্কে কাফ্কার দার্শনিক বিশ্বাস স্পষ্ট ছিল, কিন্তু বঙ্কিম বা ত্রৈলোক্যনাথের জীবন-দর্শন 'অ্যাবসার্ডিস্টিক' না হলেও জীবন-সমালোচনায় এঁদের ভূমিকা ছিল 'অ্যাবসার্ডিস্ট্'দের সদৃশ।

সুতরাং নিয়মতন্ত্রের প্রচারক অথচ প্রচুর অসঙ্গতিতে ভরা আমাদের এই অতিপরিচিত সমাজ-জীবনের অভ্যন্তরস্থ অসঙ্গতি ও অবিচারের বিরুদ্ধে বক্তব্য প্রকাশের জন্য উদ্ভট চরিত্র-পরিকল্পনা এবং তার মাধ্যমে আপাত-অসমঞ্জস ধারণার প্রকাশ যদিও একালের 'অ্যাবসার্ডিস্ট'দের নিজস্ব পদ্ধতিরূপে স্বীকৃত, তথাপি ভাঁড় বা বিদূষক চরিত্রে এবং আরও বিবিধ পরিকল্পনায় এই পদ্ধতির পূর্বৈতিহ্যের সন্ধান পাওয়া সম্ভব। তবে অর্থ নৈতিক ও সামাজিক কারণে একালের জীবনে যে-বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণা ব্যাধির মত দেশদেশান্তরের মানুষদের অস্থির ও প্রচলে আস্থাহীন করে তুলেছে পূর্বে সেই বিচ্ছিন্নতার কাতরতা ছিল ব্যক্তিক। সনাতন সামাজিক নীতিতে ও মানবত্বে বিশ্বাস থেকে সেকালের কোন কোন লেখকের তির্যক তাৎপর্যপূর্ণ ভাষা ব্যবহারে অথবা উদ্ভট চরিত্রসৃষ্টিতে সমাজ-সমালোচনা প্রকাশিত হত। কিন্তু সুচিরকাল-প্রচলিত সামাজিক আদর্শ ও নীতিতত্ত্বে বিশ্বাস হারিয়েছেন একালের বৃহৎ সংখ্যক চিন্তাবিদ্। ফলে এক-দিকে ব্রেশ্ট্-এর মত সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী নাট্যকারেরা সামাজিক অনাচারের সামগ্রিক পটভূমিতে ব্যক্তিজীবনের দুঃখ-যন্ত্রণা ও সংগ্রামের সত্যরূপ ফুটিয়ে তুলেছেন, অন্যদিকে ব্যক্তির মধ্যে দিয়ে সামাজিক ন্যায়-নীতির বিপর্যয় ও অনাচারের ব্যঙ্গাত্মক ছবি রূপ নিল ইওনেস্কো-প্রমুখ অ্যাবসার্ডিস্টদের রচনায়। সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন বলে ব্রেশ্ট্-এর নাটকে আশাবাদ ধ্বনিত হয়েছিল। সমাজতন্ত্রের পথেই মানুষের মুক্তি সম্ভব বলে স্বীকৃত হয়েছিল। কিন্তু 'অ্যাবসার্ডিস্ট্রা' ব্যষ্টির যন্ত্রণা ও দুঃখময় পৃথিবীকে রোমান্টিক বা ভাববাদীদের দৃষ্টিতে নয়, বাস্তববাদীদের দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ করে জীবনের গতানুগতিকতা ও বিশ্বাসের মর্মে আঘাত হানতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী না হলেও প্রথম দর্শনে যা মনে হয় সেই নৈরাশ্যে এঁদের সাহিত্যিক-স্বভাব চিহ্নিত ছিল না। ব্রেশ্টীয় পদ্ধতি বা মতের পোষক না হলেও 'অ্যাবসার্ডিস্ট'রা নৈরাশ্যের প্রচারক ছিলেন না। মার্টিন এস্লিন্ এর ভাষায়: 'It is true that basically the Theatre of the Absurd attacks the comfortable certainties of religious or political orthodoxy. It aims to shock its audience

out of complacency, to bring it face to face with the harsh facts of the human situation as these writers see it. But the challenge behind this message is anything but one of despair.'১৬

'অ্যাবসার্ডিস্ট'দের জীবনদর্শন ও সাহিত্যরচনা-পদ্ধতি যেহেতু প্রচলিত রীতি-অনুসারী নয়, সুতরাং এখন প্রশ্ন হচ্ছে 'অ্যাবসার্ডিস্ট'রা তাঁদের সৃষ্টির সঙ্গে রসিকের কোন্ জাতীয় সম্পর্ক কেমন ভাবে স্থাপন করেন! এই প্রশ্নের উত্তরে ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৯-এ নভেম্বর তারিখে সানফ্রান্সিস্কো অঞ্চলের চৌদ্দশ' দণ্ডিত অপরাধীর সম্মুখে বেকেট-এর 'ওয়েটিং ফর গোডো'র অভিনয় স্মরণ করা যেতে পারে। নাটক দেখে সমাজের সুখ-সুবিধা-বঞ্চিত এই মানুষগুলির মধ্যে নানা-রকমের প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল। এঁদের কারুর মতে 'Godot is Society', কেউ বললেন 'He is the outside'। বিস্ময়ের ব্যাপার, নাট্যরসিক হিসেবে স্বীকৃত নয়, এমন কি সামাজিক মানুষ হিসেবেও নয়, এমন দর্শকেরা বেকেটের সেই নাটকের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, যে-নাটক মাত্র দু'বছর আগে লণ্ডনের সুশিক্ষিত নাট্যা-মোদীদের কাছে ছিল অস্পষ্ট এবং অর্থহীন বাক্‌জাল-বিস্তারের নমুনা মাত্র। আসলে শুধু বেকেটের নয়, সাধারণভাবে সমস্ত 'অ্যাবসার্ডিস্ট'দের নাটকেই প্রচলিত ছকের-নাটকে তুষ্ট-জনগণ অর্থহীন অসঙ্গতি ছাড়া খুঁজে পান না কিছু। নাটক ও দর্শকের মধ্যে এই বিচ্ছিন্নতার ফলে প্রাচীন নাট্যরীতির প্রধান সূত্রগুলিরই ঘটল পরিবর্তন। নাটকের সঙ্গে দর্শকের অন্তরঙ্গভাবে একাকার হওয়ার সম্ভাবনা আর রইল না। ব্রেশ্‌ট্ নাট্যচরিত্রের সঙ্গে দর্শকের identified হওয়ার সম্ভাবনা দূর করার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। ঝোঁক ছিল তাঁর আবেগ অপেক্ষা মননের দিকে। 'অ্যাবসার্ডিস্ট'রা identification দূর করার প্রয়াসে যত্নবান হলেন। নাট্যকারেরা দর্শকের সামনে তুলে ধরলেন কতকগুলি বিচ্ছিন্ন সূত্র, জাগ্রত করে তুলতে চাইলেন পাঠকের ভিতর শিল্পের সমগ্রমূর্তি নির্মাণ-কৌশলকে। অর্থাৎ পাঠককেও করে তুলতে চাইলেন চিন্তাশীল স্রষ্টা। অস্তিত্ববাদী সার্ত্রও বিশ্বাস করতেন পাঠকই সাহিত্যের যথার্থ স্রষ্টা। বিষয়ীগত সত্যে বিশ্বাসী বলেই বোধ হয় 'অস্তিত্ববাদী' এবং 'অ্যাবসার্ডিস্ট'রা রসিকের অন্তর্লোকের সত্যবোধের উপর গুরুত্ব আরোপ করে-ছিলেন। পূর্বেই বলেছি, 'অ্যাবসার্ডিস্ট'রা 'ট্রাজেডি'তে বিশ্বাসী ছিলেন না। 'ট্রাজেডি'র বদলে তাঁরা দর্শকদের পরিচিত করলেন নতুন ধরণের কমেডি

('How to get rid of it') মেলোড্রামা ('The two executioners') ট্রাজিক ফার্সের ('The chairs') সঙ্গে। দর্শকেরাও নাটক থেকে সন্ধান করলেন নতুন অর্থ-তাৎপর্য। যেমন Rose A Zimbardo অ্যালবি-র 'The Zoo Story' নাটকে জেরীর মধ্যে যীশুর, কুকুরটির মধ্যে নরকের প্রহরী-বলে বর্ণিত কুকুরের প্রতীক খুঁজে পেয়েছেন। দর্শকের এই স্বাধীনতা মানতেন বলেই অ্যালবি বলেছিলেন, সমকালের সঠিক মূর্তি নাটকে রূপায়িত দেখে দর্শকেরা নিজেদের পরিবেশ পরিবর্তনের কথা ভাববেন, নাট্যকার অবশ্যই সেরকম আশা পোষণ করতে পারেন। সেই আশা থেকে 'অ্যাবসার্ডিস্ট'রা ভেঙেছেন প্রাচীন নাট্যরীতি ও সংলাপ রচনা-কৌশল, ইওনেস্কো যতই 'নাট্যকৈবল্য' (নাটকের জন্য নাটক)-তত্ত্ব প্রচারে উৎসাহী হোন না-কেন। সমকালের দর্শক বা পাঠকেরা যেহেতু তাঁদের বিশ্বাসের স্বর্গ থেকে চিরকালের মত নির্বাসিত হয়েছেন, তাই শুধু তাঁদের আবেগের উজ্জীবন নয়, চিন্তাশক্তির উদ্বোধনের জন্যই 'অ্যাবসার্ডিস্ট'দের এই সচেতন নাট্যকৌশল। গ্রীক-নাটক একদা মানুষকে তার প্রতিকূল ভাগ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামী হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিল। ঠিক সেইভাবে 'অ্যাবসার্ডিস্ট'রা যেন প্রতিকূল বাস্তব ও সামাজিক ন্যায়নীতির অর্থশূন্যতার বিরুদ্ধে সংগ্রামী হতে আহ্বান জানালেন দর্শক ও পাঠকদের। গ্রীক-নাটকের দর্শকদের ক্যাথারসিসের কথা বলেছিলেন অ্যারিষ্টটল এবং তা ছিল এক ভাবজগতের সত্য। 'অ্যাবসার্ডিস্টরা' যেহেতু আবেদন জানান পাঠকের চিন্তাশক্তি ও মানসিকতার কাছে, তাই ভাবজগতের 'ক্যাথারসিস' নয়, চিন্তার দাসত্ব ও প্রাত্যহিক-জীবনের উৎকণ্ঠা থেকে মানুষের উদ্বর্তনই 'অ্যাবসার্ডিস্টে'র কাম্য। কাফকা, গ্রেগোর সামসা ও জোসেফ কে-র মাধ্যমে অথবা ক্যামু, মিউরসল্টের মধ্যস্থতায় প্রাত্যহিক জীবনের নিষ্ঠুর ঔদাসীন্য, ন্যায়-নীতির বিপর্যয় ও বিচার-ব্যবস্থার প্রহসনে পরিণতি-কে মনন-সমৃদ্ধ সাহিত্য-রূপ দান করেছিলেন যা বাস্তব-সচেতন বুদ্ধিমান দর্শক বা পাঠকের মনে এই বোধ জাগ্রত করতে পারে—'the dignity of man lies in his ability to face reality in all its senselessness ; to accpt it freely, without fear, without illusion, and to laugh at it.'[১৭]

ক্যামু এবং 'অ্যাবসার্ড' নাটক ও উপন্যাসের শিল্পীরা সাহিত্য - সম্পর্কে বিভিন্ন প্রসঙ্গে তাঁদের যে ধারণা ব্যক্ত করেছেন তা সর্বত্র এক না-হলেও এবং 'অ্যাবসার্ডিস্ট'দের সকলের উপন্যাস ও নাটকের প্রারম্ভ ও পরিণতি সমসূত্রানুসারী না-হলেও কতকগুলি বিষয়ে এঁদের সকলের বিশ্বাস একই ছিল যে ঃ

ক) সাহিত্যিকের কাজ তাঁর সমকালীন বাস্তবজীবনকে রূপায়িত করা। শিল্পী কল্পনাজগতের নিঃসঙ্গ অধিবাসী নন।

খ) যে-বাস্তবকে সাহিত্যিকেরা রূপায়িত করবেন, তা যথাদৃষ্ট বাস্তব নয়। শিল্পীকে অনেক কিছু গ্রহণ ও বর্জন করতে হবে। তাঁর বাস্তবতা 'objcetive' নয়, 'subjective' বা বিষয়ীগত।

গ) জীবনের রূপ-রচয়িতা হিসেবে সাহিত্যিক মানুষের মহিমা ক্ষুণ্ণ করবেন না কোথাও বা মানুষকে পলায়নবাদী করে তুলবেন না। জীবনকে নির্ভয়ে হাসিমুখে নির্মোহ-চিত্তে সহ্য করতে শিক্ষা দেবে সাহিত্য।

ঘ) সাহিত্যিক দর্শক বা পাঠকের মননলোক সমৃদ্ধ করে তুলতে সচেষ্ট হবেন।

ঙ) (অপরিচিত ও অপ্রচলিত পদ্ধতিতে রূপায়িত অ্যাবসার্ড নাটক ও উপন্যাসে) দর্শক ও নাট্যচরিত্রের মধ্যে অবকাশ সৃষ্টি ক'রে পাঠকের চিত্ত-লোককে সৃজনক্ষম করে তোলাই হবে সাহিত্যিকের অন্যতম উদ্দেশ্য।

চ) ট্রাজেডি বা প্রাচীন পদ্ধতির কমেডি নয়; মেলোড্রামা, ট্রাজিক ফার্স বা নতুন ধরণের কমেডি হবে একালের শিল্পরূপ।

পূর্বেই বলেছি, 'অ্যাবসার্ডিস্ট'দের নিজেদের মধ্যে ভাবনা ও কৌশলগত সাদৃশ্য থাকলেও এঁদের অনেকের সাহিত্যকর্মে স্বাতন্ত্র্যস্পর্শযুক্ত বিভিন্নতা ছিল। এই বিভিন্নতার কারণ তাত্ত্বিক দিক থেকে মত-পার্থক্য :—

ক) ক্যামু, হেমিংওয়ে যদিও দর্শনের দিক থেকে 'অ্যাবসার্ড' নাটকের নাট্যকারদের সঙ্গে অভিন্ন, কিন্তু কাহিনীর রূপনির্মাণে ক্যামু বা হেমিংওয়ে বিচ্ছিন্ন ঘটনার সংকলন করেন নি বা অসংলগ্ন বাক্যও ব্যবহার করেননি। অথচ ইওনেস্কো-প্রমুখ নাট্যকারেরা এই পদ্ধতিতেই পাঠকদের বা দর্শকদেব চিন্তাজগতে উদ্দীপনা ঘটাতে চেয়েছিলেন। প্রাচীন জীবনাদর্শের পরিবর্তনের সঙ্গে সাহিত্যের প্রকাশ-রীতিরও সবিশেষ পরিবর্তন প্রয়োজন, এই ছিল ইওনেস্কো-প্রমুখ নাট্যকারদের বিশ্বাস।

খ) ক্যামু এবং ইওনেস্কো মনে করতেন, সাহিত্যিক কোন কিছুই প্রচারের চেষ্টা করবেন না। তাঁরা শুধুই জীবনরূপের স্রষ্টা। কিন্তু নাট্যকার অ্যালবি মনে করতেন, নাটক তথা সাহিত্যের দ্বারা শিল্পী জনসাধারণকে তাদের অবস্থা সম্পর্কে সচেতন করে দেবেন এই আশাতে 'If you don't like it, change it.'

গ) বেকেট, ইওনেস্কো প্রমুখ কোন রকম ভাবপ্রবণতা বা নৈয়ায়িক-শোভন কার্যকারণ শৃঙ্খলায় বিশ্বাসী ছিলেন না, কিন্তু অ্যালবি-র 'চিড়িয়াখানার গল্প' ('The Zoo Story') নাটক থেকে মনে হয় তিনি একজাতীয় ন্যায়ানুমোদিত সিদ্ধান্ত ও আবেগে আস্থাশীল ছিলেন।

সমগ্রভাবে 'অ্যাবসার্ডিস্ট'দের দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা সম্ভব বলে মনে করি ; প্রথমতঃ, কাফকা, ক্যামু বা হেমিংওয়ের মত লেখকদের ক্ষেত্রে 'অ্যাবসার্ড দর্শনে'র ভিত্তিটাই ছিল প্রধান এবং একমাত্র। দ্বিতীয়তঃ, বেকেট, ইওনেস্কো প্রমুখ নাট্যকারেরা সাহিত্যরূপে জীবনের বিচ্ছিন্নতা ও অসংলগ্নতাকে মূর্ত করতে চেয়েছেন। শুধুমাত্র তত্ত্বপ্রতিষ্ঠাতেই খুশী ছিলেন না।

অস্তিত্ববাদীদের সঙ্গে 'অ্যাবসার্ডিস্ট'দের পার্থক্য কালগত নয় ; ভাবগত। দর্শনের দিক থেকে 'অ্যাবসার্ডিস্ট'গণ উত্তর-অস্তিত্ববাদী দার্শনিক (Post-existentialist)। উভয়-শ্রেণীর তাত্ত্বিকেরাই যদিও তাঁদের সমকালীন মৃত্যু-তাড়িত জীবনের বিচ্ছিন্নতা, শূন্যগর্ভতা ও অর্থহীনতার দিকটি নানাভাবে প্রচার করেছিলেন এবং মানবরসে সিক্ত করেছিলেন তাঁদের লেখনী, তবু অস্তিত্ববাদীদের সঙ্গে সাহিত্যসম্পর্কে তাঁদের মত-পার্থক্য ছিল স্পষ্ট। অস্তিত্ববাদীরা জীবনের বঞ্চনার ভিত্তির উপর সাহিত্যের মাধ্যমে কল্পনাসমৃদ্ধ আনন্দময় জগৎ নির্মাণ করতে চান অর্থাৎ সাহিত্য এঁদের কাছে বাস্তবজগৎকে সুসহ করার জন্য অবাস্তব সৌন্দর্যের জগৎ। কিন্তু 'অ্যাবসার্ডিস্ট'রা সাহিত্যকে বাস্তবজীবন-সম্পর্কশূন্য মনে না করলেও সাহিত্যকে মনে করেন না জীবন-সংগ্রামে প্রতারিত সৈনিকের পলায়নের কল্পলোক। দ্বিতীয়তঃ, উপন্যাস বা নাটকের প্রারম্ভ ও পরিসমাপ্তির ব্যাপারে অস্তিত্ববাদীরা সনাতন রীতি-অনুসারী, কিন্তু অধিকাংশ 'অ্যাবসার্ডিস্ট'ই শুরু ও সমাপ্তির মধ্যে সংযোগরক্ষা করার আবশ্যিকতা মানেন না এবং না-মানার ব্যাপারেও কোন নির্দিষ্ট নিয়ম মানেন না। আবার এই আদর্শগত প্রভেদ সত্ত্বেও জীবনের এবং সাহিত্যের সত্যতা সম্পর্কে অস্তিত্ববাদীরা এবং 'অ্যাবসার্ডিস্ট'রা একই মতের অধিকারী যে, জীবনের উপরিতলের বিষয়গত বাস্তব নয়, বিষয়ীগত বাস্তবই সাহিত্যের সত্য। সর্বোপরি পাঠক বা দর্শকদের ভূমিকার গুরুত্বের উপর 'অ্যাবসার্ডিস্ট'গণ সার্ত্র-র মত অতটা ঝোঁকদেন নি সত্য, কিন্তু ইওনেস্কো, অ্যালবি প্রমুখ সাহিত্যোপলব্ধিতে রসিকের সৃষ্টিক্ষমতার উপর নির্ভর করতেন বা দর্শক-পাঠকের মননশীলতায় বিশ্বাস করতেন।

সমকালীন 'অস্তিত্ববাদী'দের সঙ্গে 'অ্যাবসার্ডিস্ট'দের এই মিল এবং অমিল ছাড়াও আমরা পূর্বেই বলেছি 'অ্যাবসার্ডিস্ট'রা স্যুর-রিয়ালিস্ট দের সঙ্গে ঐতিহ্য-সম্পর্কে যুক্ত, কিন্তু প্রচলিত শিল্পরূপে এঁরা আস্থাহীন এবং জীবন-পর্যালোচনায় বাস্তব-সচেতন কৌতুক-মিশ্রিত দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী। ফলে 'অ্যাবসার্ডিস্ট' শিল্পীর ভূমিকা হয় তটস্থ ব্যক্তির। একটি সিচুয়েশন, কতকগুলি চরিত্র। অমনি জন্ম হ'ল নাটকের।' কিন্তু ইওনেস্কো এবং হ্যারোল্ড পিণ্টারের এই অভিমতের সত্যতা যাই হোক না কেন, লেখক মাত্রই যখন কিছু গ্রহণ ও বর্জন করেন তখন 'অ্যাবসার্ড' নাটকের দ্বারা কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না বা 'অ্যাবসার্ডিস্ট'রা পুরোপুরি নির্লিপ্ত থাকেন এ মত নিশ্চয়ই ঠিক নয়। যেহেতু সমকালীন জীবনসমস্যাই এঁদের উপজীব্য, অতএব স্পষ্টতঃই জীবন সম্পর্কে তাঁরা নিরাসক্ত বা নির্লিপ্ত নন। আবার সমাজতান্ত্রিক-বাস্তবতার সমর্থক না হলেও 'Theatre of the Absurd does not provoke tears of despair but laughter of liberation.'১৮ মানবজীবনের বিশেষ কোন উদ্দেশ্যসিদ্ধিতে কোন সাহিত্যিকই প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করেন না, 'অ্যাবসার্ডিস্ট'ও করেন না। কিন্তু জীবনের অসংলগ্নতা, নিষ্ঠুর উদাসীনতা যাঁর সাহিত্যের বিষয়বস্তু তিনি কি পরোক্ষে সমাজ-সমলোচকের ভূমিকা গ্রহণ করেন না? অতএব নাটকের জন্য নাটক, ইওনেস্কোর এই অভিমতে কলাকৈবল্যতত্ত্বেরই প্রতিধ্বনি শোনা গেলেও 'অ্যাবসার্ডিস্ট'রা সাহিত্যের জগতে সমাজহিতবাদীদের বিপরীত ভূমিকায় দণ্ডায়মান ছিলেন না। আবার সমাজ তান্ত্রিক-বাস্তববাদীদের মত ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক আলোচনা না করলেও 'অ্যাবসার্ডিস্ট'রা সমাজ ও ব্যক্তির সম্পর্ক বিষয়ে ছিলেন সচেতন। সমাজতান্ত্রিক-বাস্তববাদীদের সঙ্গে তাঁদের মত-পার্থক্যের কারণ তাঁরা 'subjective reality' তে বিশ্বাসী এবং একক ব্যক্তির মধ্যে রূপায়িত করেছিলেন সামাজিক সংকটের স্বরূপ।

৬॥ উপসংহার

বিশুদ্ধ-সাহিত্য অপ্রয়োজনীয়, আনন্দদানেই সাহিত্যিকের সিদ্ধিলাভ; ভাববাদী সাহিত্যিক ও দার্শনিকেরা পৌঁছেছিলেন এই সিদ্ধান্তে। উদ্দেশ্য-নিরপেক্ষতা বজায় রাখাই তাঁদের মতে সাহিত্যিকের প্রকৃত উদ্দেশ্য, যেহেতু সাহিত্যিক বিশ্বস্রষ্টার মতই মুক্ত ও স্বাধীন। সাহিত্য ও সাহিত্যিককে জাগতিক প্রয়োজন-সিদ্ধির মত 'হীনতা'র (?) স্পর্শ-মুক্ত রাখতে চেয়েছিলেন বলে ভাববাদীরা মনে করতেন সাহিত্যে সাহিত্যিক লীলাময় এবং সেই লীলাময়ের লীলা বোঝেন যিনি সেই রসজ্ঞ পাঠকও পুনঃ পুনঃ কাব্যপাঠে পরিশীলিত-চিত্ত ব্যক্তি, সর্বসাধারণের চেয়ে যাঁর বোধ ও বুদ্ধি উন্নতমানের। তাঁদের সিদ্ধান্ত—সকলেই যেমন সাহিত্যিক নন, তেমনি সকলের জন্যও সাহিত্য নয়; আনন্দদান ও আনন্দলাভের জন্য বিশেষ ধরণের শিক্ষা ও সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা আছে, দাতা এবং গ্রহীতা উভয়ের তরফেই। সুতরাং ভাববাদীদের সাহিত্য ফলতঃ ব্যক্তি এবং মুষ্টিমেয়ের সাহিত্য। কিন্তু নান্দনিক অনুভূতিকে জীবনের অন্যান্য অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি থেকে এইভাবে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়ার ফলে সমাজ ও সমাজবদ্ধ-প্রাণী হিসেবে মানুষের কোন ভূমিকা সাহিত্যে স্বীকৃতি লাভ করে না। কিন্তু মানুষের জন্ম সৌন্দর্যের জন্য নয়, সৌন্দর্যের জন্ম মানুষের জন্য এবং গোষ্ঠীবদ্ধভাবে জীবন যাপনের কাল থেকেই মানুষ প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে সব কিছু সৃষ্টি করেছে জীবন-সংগ্রামে জয়ী হওয়ার জন্য। সুতরাং শুধুমাত্র আনন্দই সাহিত্য বা শিল্পের জগৎ থেকে কাম্য এবং আনন্দ ছাড়া অন্য কিছু লাভ হয় না এমতও বোধ হয় যথার্থ নয়। পুরাবৃত্ত বলছে, আত্মরক্ষার খাতিরে মানুষ দলবদ্ধ হয়েছিল এবং আত্মরক্ষা ও গোষ্ঠীস্বার্থে ও একের সঙ্গে অপরের যোগাযোগ রক্ষার প্রেরণায় প্রাচীনকালে গুহাগাত্রে শিল্পকর্মের নিদর্শন রেখেছিল। জংলীদের আঁকা ছবি, প্রাচীন বন্য মানুষদের শিকার নৃত্য ও পান-ভোজনের সময়কার উল্লসিত হৃদয়ের অভিব্যক্তি একালের সুরুচি-নিয়ন্ত্রিত ছবি, নাচ ও গানের সঙ্গে দূরসম্পর্কিত হলেও কে

অস্বীকার করবে একদিন আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষার মত প্রাথমিক স্তরের কামনা-বাসনা থেকেই জন্ম নিয়েছিল শিল্প? আদিম-মানুষের শিল্পচর্চায় হয়ত সুরুচি বা সুকুমার-বোধের স্থান ছিল না, অথবা প্রয়োজনের খাতিরে সেই সৃষ্টি বলে যথাযথতার দিকে ঝোঁক ছিল যতটা, কল্পনার স্থান ছিল না তার একটুও, কিন্তু তবু তা উত্তর কালের শিল্পচর্চার ভূমিকাস্বরূপ। প্রয়োজন থেকেই জন্ম নিয়েছিল আদিকালের শিল্প। কিন্তু সচেতন এবং অসেচতন ভাবে আজও কি শিল্পী জীবনের এমন সমস্যা রূপায়ণ করেছেন না যা জীবন সংগ্রামে জটিল এবং গুরুতর প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ? অথবা আজও কি সাহিত্যিকেরা পরোক্ষে পথ-প্রদর্শকের কাজ করেছেন না? সাহিত্যের পাঠকেরা চিরকালই মহৎসাহিত্য থেকে নিজেদের রুচি-অনুযায়ী তাৎপর্য সন্ধান করার স্বাধীনতা ভোগ করেছেন এবং সাহিত্যিকেরা যুধিষ্ঠিরের মত সৎ হবে, শকুনির মত অসৎ হবে না এমন নির্দেশও স্পষ্টাক্ষরে দেন নি কোথাও। কিন্তু রামায়ণ বা মহাভারতের পাঠকেরা বা শ্রোতারা জীবনে সৎপথে পরিচালিত হওয়ার অলিখিত নির্দেশ কি অন্তরে অনুভব করেন নি? অথবা, প্রোমিথিউসের বিদ্রোহ, আন্তিগোনের ন্যায়সঙ্গত মানবিক অধিকার-রক্ষার্থে আত্মদানের নাট্য-কাহিনী কি নিছক আনন্দদানের ঊর্ধ্বে অন্য কোন দায়িত্ব পালন করে নি? রাজদণ্ডের নির্মম শাসনে শসিত সমাজে সত্য ও প্রেমের চিরন্তন মূল্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন প্রাচীনকালের সেই সমস্ত কবি ও নাট্যকারেরা! আজও মানুষের মূল্য এবং মহিমা প্রতিষ্ঠাই মহৎ সাহিত্যিকের লক্ষ্য। তবে যেহেতু সমাজ ও অর্থনীতির জটিলতা বৃদ্ধির ফলে অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে একালে একক মানুষের সংগ্রামের পরিণাম নিস্ফলতার হাহাকার তাই প্রোমিথিউস ও আন্তিগোনের সত্য ও ন্যায়ের খাতিরে দুঃখবরণ একালের সাহিত্যের উপজীব্য নয়। সত্যব্রত প্রোমিথিউস, জ্ঞানভিক্ষু ফাউস্ত আজও-আছেন জীবনে, তবে সেকালের ব্যক্তিমানুষ একালে রূপ নিয়েছে 'জনগণ' (People) নামক এক বৃহৎ শক্তির মধ্যে। সুতরাং শিল্পী, যিনি তাঁর সমাজেরই একজন এবং সর্বাধিক সচেতন সামাজিক প্রাণী, যাঁর কণ্ঠে ভাষা পায় সমকালীন জীবন ও তার সমস্যা তিনি পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকট ও সমস্যাকে রূপ দিতে বাধ্য। যদি আজ 'ইকনমিক্সের অধ্যাপক, বায়োলজির লেকচারার, সোসিয়লজির গোল্ডমেডালিস্ট সাহিত্যের প্রাঙ্গণে ভিড় করে ধর্না দিয়ে বসেন' ('সাহিত্যে নবত্ব': রবীন্দ্রনাথ ১৯২৭, ২৩শে আগস্ট) তাহ'লে উদ্দেশ্য-নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ আনন্দ দান ও লাভের জন্য যাঁরা কাতর সেই

সমস্ত সাহিত্যিক ও পাঠকেরা ক্ষুব্ধ হবেন নিশ্চয়ই। অবশ্য এ কথাও ঠিকই যে সাহিত্য অর্থনীতিবিদ্ বা জীববিদ্যাবিশারদের বক্তৃতামঞ্চ নয়, কিন্তু তাই বলে অর্থনীতির সমস্যা বা জৈব সমস্যা সাহিত্যে স্থান পাবে না যেহেতু তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে জীবনযাত্রা নির্বাহের জটিলতা, এ ধারণাও যথার্থ নয়। সাহিত্যকে সাহিত্য-রূপে সার্থক হতে হবে এই শর্তের বিকল্প কিছু নেই তা মনে রেখে যদি সাহিত্যের ক্ষেত্রে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও জৈবিক সমস্যা রূপায়িত হয়ে থাকে তাহ'লে তাকে অস্বীকারের উপায় কোথায়? যেহেতু সেগুলি জীবনেরই সমস্যা। সুতরাং বিশুদ্ধ শিল্পের অজুহাতে মানবজীবনের সমস্যা বিষয়ে উদাসীন সাহিত্যিক যত মহৎই হোন, সাহিত্যিক নন। অতএব সাহিত্যিকের সম্বল মানবজীবন এবং উদ্দেশ্যও সমাজপ্রেক্ষিতে মানবজীবন রূপায়ণ। ডি. এইচ. লরেন্স-এর ভাষায় 'The business of art is to reveal the relation between man and his circumambient universe, at the living moment.' (Morality and the Novel).

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'সাহিত্যের বিষয় মানবহৃদয় ও মানবচরিত্র'। 'মানবহৃদয়' ও 'মানবচরিত্র' কথা দুটো আলাদা করে নিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু 'মানবহৃদয়ের' অধিকারী যখন মানবচরিত্র তখন পৃথক্ করার প্রয়োজন ছিল কী? যাঁরা মনে করেন মানুষের হৃদয়ের মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা অপরিবর্তনীয় ও ধ্রুব এবং হৃদয়ের তমোঘন গভীর লোকই রহস্যময় ও চিত্তাকর্ষক, সাহিত্যের চিরন্তনতার প্রসঙ্গে তাঁরা বলেন, এই শাশ্বত অনুভূতির প্রকাশই সাহিত্যের লক্ষ্য। কিন্তু সমাজব্যবস্থা যেখানে বিবর্তনশীল এবং সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কও চিরন্তন নয় তখন হৃদয়ের চিরন্তন অনুভূতিগুলির প্রকাশও এক থাকতে পারে না। অর্থনৈতিক সমস্যা অপেক্ষা প্রেমানুভূতির বিস্তার ও ব্যাপকতা নিশ্চয়ই অধিক এবং প্রেমের কাব্য যুগান্তরের পাঠকের মন আকৃষ্ট করতে পারে অর্থনীতির গ্রন্থ যা পাবে না, একথা অবশ্যই সত্য। কিন্তু অর্থনীতির বিষয়ও যেহেতু মানবজীবনের সমস্যা ও সংকটের সঙ্গে জড়িত এবং অর্থনৈতিক কারণে মানবচরিত্রের পরিবর্তন ঘটে থাকে সুতরাং অর্থনৈতিক সমস্যা যদি সাহিত্য হিসেবে সার্থক রূপ পেতে পারে তাহ'লে নিশ্চয়ই তার বিরুদ্ধে আপত্তি থাকা উচিত নয়। সন্তানের প্রতি জননীর স্নেহ অতল, অপার কিন্তু বিশেষ পরিস্থিতিতে ক্ষুধাকাতর জননী যে সন্তানের মুখের খাবার ছিনিয়ে নিতে পারেন তা কি মিথ্যা? দেশের অর্থনৈতিক সংকট যদি এই চরম গ্লানিকর পরিস্থিতি সৃষ্টিতে সাহায্য

করে তাহ'লে কি মানবতার অপমানের ভয়ে সাহিত্যিক এই ঘটনার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করবেন? মোটকথা, সমাজ-সচেতন সাহিত্যিককে নানাভাবেই সমাজের বাস্তবসমস্যার স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে হয় তা সে অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক বা যাই হোক না কেন। শিল্পের বিশুদ্ধতা রক্ষার স্বার্থে শিল্পীকে জীবনের সমস্যা সম্পর্কে উদাসীন থাকলে চলে না।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'দাশুরায়ের পাঁচালি দাশরথির ঠিক একলার নহে; যে সমাজ সেই পাঁচালী শুনিতেছে, তাহার সঙ্গে যোগে এই পাঁচালি রচিত। এইজন্য এই পাঁচালিতে কেবল দাশরথির একলার মনের কথা পাওয়া যায় না; ইহাতে একটি বিশেষ কালের বিশেষ মণ্ডলীর অনুরাগ-বিরাগ শ্রদ্ধা-বিশ্বাস রুচি আপনি প্রকাশ পাইয়াছে'।[১] অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের মতে, সমাজের ভূমিকা দাশরথির পাঁচালির ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ শ্রোতার নয়, সক্রিয় শক্তির। টেইন যাকে বলেছেন 'মিলিউ' এবং 'মোমেণ্ট' রবীন্দ্রনাথ এখানে তার প্রভাবের কথাই বলছেন। কিন্তু সময় এবং সমাজের এই ভূমিকা সাহিত্যের ক্ষেত্রে যত গভীর রবীন্দ্রনাথ সেই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করলেও সাহিত্যও যে সমাজকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা রাখে সে বিষয়ে কোন মন্তব্য করেন নি। অথচ গ্যেটের 'Sorrows of Werther', ডুমার 'Musketeers', গলস্‌ওয়ার্দির 'Justice' সমকালের মানুষকে এমন কি রাজশক্তিকেও যে চিন্তিত করে তুলেছিল, ইতিহাসে তার প্রমাণ আছে। আমাদের দেশে যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্‌' ইংরেজ-শাসিত ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকামীদের মনে অগ্নিগর্ভ দেশাত্মবোধ সঞ্চারিত করে দিত অথবা বর্তমান শতকে চারণকবি মুকুন্দদাসের গান স্বদেশ-প্রেমিকদের উদ্বুদ্ধ এবং শাসকশক্তিকে বিচলিত করে তুলেছিল। সুতরাং সাহিত্য শুধু সমাজের প্রভাবই স্বীকার করে না, সমাজকে প্রভাবিতও করে। দেশের রাজনীতি ও সমাজনীতিকে শিল্পী-সাহিত্যিকেরা যদি এইভাবে প্রভাবিত করতে পারেন তাহ'লে সাহিত্যের জগৎ যে শুধুই ভাব-বিলাসের জগৎ নয়, সাহিত্যিক শুধু মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মত গান গেয়ে শ্রোতা বা পাঠককে আনন্দ দিতে চান না, সে সত্যও মানতে হবে। একথা যথার্থ যে, সাহিত্যের পৃষ্ঠায় জীবনের এমন রূপ চিত্রিত হয় যা চলমানের প্রতিলিপি নয় এবং নয় বলেই সাহিত্য দীর্ঘজীবন লাভ করে, কালান্তরের সীমারেখা অতিক্রম করে। কিন্তু তাই বলে সাহিত্যিক তাঁর সমাজ ও সমকালের সমস্যা সম্পর্কে উদাসীন এবং সচেতনভাবে না হলেও অসচেতনভাবে সমাজ-জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন না, তা যথার্থ নয়।

সচেতনভাবে প্রভাব বিস্তার করতে চাইলে শিল্পগত ত্রুটি কিছু অনিবার্য হয়ে ওঠে। কোন শিল্পী যদি মানুষকে সৎ হওয়ার উপদেশ দিতে সচেষ্ট হ'ন তাহ'লে শিল্পের লক্ষণ ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা থাকে, কারণ নীতিগ্রন্থ বা প্রচার-পত্রিকার সঙ্গে সাহিত্যের কোন পার্থক্য থাকবে না সেক্ষেত্রে। 'মনুসংহিতা' বা কম্যুনিষ্ট পার্টির 'মেনিফেস্টো'কে কেউ কোনদিনই সাহিত্য বলে দাবি করে না। কিন্তু যদি 'রঘুবংশ'-এ দিলীপের রাজমহিমা বর্ণনাকালে কালিদাস মনুর নির্দেশ অনুসরণ করেন অথবা গোর্কি যদি তাঁর 'মা' উপন্যাসে সর্বহারার বিপ্লব প্রসঙ্গে মার্ক্স-এর তত্ত্ব স্মরণে রাখেন তাহ'লে কালিদাস বা গোর্কি-র বিরুদ্ধে কোন আপত্তি থাকে কি? তাঁদের হাতে তো সাহিত্য, সাহিত্য-হিসেবে সার্থকতা লাভের প্রথম উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছে। কিন্তু সমস্যা সৃষ্টি হয় তখনই যখন সাহিত্যকে সাহিত্যিক নিজে পাঠকের জীবনের পথ-নির্দেশিকা হিসেবে ব্যবহার করতে চান। এই ধরণের পক্ষপাতিত্বকেই ডি. এইচ. লরেন্স 'অনৈতিক' বলে বর্ণনা করেছেন। সুন্দর রূপ-নির্মাণে আগ্রহ এবং তীব্র বস্তুপ্রেম দুইই একটি স্তরে পক্ষপাতিত্ব-দোষে দুষ্ট হতে পারে। সুন্দর রূপের প্রতি পক্ষপাতিত্ব থেকে জন্ম কলাকৈবল্য-বাদীদের এবং উগ্রবস্তুরসিকতা থেকে যথাস্থিতবাদীদের। প্রথম শ্রেণীর লেখকেরা এজরা পাউণ্ডের মত সগর্বে বলতে পারেন, যেহেতু যথার্থ রসিকেরা চিরকালই সংখ্যায় অল্প অতএব পাঠকসংখ্যার লঘুতা কাব্য-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন। অপরপক্ষে যথাস্থিতবাদী বলবেন, জীবনের সঠিক মূর্তি রূপায়ণ মানে হচ্ছে বৈজ্ঞানিকের নিস্পৃহ দৃষ্টি নিয়ে জীবনের নির্মেদ কঙ্কালসার চেহারার উপস্থাপনা। কিন্তু কলাকৈবল্যবাদীদের প্রসঙ্গে প্লেখানভ বলেছিলেন যে কথা, সেই একই কথা যথাস্থিতবাদীদের প্রসঙ্গেও বলা চলে যে, এঁরা সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে তাঁদের জীবনের অনৈক্য থেকে একধরনের নৈরাশ্যবোধের দ্বারা তাড়িত হয়েছেন। অতিরিক্ত রূপরসিকেরা এবং উগ্র বস্তুরসিকেরা ভিন্ন পথে বিচরণ করেও পরিশেষে মিলিত হয়েছেন একইক্ষেত্রে। রূপানুরাগীরা দোহাই মানেন শিল্পের বিশুদ্ধতার আর যথাস্থিতবাদী বৈজ্ঞানিক সত্যের। কিন্তু মানুষের জীবনে বিজ্ঞান ও (সৌন্দর্য এবং) সাহিত্য দুইই সত্য। ক্রীষ্টোফার কডওয়েল-এর ভাষায় প্রথমটি হচ্ছে 'Outer reality' এবং দ্বিতীয়টি 'Inner reality'। বিজ্ঞানে প্রকাশ পায় কিভাবে মানুষ সমাজ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ঘটাতে পারে আর শিল্পের মাধ্যমে রূপায়িত হয় মানবজীবনের অন্তর্গত অভিলাষের সত্যতা। বাহ্য প্রয়োজন মেটায় বিজ্ঞান, ভিতরের চাহিদা মেটায় সাহিত্য।

কিন্তু 'Inter reality'র সঙ্গে 'Outer reality'র পার্থক্য স্বীকার করে কলাকৈবল্যবাদী ও যথাস্থিতবাদী 'বাস্তব' এবং 'সত্য' সম্পর্কে একই ধরণের ভুল ধারণায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। শুধুই রূপনির্মাণমনস্কতা অথবা যথাদৃষ্টবস্তুর প্রতিলিপি রচনায় আগ্রহ কোনটিই সমগ্র একটি মানুষের জীবন-রূপায়ণে সহায়তা করে না। সুতরাং বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রতি অনুগত থাকা অথবা সুন্দর রূপ-নির্মাণকেই সর্বস্ব জ্ঞান করা কোন সচেতন সাহিত্যিকের উদ্দেশ্য নয়।

সাহিত্যের উদ্দেশ্য মানবজীবনের সত্য প্রকাশ করা। কিন্তু 'সত্য' কি? 'সত্য' হচ্ছে জ্ঞানে কর্মে ভাবে বিকশিত হওয়া। জ্ঞানে আমরা জগৎকে জানি, কর্মে নিজেদের বিস্তার করি আর ভাবে নিজেদেরই খুঁজে পাই। মাক্সিম গোর্কি 'জ্ঞান' ও 'কল্পনা'কে মানুষের অস্তিত্বরক্ষার ক্ষেত্রে দুটি প্রধান শক্তি বলে গণ্য করেছিলেন। তিনি বলেছেন, বিজ্ঞানের জগতে জানার ক্ষেত্রে যে 'ফাঁক' থাকে বিজ্ঞানীকে তা কল্পনা দিয়ে গড়ে নিয়ে তবে 'হাইপোথিসিস' দাঁড় করাতে হয়। সুতরাং বিজ্ঞানী যিনি, তিনিও পারেন না 'কল্পনা'র সাহায্য অস্বীকার করতে।[২] একাদশ পার্টি কংগ্রেসে লেনিন খুব গুরুত্বের সঙ্গে গোর্কির মতের অনুরূপ কথাই বলেছিলেন (গোর্কির পূর্বে)—'এই ধারণা ভুল যে কেবল কবিদের ক্ষেত্রেই কল্পনার প্রয়োজন। এ একটা অর্থহীন কুসংস্কার। গণিতেও কল্পনার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কল্পনা ছাড়া উচ্চতর গণিতের অন্তর্‌কলন ও সমাকলন আবিষ্কৃত হত না।'...মোটকথা কল্পনা ছাড়া যেমন বিজ্ঞানীর চলে না, তেমনি সাহিত্যের জগতেও বিজ্ঞান কোন বর্জনীয় ব্যাপার নয়। বালজাক তো 'হর্মোন' আবিষ্কারের পূর্বেই মানবদেহে এই জাতীয় বস্তুর ক্ষরণের সম্ভাব্যতা কল্পনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। গোটে এবং স্ট্রিণ্ডবার্গের নাটকেও এই জাতীয় বিজ্ঞান-ভাবনার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং কল্পনার জগৎ ও জ্ঞানের জগতের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও বৈপরীত্য নেই। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের জগতে ইকনমিক্‌সের অধ্যাপক, বায়োলজির লেকচারার বা সোসিওলজির স্বর্ণপদকপ্রাপ্তের প্রবেশ মেনে নিতে পারেন নি। এমন কি তাঁর উত্তর-জীবনের পাশ্চাত্ত্য কাব্যসাহিত্যে 'আধুনিকতা'র দোহাই দিয়ে যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণার প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল তার প্রতিও কবির মনের প্রচ্ছন্ন অসমর্থন ছিল। 'আধুনিক বিজ্ঞান' যে নিরাসক্ত চিত্তে বাস্তবকে বিশ্লেষণ করে আধুনিক কাব্য সেই নিরাসক্ত চিত্তে বিশ্বকে সমগ্র দৃষ্টিতে দেখবে, এইটেই শাশ্বতভাবে আধুনিক'।[৩] নিরাসক্তি, তাঁর মতে, কোন

বিশেষ কালের আধুনিকতা নয়। সুতরাং আধুনিকতার স্বার্থে নিরাসক্তির নামে যে রিয়ালিটির আমদানি হয়েছে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য থেকে বাঙলা সাহিত্যে, রবীন্দ্রনাথ তাকে বলেছেন, 'পাক দেওয়া শনের দড়ি।' কিন্তু 'নিরাসক্তি' বা অপক্ষপাত কৌতূহলই বিজ্ঞান নয়—'বিজ্ঞান ত কেবল অপক্ষপাত কৌতূহল মাত্রই নয়, কার্য-কারণের সত্যকার সম্বন্ধ বিচার'।৪ বিজ্ঞানকে এই দৃষ্টিতে দেখলে সাহিত্যের সঙ্গে বিজ্ঞানের পার্থক্য যায় লুপ্ত হয়ে। এইভাবে দেখার জন্যই গোর্কি বা লেনিন সাহিত্যের সঙ্গে বিজ্ঞানের, কল্পনার সঙ্গে জ্ঞানের কোন দ্বান্দ্বিকতা খুঁজে পান নি। কিন্তু অপক্ষপাত কৌতূহলের নামে যথাস্থিত-বাদীরা সাহিত্যের জগতে যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক তথ্য আমদানি করেছিলেন তার প্রতি এঁদের কোন সমর্থন ছিল না, কারণ যথাস্থিতবাদ হচ্ছে মূলতঃ নৈরাশ্যের সন্তান এবং মার্ক্সীয় দর্শনে নৈরাশ্যের কোন স্থান নেই। বিজ্ঞানের প্রগতিতে ব্যক্তিমানুষের স্বাধীন ইচ্ছার বিপন্নতার ফলে নৈরাশ্যপীড়িত হয়েছিলেন যথাস্থিতবাদী, অস্তিত্ববাদী ও অ্যাবসার্ডিস্ট। এই বিপন্নতার বোধ রোমান্টিকদের ছিল এবং সেই যন্ত্রণার কবল থেকে নিষ্কৃতি সন্ধান করেছিলেন তাঁরা কল্পনার জগতে। কিন্তু কোঁত, ডারউইন, মার্ক্স এবং আরও পরে ফ্রয়েড, প্লাঙ্ক, আইনস্টাইন মানুষের জীবন ও বস্তুজগৎ সম্পর্কে যে তথ্য সরবরাহ করলেন তার ফলে রোমান্টিকের ভাবজগৎ কোন আশ্রয়রূপেই আর গণ্য হল না। আশ্রয়চ্যুত মানুষের মধ্যে বাসা বাঁধল নৈরাশ্যের অন্ধকার। যথাস্থিতবাদী বললেন, শিল্পী-সাহিত্যিকের কাজ হবে বৈজ্ঞানিক সত্যকে যথাযথ রূপায়িত করা। অস্তিত্ববাদী (নীৎসে) বললেন, দুঃখময় জগৎকে সুসহ করার জন্যই শিল্প সাহিত্য অপরিহার্য। সুররিয়ালিস্ট বললেন, আপাত সত্যের অন্তরালে মগ্নচৈতন্যের ক্রিয়াকলাপের প্রকাশই শিল্পের লক্ষ্য। 'অ্যাবসার্ডিস্টদের মধ্যে এডওয়ার্ড অ্যালবি ছাড়া মোটামুটি সকলেই বললেন, সাহিত্যিকের কাজ জীবনের অ্যাবসার্ডিটি-কে সাহিত্যের বিষয়বস্তু ও ও ভঙ্গিতে সত্য করে তোলা, জীবনের অর্থহীনতাকে প্রকট করা। কেবল অ্যালবি বললেন, তাঁর নাটক দেখে যদি কেউ জীবনকে পরিবর্তিত করার সম্ভাবনা দেখেন, তাহ'লে তিনি বাস্তবে সেই চেষ্টা করতে পারেন (If you like to change, change it)। এই 'to change'-এর দিকে লক্ষ্যই সুর-রিয়ালিস্টদের কোন কোন শিল্পীকে মার্ক্সীয় দর্শনে বিশ্বাসী করে তুলেছিল। এই আন্দোলনের অন্যতম অংশীদার আরাগঁ ক্রমে সাম্যবাদে পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করেছিলেন এবং পলএলুয়ারও (ভাব বাদ-নির্ভর)

সাম্যবাদের প্রচারকে পরিণত হন। সমাজ জীবনের পরিবর্তনের জন্য সাহিত্যিকের এই কামনার পিছনে আছে প্রচালিত সমাজব্যবস্থার সঙ্গে তাঁর জীবনের অনৈক্য। তবে সেই অনৈক্যের বোধকে তাঁরা সদর্থক সক্রিয়তায় পরিণত করতে চেয়েছিলেন। আর যথাস্থিতবাদী, অস্তিত্ববাদী এবং অ্যাবসার্ডিস্টও এই অনৈক্য থেকে যন্ত্রণা ভোগ করেছেন, বিচ্ছিন্নতার ক্লেশে কাতর হয়েছেন কিন্তু বিরাগ সত্ত্বেও কামনা করতে পারেন নি আগামী দিনের পরিবর্তিত সমাজের। সমাজের প্রচলিত ছকের চতুর্দিকে নৈরাশ্যপীড়িত শিল্পী-চিত্তের পরিভ্রমণ কোন নির্দিষ্ট পথের সংকেত দিতে পারে নি। বস্তুতঃ শিল্পীরা ব্যক্তিগতভাবে নিজেদের সুবিধাভোগী শ্রেণীর সঙ্গে একাকার করতে চেয়েছেন বলে যন্ত্রণাবিদ্ধ হলেও পরিবর্তন-কামনা উচ্চারণ করেন নি।

বালজাক, ফ্লোব্যার, শার্লোট ব্রন্টি বা ডিকেন্স-এর মত ঔপন্যাসিকেরা কায়েমি স্বার্থবাদীদের অনাচার, পুঁজির ব্যাপক প্রসার ও শ্রমিকের দুঃখকাতরতা লক্ষ্য করেছিলেন। কিন্তু এঁদের নির্ভরতা ছিল মনুষ্যত্বের উপর, সনাতন ন্যায়-নীতির উপর। কিন্তু শোষক যে কদাপি সনাতন নীতির খাতিরে শোষিতের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন না এবং দয়া প্রদর্শন করলেও শোষিতকে সত্যকার সামাজিক অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় না এই ধারণা তাঁদের ছিল না। বস্তুতঃ এই সমস্ত শিল্পীরা শ্রেণীগতভাবে সমাজের যে অংশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন তাতে তাঁদের পক্ষে, যতটা সহানুভূতি শক্তির অধিকারীই তাঁরা হোন না কেন, নতুন সমাজের চিন্তা করা সম্ভব ছিল না।• একথা হয়ত সত্য যে অভিজাত পরিবারের সন্তান পুশকিন, গোগোল, তুর্গেনেভ বা টলস্টয়, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের সাহিত্যে তাঁদের ব্যক্তিগত শ্রেণীস্বার্থ ই বজায় রাখতে চান নি, বরং নিজেদের শ্রেণীর ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি নির্মমভাবে সমালোচনা করেছেন অনেক ক্ষেত্রে, কিন্তু তা সত্ত্বেও নতুন সমাজ-জীবনের যে-ভাবনা সমাজতান্ত্রিক-বাস্তববাদীদের রচনায় ফুটে উঠেছিল তার প্রকাশ ছিল না এঁদের সাহিত্যকর্মে। শুধু তাই নয়, সাহিত্যের মাধ্যমে সমাজবাদের মহিমাপ্রচার ক'রে পরোক্ষে সর্বহারার জাগরণে উৎসাহ দানের যে প্রয়াস সমাজতান্ত্রিক-বাস্তববাদীদের রচনায় স্পষ্ট হয়েছিল তারও কোন নিদর্শন ছিল না পূর্বোক্ত সাহিত্যিকদের সৃষ্টির মধ্যে। হয়ত কখনও রাষ্ট্রশক্তির অনুগ্রহকামনা, কখনও তথাকথিত বিদগ্ধ পাঠকদের (যাঁরা অবকাশ-ভোগী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত) তুষ্টি সাধনা এবং এই সঙ্গে যশ ও অর্থলালসা বাধা দিয়েছিল এঁদের। এবং এখনও এগুলিই প্রধান বাধা। প্রতিকূল রাষ্ট্রশক্তির

দ্বারা শিল্পীর নির্যাতন ও নির্বাসন পৃথিবীর ইতিহাসে ঘটেছে বহুবার এবং ঘটে থাকে আজও। বুলগেরিয়ার ফাসিস্ত সরকার গুলি করে হত্যা করেছিল তার দেশের ‘Motor songs’-এর লেখক নিকোলা ভাপ্‌ৎসারোজকে, যিনি একালের বুলগেরিয়ায় মহত্তম কবির আসনে প্রতিষ্ঠিত। তাই রাজানুকূল্য লাভের আশায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্তোর কবি-সাহিত্যিকদের অনেকে নৈরাশ্যের ছবি সাহিত্যে ফুটিয়ে তুললেও শাসকশ্রেণীর সমালোচনায় সাহস প্রকাশ করেন নি। এমন কি অনেক সময় পারিতোষিকের কামনায় নিপীড়নকে ন্যায়ের শাসন বলে বর্ণনাও করেছেন। ধনতান্ত্রিক কাঠামোতে রাজশক্তি সাহিত্যিকদের আজও কিনে থাকেন তাঁদের ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য। অথচ ১৯৪৪ সালের সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লবের পর বুলগেরিয়া-র সরকার বন্ধ করে দিয়েছেন সেখানকার ধনীদের দ্বারা পরিচালিত ব্যক্তিগত প্রকাশন-সংস্থা। সরকার এবং বিভিন্ন গণ-প্রতিষ্ঠানের দ্বারা গঠিত প্রকাশন-সংস্থার উৎসাহেই সে দেশে আজ পুস্তক প্রকাশিত হচ্ছে। এরাই তরুণ সাহিত্যিকদের উৎসাহিত করছে। গঠিত হয়েছে ‘Union of Bulgarian Writers’। মনোনীত লেখকদের অর্থানুকূল্যদানে উৎসাহিত করার জন্য ‘Literary fund’ও গঠন করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ‘Board of Literary fund’ বিষয়বস্তু নির্বাচনের উপর তাঁদের ইচ্ছা আরোপ করেন না। সাহিত্য-সমালোচক এবং প্রকাশন-সংস্থাই এই সমস্ত সৃষ্টির মূল্য নিরূপণ করেন।[৬] এই হচ্ছে সাধারণভাবে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে লেখকদের সঙ্গে সরকারের সম্পর্কের চেহারা।

একদা অভিজাততন্ত্রে বিশ্রামভোগী শাসকেরা তাঁদের বিলাসবহুল জীবনে শিল্পচর্চাকে অবসর বিনোদনের অঙ্গ করে নিয়েছিলেন প্রত্যক্ষতঃ, এবং পরোক্ষে শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে শিল্পীকে করেছিলেন উৎসাহিত। সেদিন ছাপাখানার বিকাশ হয় নি বলে শিল্পের সমঝদার ছিলেন সামন্তপ্রভু স্বয়ং এবং তাঁর সভাসদ্‌গণ। বিদূষকের মত কবিও ছিলেন রাজসভার অপরিহার্য উপাদান। রাজার প্রতি অন্তরের কৃতজ্ঞতা ও ক্ষোভ সবই প্রকাশ পেত কবির কণ্ঠে। কিন্তু লক্ষ্য ছিল একটাই—রাজানুগ্রহ লাভ। সেই রাজতন্ত্রেই ভারতীয় আলংকারিক বলেছিলেন ‘কাব্যং যশসে অর্থেকৃতে ব্যবহারবিদে শিবেতরক্ষতয়ে’......ইত্যাদি। অথবা, ‘ধর্মার্থকামমোক্ষেষু বৈচক্ষণ্যং কলাসু চ/ প্রীতিং করোতি কীর্তিং চ সাধুকাব্য-নিবন্ধনম্‌’। যশ ও অর্থের দাতা ছিলেন যেহেতু রাজাই সুতরাং ‘প্রীতিং করোতি’ বলা হচ্ছে যখন তখন প্রশ্ন অনিবার্য—এই প্রীতি কার? কে সেই সহৃদয় যিনি

প্রীত হচ্ছেন ? তিনি কি সাধারণ মানুষ ? অবশ্যই নয়। রাজা ও সভাসদ্দের তুষ্টি সাধন ছাড়া কি বা করতে পারতেন সেকালের কবিরা। ছাপাখানার জন্ম ও বিকাশের পূর্বপর্যন্ত সমঝদারের সংখ্যা ছিল স্বল্প এবং যাঁরা ছিলেন তাঁদের সামাজিক মর্যাদা ও শিক্ষা ছিল অ-সাধারণ। এঁদের প্রীতি উৎপাদনই ছিল সেকালের কবি-সাহিত্যিকদের উদ্দেশ্য। আসলে রাজতন্ত্রে রাজানুগ্রহলাভে ধন্য হওয়ার জন্য বহু প্রতিভাবানের পক্ষে সেকালে শিল্পচর্চা সম্ভব হয়েছিল, তাঁদের অর্থাভাব ও ঘুচেছিল তার ফলে, কিন্তু সেদিনের শিল্পী-সাহিত্যিকেরা অনায়াসে বিস্মৃত হতে পারতেন জনগণের চাহিদা, অমনোযোগী হতে পারতেন অধিক সংখ্যকের জীবন সম্পর্কে। ফলে কালান্তরে এঁদের কাব্য-সাহিত্য থেকে কবিদের যুগ ও সেইকালের মানুষদের জীবন যাপন পদ্ধতি সম্পর্কে সুনিশ্চিত তথ্য আবিষ্কার আর সম্ভব নয়। অতঃপর ধনতন্ত্রে ছাপাখানার ব্যাপক প্রসারের ফলে শিল্প-সাহিত্য গিয়ে পৌছুল জনসাধারণের হাতে। ধনীর ধনসঞ্চয়ের প্রধানতম মাধ্যম শ্রমজীবীরা মালিক পক্ষের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের ব্যবসায়িক প্রসারের স্বার্থে গঠিত ছাপাখানার কল্যাণে সাহিত্যপাঠের সুযোগ ভোগ করতে শুরু করলেন। অন্যদিকে ধনী বণিকের জীবনে সেই অবকাশ দূর হ'ল যাতে তিনি নিভৃতে শিল্পচর্চা করতে পারেন। অর্থসঞ্চয়ের প্রবল লালসায় তাঁদের সময় হল সংক্ষিপ্ত। সেই স্বল্প অবকাশে এমন সাহিত্য থেকে তাঁরা আমোদ সন্ধান করলেন যেখানে থাকবে ইন্দ্রিয়-লালসা নিবৃত্তির এক রণের সহজপন্থা। ফ্রয়েড বলেছিলেন, সাহিত্যিকেরা তাঁদের অবদমিত বাসনার সার্থকতা সন্ধান করেন সাহিত্যে। এই মন্তব্যের যাথার্থ্য সম্পর্কে সন্দেহের সীমা নেই, কিন্তু একথা সত্য, ধনতন্ত্রে ধনীদের অপূর্ণ কামনার তৃপ্তি সাধনের জন্য এযালের সাহিত্যকে আত্মনিয়োগ করতে হয়েছে অনেকক্ষেত্রে। যেহেতু সাধারণ কৃষিজীবী ও শ্রমজীবীর মান উন্নত নয়, সাহিত্যপাঠে নেই তাঁদের সুযোগ, অধিকার এবং আর্থিক সঙ্গতি অতএব এঁদের জীবনের সমস্যা রূপায়ণের কি প্রয়োজন আছে লেখকদের ? ধনতন্ত্রের বিকাশের পটভূমিতে জোলা প্রমুখ যথাস্থিতবাদীরা শ্রমিক, কেরাণী ও বস্তিজীবন নিয়ে উপন্যাস লিখেছিলেন বটে, কিন্তু এই অত্যাচারিত শ্রেণীর মুক্তির পথ খুঁজে পান নি ব'লে তাঁদের লেখা থেকে নৈরাশ্যই হয়েছিল পাঠকের একমাত্র প্রাপ্তি। তারপর থেকে ধনীরাই সাহিত্যের গতিনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা নিজেদের হাতে রাখতে চেয়েছেন। তাঁদের কায়েমি স্বার্থের সিদ্ধি এবং সহজ সুখ ও আমোদ ছাড়া সাহিত্য থেকে আর কিছুই কামনা

করেন নি তাঁরা। সাহিত্যিকেরাও আর্থিক স্বচ্ছলতা ও নিরাপত্তার খাতিরে এঁদের সেবা করতে শুরু করলেন। সাহিত্য হয়ে দাঁড়াল অপসংস্কৃতির বাহন। যে যৌনতা মানব তথা সর্বজীব-সাধারণ সেই যৌনতা সাহিত্যে এল জীবনের অঙ্গ হিসেবে নয়, পাঠকের ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির উদ্দেশ্যে। অর্থাৎ বিত্তবানেরা নিয়ন্ত্রিত করছেন সাহিত্যিকদের লেখনী, সাহিত্যিক গঠন করেছেন পাঠকদের রুচি এবং কার্যতঃ সাহিত্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে বিত্তবান বণিকের সাহিত্য। পাঠক পরিচালিত হচ্ছেন বিত্তবানেরই অঙ্গুলি হেলনে। দুর্ভাগ্যবশতঃ সাম্প্রতিক বাঙলা উপন্যাসে বণিক-রুচির এই ভয়াবহ বিকৃতি বাঙালী পাঠকদের কুরুচি বিবর্দ্ধনে সহায়তা করছে। বাঙালী পাঠকেরা ধরে নিয়েছেন এরই নাম 'প্যাশন', এরই নাম 'জীবন' এবং এতকালের সাহিত্যিক শুচিবায়ু দূর হল নবীনদের সহায়তায়। এই সাহিত্যিকেরা বিশুদ্ধ সাহিত্যের অজুহাতে সমাজতান্ত্রিক-বাস্তববাদীদের জীবন ভাবনাকে দূরে রাখলেন, বললেন, তেমনটি লিখেছেন তাঁরা, জীবনে ঘটে যেমনটি। সমাজতন্ত্রীরা নাকি প্রচারধর্মী সাহিত্য রচনা করেন অতএব তাঁদের সাহিত্যকে বিশুদ্ধ সাহিত্যরূপে গণ্য করতে পারছেন না তাঁরা। কিন্তু নিজেরা যে বিশুদ্ধ সাহিত্যের নামে অপসংস্কৃতির ব্যাপক প্রচারে মেতে উঠেছেন তা কি স্বীকার করবেন? বিশুদ্ধ আনন্দের দোহাই দিলেও জিজ্ঞাস্য তাঁরা এবং তাঁদের পাঠকেরা কেউই কি কাণ্ট-কথিত 'disinterested satisfaction' খুঁজে পাচ্ছেন সাহিত্য থেকে? 'ধর্ম' না মিলুক, 'কাম' ও 'অর্থ' দুইই মিলছে সাহিত্যিক এবং পাঠকের। হয়ত উভয়ের কাছে তারই আর এক নাম 'মোক্ষ'। কিন্তু সমাজবাদ-প্রচার যদি 'প্রচার' হয় তাহ'লে যৌনতা প্রচারও নিশ্চয়ই প্রচার। জীবনের নামে যদি 'যৌনতা'কে স্বীকার করতে হয় (যেহেতু তা সর্বসাধারণের সম্পদ) তাহ'লে সমাজ ও মানুষের বন্ধনমুক্তির ছবি ফুটবে যে-সাহিত্যে তা কেন সাহিত্যরূপে গণ্য হবে না?

মানুষের কোন কর্মই উদ্দেশ্যহীন নয় এবং শুধুমাত্র instinct-এর দ্বারা পরিচালিত হয় না বলেই মানুষ ইতর প্রাণী থেকে পৃথক। মানুষের সাহিত্যেরও তেমনি উদ্দেশ্য আছে। অবশ্য সে উদ্দেশ্য পরোক্ষ। প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য নিয়ে লেখা হয় যে সমস্ত সাহিত্য সেগুলি নীরস ও ক্ষণস্থায়ী হতে বাধ্য। সে উদ্দেশ্য 'যৌনতা'র প্রচার হোক বা সমাজমঙ্গল কামনা হোক, পরিণতি এক হতে বাধ্য। এখন প্রশ্ন হতে পারে, সাহিত্যিকের যথার্থ উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত? এই প্রশ্ন বহুকাল আগে থেকেই অজস্র জটিলতা সৃষ্টি করে আসছে। নীতিপ্রচার,

আনন্দদান থেকে অনেকে অনেকরকম সমাধানের ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু আমরা পূর্বেই বলেছি (ক) সাহিত্যিকে সাহিত্য হিসেবে সার্থক করতে হবে। এই হচ্ছে সাহিত্যিকের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য। (খ) দ্বিতীয়তঃ, মানবজীবনের সত্যমূর্তি রূপায়ণই শিল্পী-সাহিত্যিকের মূল উদ্দেশ্য। অতএব মনুষ্যত্বের অবমাননা না ঘটিয়ে দুঃখ-দৈন্য এবং যাবতীয় সমস্যা সমেত সমগ্র মানুষকে রূপায়িত করাই হবে সাহিত্যিকের লক্ষ্য।......কিন্তু মানুষের জীবন যেহেতু অচঞ্চল কিছু নয়, সামাজিক অর্থনৈতিক প্রভৃতি নানাকারণে তার নিত্যই বিবর্তন ঘটছে, অতএব শিল্পী জীবনের কোন্ সত্যকে রূপায়িত করবেন ? যদি টলস্টয়ের বক্তব্য মেনে নেওয়া যায় যে, অধিক সংখ্যক মানুষকে প্রাণিত করাই মহৎ সাহিত্যের উদ্দেশ্য তাহ'লে এই মন্তব্যের নিহিতার্থও স্বীকার করতে হবে যে, যেহেতু শ্রমিক ও কৃষকেরাই সমাজের অধিক সংখ্যক মানুষ তাই তাদের প্রাণিত করতে পারে এমন সাহিত্যই মহৎসাহিত্য। টলস্টয় নিজেও শেমেনভের কৃষকজীবন নিয়ে লেখা গল্প বা 'টমকাকার কুটীর'কে এই ধারণা থেকেই পৃথিবীর প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকেদের সাহিত্যকর্মের ঊর্ধ্বে স্থাপন করেছিলেন। এমন কি নিজের অধিকাংশ রচনাকে তিরস্কার করতেও তাঁর কুণ্ঠা ছিল না। যদিও এই শ্রমিক ও কৃষকেরা সাহিত্য-পাঠের (শিক্ষাগত বা অবসরগত) সুযোগের অধিকারী ন'ন এবং সাহিত্যের বই কিনে পড়ার মত উদ্বৃত্ত অর্থেরও অধিকারী ন'ন, অতএব বিত্ত প্রভৃতি অনেক কিছু থেকেই বঞ্চিত হবেন লেখকেরা। তবু সাহিত্যিক যদি বেশীর ভাগ মানুষের জীবনকে স্পর্শ করতে অভিলাষী হ'ন, তাহলে তাঁকে আসতেই হবে শ্রমিক-কৃষকের পাশে। কিন্তু সেক্ষেত্রে শিল্পীর দায়িত্ব ও সমস্যা প্রচুর। প্রথমতঃ, এই শ্রমিক-কৃষকের সাহিত্য-সংস্কৃতির কোন ঐতিহ্য গড়ে ওঠে নি বলে যে ধরণের রচনাকৌশল এঁদের স্পর্শ করতে পারে তা ধনতান্ত্রিক কাঠামোতেই গড়া। দ্বিতীয়তঃ, লেখককে পাঠকদের 'emotional consciousness' বাড়ানোর জন্য শ্রমিক-কৃষকের স্বার্থ, তাদের সংগ্রাম ও চেতনার অংশীদার হতে হবে। যদিও তার দ্বারা বোঝাচ্ছে না যে, শিল্পীকে শ্রমিক-কৃষকের মত হাতুড়ি বা কাস্তে শান দিতে হবে।

শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, জ্ঞানে, কর্মে ও ভাবে মুক্তি এনে দেওয়াই শিল্পীর কাজ। যদি জীবন ও জগৎ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের জ্ঞান, কর্ম ও ভাবের প্রসার ঘটাতে হয়, সচেতন করতে হয় তাদের নিজেদের জীবন সম্পর্কে তাহ'লে শুধু দূরের সহানুভূতিই যথেষ্ট নয়, ইতিহাসের কার্য-কারণ বোধ ও সমাজ-বিকাশের তাৎপর্য

এবং শ্রেণীদ্বন্দ্বের মূল রহস্য জানতে হবে লেখককে। এই জানা শুধু জ্ঞানে নয়, কর্মে এবং ভাবেও সার্থক করতে হবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'আমরা যেমন অন্য মানুষের হইয়া খাইতে পারি না, তেমনি আমরা অন্য মানুষের হইয়া বাঁচিতে পারি না। সাহিত্য জীবনের স্বাভাবিক প্রকাশ, তাহা তো প্রয়োজনের প্রকাশ নহে। চিরদিনই লোকসাহিত্য লোক আপনি সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছে'৭। সুতরাং উচ্চতার অভিমান মনে পোষণ করে মানুষের জন্য সাহিত্য রচনা করতে গেলে সেই সাহিত্য 'emotional consciousness' বৃদ্ধির পরিবর্তে সাহিত্যিকের কল্পনাবিলাসের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। এই কল্পনাবিলাসের প্রতিবাদ হিসেবেই একদা রবীন্দ্রনাথ তাঁর উত্তরজীবনের নব্যতন্ত্রীদের কঠোর সমালোচনা করেছিলেন; এবং লেনিন, মায়াকভ্‌স্কির অতি বিপ্লবীপনার প্রতি বিরাগ প্রকাশ করেছিলেন। লেনিন-এর পথনির্দেশ এই ব্যাপারে ঠিকই ছিল যে, সর্বহারার-সাহিত্য সৃষ্টির নামে সাহিত্যের মানের অবনতি ঘটানো অনুচিত, চেষ্টা করতে হবে যাতে তাঁদের রুচির মান উন্নত হয়। সুতরাং সেক্ষেত্রে শিল্পী-সাহিত্যিককে পাঠকের চেতনার বিস্তার ঘটাতে হয়, পরিশীলিত করতে হয় তাঁদের ভাবজগৎকে।

শিল্পী অবশ্যই এক স্বাধীন সত্তার অধিকারী। কিন্তু এই স্বাধীনতা যেহেতু বিকৃত মস্তিষ্কের স্বাধীনতা নয়, অতএব সমাজ ও পরিপার্শ্বের সঙ্গে মিশে তাঁকে স্বাধীনতা ভোগ করতে হবে। আজ পশ্চিম ভূখণ্ড নির্বাসিত রুশ সাহিত্যিক সলঝেন্‌ৎসিন্‌কে নিয়ে যে এত বিব্রত হচ্ছেন তার মূলে আছে শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্ন, অধিকার ও কর্তব্যের প্রশ্ন। এককথায় যদি এই সমস্যার সমাধান করতে হয় তাহ'লে বলতে হবে কোন অধিকারই যেহেতু কর্তব্যশূন্য নয়, অতএব বিশুদ্ধ শিল্পের নামে অথবা স্বাধীনতার অজুহাতে শিল্পীরও যথেচ্ছাচারের অধিকার নেই। সুতরাং সাহিত্যিকেরা অভিজাততন্ত্রে রাজা মহারাজার মনস্তুষ্টি সাধন করে এসেছেন যে পদ্ধতিতে, ধনতন্ত্রে সুবিধাভোগী ও বিত্তবানদের সহজ সুখ পাইয়ে দিচ্ছেন যে ভঙ্গিতে, পরিবর্তিত সামাজিক কাঠামোতে সেই পদ্ধতি ও ভঙ্গি তাঁদের ত্যাগ করতেই হবে। তার ফলে তথাকথিত বিশুদ্ধ আনন্দ-দানের অধিকার থেকে চ্যুত শিল্পী হয়ত নৈরাশ্যপীড়িত হতে পারেন তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে কাজের ভারসাম্য রক্ষা করতে না পারার জন্য, কিন্তু শিল্পীমাত্রই জীবন থেকে স্বাধীনভাবে ঘটনা নির্বাচন করতে পারেন এই যুক্তিতে সমাজের অধিকাংশের চাহিদাকে বোধ হয় আর অস্বীকার করতে পারেন না। সমাজ ও যুগের বিবর্তনে পাঠকের শ্রেণীপরিচয় যেহেতু

পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে সুতরাং শিল্পীকেও তাঁর অধিকার ও কর্তব্য নিয়ে ভাবতে হবে নতুন করে ; পুরাতন ভাবাদর্শের অন্ধ-অনুসরণ আর চলবে না। একালের সাহিত্যিককে মনে রাখতে হবে সাহিত্যের জগৎ শুধু ভাব বা আবেগের জগৎ নয়, চিন্তা এবং ভাবনারও জগৎ। সর্বোপরি পাঠককে ভাবিত ও প্রাণিত করাই তাঁর উদ্দেশ্য। একালের সাহিত্যিকের কর্তব্যের নির্দেশ আমরা পাচ্ছি নোবেল পুরস্কার গ্রহণ উপলক্ষে মিখাইল সোলোকভ-এর সম্ভাষণে —'I would like my books to help people become better and purer in heart, to arouse love for man and a desire to become an active fighter for the ideals of humanism and human progress.' কিন্তু দূর থেকে কোন সাহিত্যিক নিজের আদর্শানুযায়ী জনসাধারণের জীবনকে অধিকতর সুন্দর করতে পারেন না। সাহিত্যিককে জানতে হবে জনসাধারণের চাহিদা কী, পাঠকের দাবি কী, বা তাঁদের আনন্দ কোথায়। যদিও সাহিত্যিক নিজেও পাঠকদের রুচি নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন এবং ধনতন্ত্রের বাজারে তিনি পাঠকদের চাহিদা কৌশলে বৃদ্ধিও করতে পারেন, কিন্তু সৎসাহিত্যিকের প্রথম দায়িত্ব হবে পাঠকদের রুচি ও চাহিদার সঠিক হিসাব রাখা। শুধুমাত্র নিজের ইচ্ছা ও রুচি অনুযায়ী পাঠককে পরিচালিত করা নয়। সমাজ-বিবর্তনের মূল সত্য সম্পর্কে যদি লেখক অজ্ঞ থাকার চেষ্টা করেন, যদি বিস্মৃত হন শিল্পীর ক্ষেত্রে 'freedom, (then,) is necessarily social, মুষ্টিমেয়ের গোপন জীবনের সরস কাহিনীর পরিবেশনকেই মনে করেন যথার্থ সামাজিক কর্তব্যপালন তাহ'লে টলস্টয়ের মতই বলতে হবে, সেই শিল্পীর শিল্প কৃত্রিম এবং অচল। এই জাতীয় শিল্প সম্পর্কে ব্রেশ্‌টের সঠিক মূল্যায়ন হচ্ছে—'Art which adds nothing to the experience of the public, which leaves it as it found it, which wants to do no more than flatter rude instincts and confirm un-ripe and over-ripe opinions—such art is worth nothing. So-called pure entertainment just produces a hangover.'